বাংলার নবজাগৃতি

বিনয় ঘোষ

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
কলিকাতা ● বোম্বাই ● মাদ্রাজ ● নয়াদিল্লী
বাঙ্গালোর ● হায়দরাবাদ ● পাটনা

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০২

আঞ্চলিক অফিস :

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০৭২
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ৪০০০৩৮
১৬০ আন্নাসালাই, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩/৫/৮২০ হায়দারগুডা, হায়দরাবাদ ৫০০০০১

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৫৫

মুদ্রক : শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪

প্রকাশক : শ্রী এন. ভেঙ্কু আয়ার,
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০৭২

সূচীপত্র

ভূমিকা — পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গত

নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা — ১—৩৮

সেকালের গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য—সেকালের নগর ও নাগরিক জীবন—দাসযুগ সামন্তযুগ ও বণিকযুগের বিকাশ, ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে—ব্রিটিশযুগের ঘাতপ্রতিঘাত—নতুন যুগের অর্থনৈতিক রূপ—মহানগর অভিমুখে যাত্রা—বাঙলার ঐতিহাসিক ভূমিকা, কলিকাতার প্রাধান্য—নবদ্বীপ-মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা।

বাঙলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস — ৩৯—৭৬

বাঙলার নতুন শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য—বাঙলার নতুন জমিদার-শ্রেণী—বাঙলার মজুরশ্রেণী—বাঙলার বুর্জোয়াশ্রেণী—বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী—বাঙালী মধ্যবিত্তের হিন্দু প্রাধান্যের কারণ।

ইসলাম ও বাঙলার সংস্কৃতিসমন্বয় — ৭৭—১১২

মানবপন্থী বাঙলার সংস্কৃতিসমন্বয়—বাঙলার হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি ?—হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণির মিলন—সেকাল আর একালের সংস্কৃতিসমন্বয়ের পার্থক্য।

নবজাগৃতির ভাববিপ্লব — ১১৩—১৪১

যন্ত্রযুগের শৈশবকাল—টাকা ধর্ম, টাকা স্বর্গ—'Time is Money' বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান—বাঙলার নবজাগৃতির প্রবাহ।

সংযোজন : — ১৪২—১৬১

বাংলার নবজাগরণ : সমীক্ষা ও সমালোচনা

সংযোজন :

বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা — ১৬২—১৮৫

নির্দেশিকা — ১৮৬—১৯৫

গ্রন্থপঞ্জী — ১৯৬—১৯৯

প্রসঙ্গত

"বাঙলার নবজাগৃতি" প্রকাশিত হ'ল। ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে চারিদিকের পুঞ্জীভূত সংকট ও পর্বতপ্রমাণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগৃতির সূচনা হয়েছিল, এবং যে-নবজাগৃতিধারা তরঙ্গায়িত হয়ে বিচিত্র-পথে আজও এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, "বাঙলার নবজাগৃতি" গ্রন্থে তারই ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার একার পক্ষে এচেষ্টা সার্থক করা যে সাধনাতীত ব্যাপার তা আমি জানি। এই অসমসাহসের একমাত্র অনুপ্রেরণা হ'ল বাঙলার বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। রামমোহন দ্বারকানাথ রামগোপাল দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই শার্দূলশ্রেণী আজ বাঙলায় কোথায়? বাঙলা আজ বনগাঁ। বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে যাঁরা আজ 'অগ্রগণ্য', কোথায় তাঁদের চরিত্রে সেই পৌরুষ বলিষ্ঠতা ও উদারতা, কোথায় তাঁদের প্রতিভায় সেই মুক্তবুদ্ধি সুস্থযুক্তি ও স্বাধীনচিন্তার প্রদীপ্তি? আজ তাই বারংবার মনে হয়, বাঙালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে পড়ে, "বাঙলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না।... বাঙলার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙলার ভরসা নাই।" কিন্তু কে লিখবে সেই ইতিহাস, যে-ইতিহাস উপন্যাস হবে না, জীবনচরিত হবে না, নিছক ঘটনাপঞ্জীও হবে না, একটা জাতির উত্থানপতনমুখর জীবনেতিহাস হবে। তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্ব-

সাধারণের মা জন্মভূমি বাঙালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাস লেখার এই হ'ল একমাত্র কৈফিয়ৎ। এই ইতিহাস আজ সকলকেই লিখতে হবে। যে বাঙালী, বাঙলাদেশ যারা জন্মভূমি, তাকেই লিখতে হবে। বাঙলার জাতীয় ঐতিহ্য চরিত্র শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি যখন বিপন্ন, যখন ক্ষমতালোভী মুনাফাখোর চোরাকারবারী পেশাদার হত্যাকারী ও চরিত্রহীন চাটুকারদের তর্জনগর্জনে বাঙলার জনজীবন সশঙ্ক, যখন শত্রুর প্রসাদজীবী উচ্ছিষ্টলোভী অমেরুদণ্ডী ভক্তবৃন্দ বাঙলার সমাজের ও সংস্কৃতির কর্ণধার, যখন বিবেক বুদ্ধি বিচার যুক্তিনীতি রুচি সৎসাহস ও সত্যবাদিতা বাঙলার মাটি থেকে নির্বাসিতপ্রায়, যখন ক্লীবের ধর্ম্ম বাঙলার যুগধর্ম, তখন বাঙলার নবযুগের নবজাগৃতির ইতিহাস রচনার গুরুদায়িত্ব প্রত্যেক বাঙালীরই গ্রহণ করা উচিত। সকলে মিলে বাঙলার প্রবহমান পরিবর্তনশীল ইতিহাসের ধারাটি অনুসন্ধান করা উচিত। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর করবে। অতীতে যাঁরা এই ধারার অনুসন্ধান করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও অনেকে যাঁরা করবেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। "ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভরসাতেই আমি একাজে গত কয়েকবছর ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করেছি। যেকাজ একের কাজ নয়, সকলে মিলে করতে হবে, তার অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আমি সচেতন।

ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করতে হ'লে অনুসন্ধানকারীর একটা নিজস্ব 'দৃষ্টি' থাকা চাই। এই দৃষ্টিকোণটাই আসল। এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য ইতিহাস উপন্যাস হয়, ঘটনাপঞ্জী হয়, জীবনচরিত হয়, আবার দ্বন্দ্বমুখর বিরোধবন্ধুর বাস্তব জীবনেতিহাসও হয়। বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাসের ধারার অনুসন্ধান আমি একটা বিশেষ 'দৃষ্টি' দিয়ে করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারা সরলরেখায় প্রবাহিত

হয়নি, হয় না। সর্পিলরেখায় উত্থানপতনের বিরোধবন্ধুর পথে যুগ থেকে যুগান্তরের দিকে ইতিহাস এগিয়ে চলে। এই ইতিহাসের মূলধারাটি হ'ল মানুষের জীবনসংগ্রামের ধারা। মানবসমাজের ইতিহাস বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, এই জীবনসংগ্রামের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, এবং সেই সংগ্রামপদ্ধতি যুগে যুগে বদলায়। প্রধানত সংগ্রামের আয়ত্ত হাতিয়ার দ্বারাই এই পদ্ধতি নিরূপিত হয়। আদিপ্রস্তর যুগের স্থূল পাথুরে হাতিয়ার তীরধনুক ইত্যাদি বন্যপশুশিকারের উপযোগী ছিল, নব্যপ্রস্তরযুগের সূক্ষ্ম পাথুরে হাতিয়ার পশুপালক ও কৃষিজীবীর গ্রাম্য-সমাজ গ'ড়ে তুলেছিল, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের উন্নত ধাতুনির্মিত হাতিয়ার নগর-সভ্যতা রাজতন্ত্র ও দাসপ্রথার প্রবর্তন করেছিল, কুটিরশিল্প কৃষিকাজ বিনিময়-বাণিজ্য সংঘধর্ম ও ভূস্বামিত্ব সামন্তপ্রথার স্তম্ভ ছিল, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের ভিত্তির উপর ধনিকতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং তারই ব্যাপক প্রসার প্রয়োগ ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির ফলে সমাজতন্ত্রের বিপুল সম্ভাবনা ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার এই যে পরিবর্তনশীল ইতিহাস এর চালকশক্তি হ'ল সমাজমূলের এই উৎপাদনপদ্ধতি। উৎপাদন হাতিয়ার বা উৎপাদনযন্ত্র উৎপাদনপদ্ধতি নিরূপণ করে। এই উৎপাদনপদ্ধতি জীবনধারণের তাগিদে মানুষ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে সমাজের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক-স্থাপন কেবল মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এই সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের ভিতর দিয়েই মানুষের জীবনদর্শন গ'ড়ে ওঠে, রাষ্ট্রিক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নির্ধারিত হয়। এই সমাজবিশ্লেষণেরই আর এক নাম হ'ল ইতিহাসের বাস্তবব্যাখ্যা এবং এর প্রবর্তক যেহেতু কার্ল মার্কস সেইজন্য ইতিহাসব্যাখ্যার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্ক্‌সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। কার্ল মার্ক্‌স ও মার্ক্‌সবাদী নাম শুনে একশ্রেণীর পণ্ডিত ও পাঠক হয়ত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় বিহ্বল হবেন। কিন্তু বিহ্বলতা ও পক্ষপাতিত্বের কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নেই। আজ নৃবিজ্ঞানী প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা সকলেই প্রায় ইতিহাসের এই বাস্তবব্যাখ্যাকে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যাঁরা করেননি তাঁদের মতামতের যৌক্তিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে পূর্বসংস্কার-প্রিয়তাই বেশি উল্লেখযোগ্য।

মার্ক্‌সবাদকে আজ আদর্শ সমাজবিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করতে কোন কুণ্ঠা বা পূর্বসংস্কার না থাকাই উচিত এবং রাজনীতিক্ষেত্রের দৈনন্দিন সংঘাতের ভীতিপ্রদ স্মৃতি যদি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণে অন্তরায় না হয় তাহ'লেই ভাল।

ইতিহাসের এই বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবব্যাখ্যা সম্বন্ধে আরও একটু বলা দরকার। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সমাজমূলের অর্থনৈতিক উৎপাদনপদ্ধতি ও শ্রেণীসম্পর্কই রাষ্ট্র রীতিনীতি রুচি এবং সংস্কৃতির রূপ নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের ফলে এইসব আদর্শেরও রূপান্তর ঘটে। কিন্তু বাস্তবজগতের অর্থনৈতিক রূপান্তর যেমন সুনির্দিষ্ট-ভাবে ঘটে, আদর্শলোক বা মনোজগতের রূপান্তর তেমনভাবে ঘটে না, ধীরেসুস্থে নতুন-পুরাতনের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানসলোকের পরিবর্তন হয়। বাস্তবজগতের সঙ্গে মনোজগতের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নয়, পরোক্ষ সম্পর্ক। বাস্তবজগতের অর্থনৈতিক জীবনসংগ্রাম যেমন মনোজগতের আদর্শসংগ্রামকে প্রভাবিত করে, তেমনি আদর্শসংগ্রামও জীবন সংগ্রামের রূপ বদলায়। এই ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই সমাজ সংস্কৃতি সব এগিয়ে চলে এবং ধীরে ধীরে যুগপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। (ক) মার্ক্‌বাদীর দৃষ্টি অর্থনীতিসর্বস্ব অনুদার দৃষ্টি ব'লে যাঁরা মার্ক্‌সবাদের অপব্যাখ্যা করেন তাঁদের একথা মনে করিয়ে দেওয়া এখানে প্রয়োজন। মার্ক্‌সীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা আদর্শ সমাজবিজ্ঞানী তাঁরা সমাজের ঐতিহাসিক ধারাবিশ্লেষণের সময় আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসেন না, মাটি থেকে আকাশ পথে যাত্রা করেন। মানুষ কি কল্পনা করে, চিন্তা করে, অর্থাৎ চিন্তাশীল কল্পনাপ্রবণ মানুষ থেকে শুরু ক'রে রক্তমাংসের মানুষের ইতিহাস তাঁরা অনুসন্ধান করেন না। খাঁটি রক্তমাংসের মানুষ, সক্রিয় সামাজিক মানুষ থেকে তাঁদের ইতিহাসব্যাখ্যা শুরু হয় এবং তাঁদেরই বাস্তব জীবনধারার উৎস থেকে কলোচ্ছ্বসিত ভাবাদর্শের স্বরূপবিশ্লেষণ ক'রে তাঁরা সেই ইতিহাসব্যাখ্যা শেষ করেন। নীতি ধর্ম অধ্যাত্মবাদ আদর্শবাদ, এককথায় মনোজগতের বাহ্যরূপের কোন সমাজবিচ্ছিন্ন

(ক) Karl Marx : "A Contribution to the Critique of Political Economy", Selected Works, Vol I

স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। সমস্ত ইতিহাসই সামাজিক মানুষের বাস্তবজীবনের ইতিহাস এবং তারই ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের নিজের প্রকৃতি মানসপ্রতিমা ও ভাবাদর্শ পরিবর্তনের ইতিহাস। (খ) ইতিহাসের এই বাস্তবব্যাখ্যাই আমি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ব'লে গ্রহণ করেছি এবং সমাজবিজ্ঞানীর এই দৃষ্টি দিয়েই বাঙলার নবজাগৃতিধারার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। সার্থক হয়েছি কি-না সে-বিচারের ভার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এচেষ্টার প্রেরণা পেয়েছি বাঙলার বর্তমান সামাজিক পরিবেশ থেকে এবং আমার সাধ্য মতন তাকে সার্থক ক'রে তুলতে একনিষ্ঠার সঙ্গে মেহনত করতে পশ্চাদ্‌পদ হইনি।

বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাস পূর্বে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশ লেখাই আংশিক অথবা প্রাসঙ্গিক। রাজনারায়ণ বসুর "সে কাল আর একাল," শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", ডঃ সুশীল-কুমার দে'র "Bengali Literature in the Nineteenth Century", উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির আংশিক চিত্র মাত্র। শ্রীসজনীকান্ত দাসের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (১ম খণ্ড) এবং শ্রীসুকুমার সেনের "বাঙলা সাহিত্যে গদ্য" ও "বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস" সাহিত্যের ও গদ্যভাষার উল্লেখযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস, কিন্তু এগুলিকে বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাস বলা যায় না। "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা, শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের "বাংলার নবযুগ" ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবেতিহাস নয়, বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাসের একটা সমগ্র অখণ্ডচিত্রও তাঁদের লেখার মধ্যে ফুটে ওঠেনি। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "Selections from Writings of Harish Chandra Mookherji," শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা" ঐতিহাসিক উপাদানের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে মূল্যবান, ইতিহাস নয়। এই ধরনের আরও অনেক গ্রন্থে প্রবন্ধে ও জীবনচরিতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসের নানাদিক ও নানাবিষয় নিয়ে আংশিক আলোচনা করা

(খ) Karl Marx & Frederich Engels : The German Ideology

হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা এর মধ্যে অনেকেই করেননি। শ্রীগোপাল হালদারের দু'একটি প্রবন্ধ এবং অমিত সেনের খসড়া 'Notes on Bengali Renaissance' এবিষয়ে প্রথম দিগ্‌দর্শন বলা যায়, কিন্তু তাঁরা কেউ নবজাগৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেননি।

যাঁদের কথা এখানে বলা হ'ল এবং আরও অনেকে যাঁদের কথা এখানে বলা হ'ল না তাঁরা সকলেই বাঙলার নবজাগৃতির আংশিক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করলেও পরোক্ষভাবে আমার এই ইতিহাসরচনায় তাঁরাই উৎসাহদাতা ও পথপ্রদর্শক। তাঁদের কাছে আমার ঋণস্বীকার করছি। তাছাড়া শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে "সাহিত্য সাধক চরিতমালা" যদি প্রকাশিত না হ'ত তাহ'লে একাজ যে অনেক বেশি দুরূহ হ'ত তা বলাই বাহুল্য।

"বাঙলার নবজাগৃতির" বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাঙলার নবজাগৃতির এই ইতিহাস আমি তিনখণ্ডে ভাগ করেছি। প্রথমখণ্ডে নবজাগৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ থেকে এই আলোচনা শুরু, কারণ নবযুগের অর্থনীতি ও শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আধুনিক মহানগর। কলিকাতা মহানগরের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে এযুগের অর্থনৈতিক রূপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং কেনই বা তা এদেশের সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক যুগান্তর এনেছে তারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজের মধ্যে যে নতুন শ্রেণীবিন্যাস হ'ল, যে নতুন জমিদারশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণী মধ্যবিত্তশ্রেণী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর উদ্ভব হ'ল, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সেই শ্রেণীবিন্যাস কিভাবে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে তারও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙলার সংস্কৃতিসমন্বয়ের বিশিষ্টতা, বিশেষ ক'রে বাঙলার হিন্দুমুসলমানদের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ইতিহাস আলোচনা ক'রে নবযুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে যে বৃহত্তর সংস্কৃতিসমন্বয়ের সুযোগ ঘটল তার স্বরূপ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নবজাগৃতির ভাববিপ্লবের মূলকারণ

ও উপাদানগুলি এবং তাদের বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে প্রথমখণ্ড শেষ করেছি।

"বাঙলার নবজাগৃতির" দ্বিতীয়খণ্ড "সমাজখণ্ড", সামাজিক নবজাগৃতির ইতিহাস। এই খণ্ডে রামমোহন দ্বারকানাথ দক্ষিণারঞ্জন রামগোপাল তারাচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাধাকান্ত, ভূদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর 'ইয়ং বেঙ্গল', সৈয়দ আহ্‌মদ, সৈয়দ আমীর আলি, আব্দার রহিম, সৈয়দ হাসান ইমাম, আব্দুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ বিলায়েৎ আলি খাঁ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে সামাজিক নবজাগরণের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মুসলমানসমাজের নবজাগৃতির ইতিহাসও সেই সঙ্গে সযত্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ডে নবযুগের বাংলার নতুন অভিজাত পরিবার ও ধনিকশ্রেণীর বিস্তৃত পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। বেরিলিবিদ্রোহ, কোলবিদ্রোহ, মুসলিমবিদ্রোহ, মোপ্‌লাবিদ্রোহ, সাঁওতালবিদ্রোহ ও সিপাহীবিদ্রোহের ভিতর দিয়ে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা প্রভাব-বিস্তার ও পরিণতির ইতিহাসও এই দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম। জাতীয় আন্দোলনের সাম্প্রতিক রূপ ও বিচিত্রধারা, সমসাময়িক বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা, কলিকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধি-জীবীশ্রেণীর সংকট, বঙ্গবিভাগজনিত সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা, বৃহত্তর বাঙলা ও প্রবাসী বাঙালার সমস্যা, কলিকাতার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়খণ্ড 'সংস্কৃতিখণ্ড' বা বাঙলার সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির ইতিহাস। বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাস, ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের ইতিহাস, ভাষা সাহিত্য চিত্রকলা ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস তৃতীয়খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এছাড়া তৃতীয়খণ্ডের মধ্যে বাঙলার আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। এই হ'ল "বাঙলার নবজাগৃতির" তিনখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিষয়পরিচয়।*

এই ইতিহাসের মালমশলাসংগ্রহ আমি নিজে একা করেছি বললে অন্যায় হবে। আমার সঙ্গে আরও যে কয়েকজন নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করেছেন

* এই পরিকল্পনা পরে লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে। —বি. ঘো

তাঁরা কেউ আমার খ্যাতি-অখ্যাতির অংশীদার হ'তে চান না বলেই তাঁদের নাম অপ্রকাশিত রাখতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। এখানে কেবল কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহা মহাশয়ের নাম উল্লেখ করছি, যাঁর বিরাট গৃহপাঠাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী আমার প্রয়োজন মতন ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা না পেলে, এই বইয়ের উপাদানসংগ্রহের কাজ অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে উঠত। এঁরা ছাড়াও একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে "ইন্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশিং হাউস লিমিটেডের" প্রকাশকবন্ধুরা যদি এই দুর্দিনে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করার সৎসাহস (না, দুঃসাহস?) না দেখাতেন তবে আমার উৎসাহ অনেক আগেই নিভে যেত। আমার প্রকাশকবন্ধুদের সেজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রত্যেক অধ্যায়ের 'প্রসঙ্গনির্ঘণ্ট' (Reference Notes) পাদটীকা হিসাবে না দিয়ে গ্রন্থের শেষে একত্রে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের সুবিধার জন্য একটি 'গ্রন্থনির্দেশিকাও' যোগ করা হয়েছে।

শ্রাবণ, ১৩৫৫
১৫ ল্যান্‌সডাউন প্লেস
কলিকাতা—২৯

বিনয় ঘোষ

নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা

যে সব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চাইতে উন্নত। ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্পবাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যাকিছু মহৎ ও গৌরবের বস্তু তা সমস্তই প্রায় ধ্বংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের কাহিনীতে কলঙ্কিত। বিরাট এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তাহলেও, স্বীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে।

কার্ল মার্কস: ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল: নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ৮ই অগস্ট, ১৮৫৩।

বনজঙ্গল পর্বতগুহা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর শহর মহানগর, এই হল মানবসমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, মানবসভ্যতা ও মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। মানুষের অগ্রগতির পদচিহ্ন গুহায় গ্রামে নগরে শহরে মহানগরে আঁকা রয়েছে। গুহা হয়ত আজও আছে, গ্রাম তো নিশ্চয়ই আছে, মধ্যযুগের নগর, বণিকযুগের শহর আর আধুনিক ধনিকযুগের মহানগর সবই আজও পাশাপাশি বিরাজ করছে। কারণ অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতি পৃথিবীর সর্বত্র একই গতিতে হয়নি। কিন্তু তবু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, যুগমাহাত্ম্য সকলের মধ্যে সমানভাবে নেই। গুহা আজ নির্বাসিত, গ্রাম উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত, মধ্যযুগের প্রাকারবেষ্টিত নগর ধ্বংসোন্মুখ, বণিকযুগের শহর রুচিহীনতায় ম্লান, ধনিকযুগের মহানগর এখনও নবযুগের বৈজ্ঞানিক অবদানে মহিমান্বিত। যুগের গতিধারা এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন

যুগের নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্রে মানুষের নতুন মানসপ্রকৃতি, নতুন জীবনাদর্শ, নতুন ভাবধারা, নতুন শিল্পকলা সাহিত্য স্থাপত্য নীতিরুচিবোধ আচারব্যবহার নিয়ে নতুন সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করে। আমরা যে-যুগে বাস করছি সেই বৈজ্ঞানিক যুগ ও শ্রমশিল্পযুগের নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্র হল মহানগর। এই মহানগর থেকেই নতুন যুগের নবজাগরণের শুরু। তাই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলিকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনো সমাজ-বিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারেন না। কলিকাতা মহানগরই বাংলার নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্র। তাই কলিকাতাই বাংলার নতুন ভাবধারা, নতুন মানসপ্রকৃতি ও নবজাগৃতির উৎস। কলিকাতাই বাংলার সংস্কৃতিকেন্দ্র।

মহানগর যেন মহাসমুদ্র। বাইরের নদনদী যেমন শতসহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে মহাসমুদ্রের বুকে মিলিত হয়, তেমনি বাইরের গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ, বাহির-বিশ্বের লোকজন, তাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভালমন্দ আদর্শ সব এসে মিলিত হয় মহানগরের বুকে। সকলের স্বাতন্ত্র্যের সংঘাতে মহানগরের শানবাঁধানো বুকও উদ্বেল হয়ে ওঠে। বাজারে বন্দরে, বাণিজ্যকেন্দ্রে, শিক্ষাকেন্দ্রে, অফিস-আদালতে, ক্লাবে-কাফেতে, ব্যারাকে-রাজপথে এই ঘাতপ্রতিঘাত, এই লেনদেন অবিরাম চলতে থাকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত, নানারকমের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির খণ্ডযুদ্ধ, নানা উদ্যমের সংঘর্ষ, বিচিত্র ভাবধারার আবর্ত মহানগরের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আলোড়ন ও বিক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থির ও সংযত হয়ে আসে। উচ্চতর বৃহত্তর ও মহত্তর এক সমন্বয়ের মধ্যে সমস্ত সংঘাত, সমস্ত বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য, সমস্ত স্বাতন্ত্র্য এক অপূর্ব শান্তগম্ভীর রূপ ধারণ করে। বাইরে সেই রূপের বিকীরণ হয়। নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নগরের সংস্কৃতিসম্ভার, নগরের সজীবতা সক্রিয়তা ধীরে ধীরে নগরের উপকণ্ঠে, পরিপার্শ্বে, সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করে। ঠিক তেমনি নগরের অর্থনৈতিক অবনতি ও অপচয়, নগরের দুর্নীতি স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা, সারা সমাজদেহকে বিষাক্ত করে তোলে। বড় বড় শানবাঁধানো রাজপথ ও অ্যাশ্‌ফল্টের অ্যাভিনিউয়ের উপর দিয়ে যান্ত্রিক যানবাহনের মতন তীব্রবেগে মহানগরের একপ্রান্ত থেকে আরএক প্রান্ত পর্যন্ত যেমন নতুন ভাবধারা, নতুন আদর্শ, নতুন রুচি ও নীতি চলাফেরা করে, বিদ্যুদ্‌বেগে যেমন সকলের মনে সেই ভাবধারা সংক্রমিত হয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, সকল রকমের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে মন্থন করে তোলে, তেমনি দুর্নীতি ও ব্যভিচারও মহানগরের বুকে দ্রুতগতিতে ব্যাপক ভয়াল মূর্তি ধারণ করে। সমাজদেহের শিরা-উপশিরা জড়িয়ে থাকে

মহানগরে। মানুষ থাকে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে, অথচ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সম্পর্কশূন্য। মহানগরের রাজপথে, ইটপাথরেলোহায় যেমন মানুষের মহান আদর্শের, জীবনের মহান সত্যের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি মহানগরের কদর্যতা তুচ্ছতা ব্যস্ততা হীনতা নীচতা দীনতা সব যেন ইটপাথর-লোহার গায়ে একেবারে খোদাই করা থাকে, সহজে মিলিয়ে যায় না। মহানগর তাই নিঃসন্দেহে মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলেও আজ তার উল্লেখযোগ্য অপকীর্তিও বটে। নতুন যুগের যে-প্রেরণায়, নতুন জীবনধারার যে-তাগিদে আধুনিক মহানগরের উদ্ভব, সেই প্রেরণা ও তাগিদ আজ বিকৃত বিকারগ্রস্ত। আধুনিক মহানগর মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সর্বজনীনতা ও সহযোগিতার লক্ষ্যভ্রষ্ট মহানগর আজ তাই পৈশাচিক ধনতান্ত্রিক প্রবৃত্তির জঘন্য লীলাকেন্দ্র, উত্তুঙ্গ স্কাইস্ক্রেপারের মতন তার দাম্ভিক স্বার্থপরতা, প্রশস্ত অ্যাভিনিউয়ের মতন তার দিগন্তবিস্তৃত লালসা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানগরের কবল থেকে মানুষের মুক্তি নেই। গুহা ছেড়ে গ্রামের দিকে, গ্রাম ছেড়ে নগর শহর ও মহানগরের দিকে মানুষের অগ্রগতি, এবং তার সঙ্গে পা ফেলে মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি। সংঘবদ্ধ সম্মিলিত যৌথজীবনের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা, সুখসম্পদ ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ, মানুষের রূপবেদনা শিল্পবোধ রুচিবোধ এবং মূক মানবতা মুখর হয়ে উঠেছে মহানগরে। মহানগরের মহান জীবনকেন্দ্র থেকে আধুনিক মানুষের তাই কেন্দ্রচ্যুত হবার উপায় নেই। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড তাই বলেছেন: "গুহা আর উইঢিবির মতন মহানগরও প্রকৃতির কোলে গড়ে উঠেছে। কিন্তু মহানগর হল মানুষের সচেতন মনের শিল্পরূপ এবং নগরের সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যেই ব্যষ্টির স্বকীয়তা নিয়ে কলাশিল্পের বিকাশ হয়। মানুষের মন মহানগরের ছাঁচেই গড়ে ওঠে, মনের প্রকাশ মহানগরই নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার পরে মহানগরই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। সামাজিক বৈচিত্র্য ও জটিলতা এবং উদ্দেশ্যপ্রাধান্য হল মহনগরের বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক পরিবেশকে মানবিক করে তোলা এবং মানবিক আদর্শের উত্তরাধিকারকে সর্বজনীন করাই হল মহানগরের অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১]

মহানগরের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে আমরা বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহানগর 'কলিকাতার' ক্রমবিকাশের কথা বলব। গ্রাম্যজীবন থেকে আধুনিক মহানাগরিক জীবনের বিকাশ হতে কলিকাতার প্রায় আড়াই শতাব্দীকাল সময় লেগেছে। এই আড়াই শতাব্দীকালের মধ্যে

ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। কবি কিপ্‌লিঙ 'কলিকাতা' সম্বন্ধে বলেছেন :

> **Thus from the midday halt of Charnock**
> **grew a city,**
> **As the fungus sprouts chaotic from its**
> **bed**
> **So it spread.**
> **Chance-directed. chance-erected, laid and**
> **built**
> **On the silt,**
> **Palace, byre, hovel, poverty and pride**
> **Side by side.**

'কলিকাতা' সম্বন্ধে একথা অনেকটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়, যেমন কলিকাতা সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার' নকশা'—

> আজব সহর কল্‌কেতা;
> রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা ;
> হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা ;
> যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।

একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও অনেকটাই মিথ্যা। 'chance-directed', 'chance-erected' কলিকাতা নিশ্চয়ই নয় এবং শেওলা বা ব্যাঙের ছাতার মতন কখনই কলিকাতা গজিয়ে ওঠেনি। যোব চার্নক হঠাৎ যাযাবরের মতন ঘুরতে ঘুরতে একদিন বৈঠকখানায় পিপুল গাছের তলায় মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে পড়েননি। 'আজব সহর' কলিকাতা ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মাত্রই 'বক বিড়াল' নন, অথবা তার চারিদিকে কেবল 'বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা' থাকে না। কোনো সমাজবিজ্ঞানীর বা নগরশিল্পীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে হয়ত 'কলিকাতা' আধুনিক মহানগরের রূপ পায়নি। জৈবিক নিয়মেই অনেকটা কলিকাতার বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, বিজ্ঞানীর ও স্থপতির কল্পনার স্পর্শ তার গঠন-বিন্যাসে বিশেষ নেই। তবু কলিকাতা 'হঠাৎ-গড়া' 'হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা' মহানগর নয়। সেকালের সমাজব্যবস্থা, সেকালের জীবনধারা, সেকালের ভাবাদর্শ ভেঙেচুরে আত্ম-বিকাশের বেগে নতুন যুগের প্রচণ্ড তাগিদে জন্মলাভ করেছে কলিকাতা মহানগর। কলিকাতার বড় বড় রাজপথ আর অট্টালিকার তলায় শুধু সেকালের গোবিন্দপুর কলিকাতা আর সূতানুটি গ্রাম তিনটি সমাধিস্থ হয়ে

নেই। অনেক গ্রাম, অনেক প্রাচীন নগর কঙ্কালে পরিণত করে কলিকাতা পুষ্টিলাভ করেছে। নতুন যুগের জয়যাত্রার পথে সেকালের গ্রাম্যসমাজ, সেকালের নগরশিল্প, সেকালের রীতিনীতি রুচি শিক্ষাসংস্কৃতি সব ভেঙেচুরে গড়ে উঠেছে কলিকাতা, আর তার সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে নতুন যুগের সমাজ, নতুন যুগের শ্রমশিল্প, নতুন যুগের জীবনধারা ও ভাবধারা, নতুন যুগের শিক্ষাসংস্কৃতি। কি গড়ে উঠল বুঝতে হলে কি ভেঙেচুরে গেল আগে তা জানতে হয়। কি-ভাবে কি-অবস্থায় গভীর নিদ্রায় আমরা অচেতন ছিলাম তা না জানলে নবজাগরণের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করব কি করে?

সেকালের গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য

১৮৫৩ সালের ২ জুন লণ্ডন থেকে কার্ল মার্ক্স একখানা চিঠিতে এঙ্গেল্‌সকে লিখেছিলেন: "...the basic form of all phenomena in the East . is to be found in the fact that no private property in land existed. This is the real key, even to the Oriental heaven." প্রাচ্যসমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূলে হল ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বহীনতা।[১] এমন কি, প্রাচ্যস্বর্গের চাবিকাঠিও হল তাই। তুরস্ক পারস্য আরব ও হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের কথাই মার্ক্স এখানে বলেছেন। ১৮৫৩ সালের ৬ জুন মাঞ্চেস্টার থেকে এই চিঠির উত্তরে এঙ্গেল্‌স লেখেন: "The absence of property in land is indeed the key to the whole of East." বাস্তবিকই তাই। পাশ্চাত্যসমাজে ভূমিস্বত্ব যেরকম সুনির্দিষ্ট একটা রূপ পেয়েছে, প্রাচ্যসমাজে কোথাও তা পায়নি। ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বপ্রথা যে ভারতবর্ষে বিকাশলাভ করেনি তা নয়। গোষ্ঠিস্বত্ব (Tribal Ownership), সংঘস্বত্ব (Communal Ownership) ও যৌথস্বত্বের (Joint Ownership) পাশাপাশি ব্যক্তিস্বত্ব (Individual Ownership) ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই ছিল।[২] বৌদ্ধযুগে এই উভয় স্বত্বপ্রথার উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল দেখা যায়। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে সংঘস্বত্ব ও যৌথস্বত্বপ্রথা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে এবং ব্যক্তিগত স্বত্বপ্রথার উৎকট বিকাশ হতে থাকে।[৩] কিন্তু এই ভারতীয় ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ইয়োরোপীয় ভূমিস্বত্বের স্বরূপের মৌল পার্থক্য আছে। এদেশে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব কোনোদিন বিধিবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি, দেশীয় প্রথানুসারে স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। ইয়োরোপের রাজা তাঁর রাজত্বের সর্বময় কর্তা, ভূসম্পত্তি কৃষক কারিগর কর্মচারী সবারই

মালিক রাজা। রাজার অধীন বেরনরাও ক্ষুদে রাজা। রাজা যখন তাঁদের কর্তৃত্ব করার অধিকার দেন তখন তাঁরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূসম্পত্তি লোকজন সকলের উপর কর্তৃত্ব করার বিধিবদ্ধ অধিকার পান। কর্তৃত্ব সেখানে দখলী-স্বত্বেরই নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষে রাজা নিজে ভূমির স্বত্বভোগ করতেন না, তাই তাঁর অধীন সামন্তদের আংশিক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেবার অধিকারও তাঁর ছিল না। রাজা দিতেন রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসনব্যবস্থা তদারক করার অধিকার।[৫] জৈমিনির 'পূর্ব-মীমাংসাতে' বলা হয়েছে : 'রাজা কোনো ভূমি হস্তান্তর করতে পারেন না, কারণ রাজা ভূমির মালিক নন। মালিক তারা যারা খেটে সেই ভূমি চাষ করে।' সায়নাচার্য বলেন : 'রাজার কর্তব্য হল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, আর নিরপরাধকে আশ্রয় দেওয়া। জমির মালিক রাজা নন, যারা আবাদ করে ফসল ফলায় তারা।' ভারতবর্ষে তাই রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র, ভূমিস্বত্বের রূপ বদলায়নি। বিজয়ী রাজা শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছেন। ভূস্বামীদের ভূমিস্বত্ব অথবা প্রজাদের প্রজাস্বত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে যে সামন্তযুগের ইয়োরোপের মতন হানাহানি বিশেষ হয়নি তার কারণ হল ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের গঠনবৈশিষ্ট্য। সেই খৃঃ পূঃ ২০০০ বছর আগের বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশপূর্ব মোগল বাদ্‌শাহের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখা যায়। পরিবর্তন যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু যা হয়েছে তা প্রধানত বাহ্য, মৌল কোনো রূপান্তর ঘটেনি। তার কারণ কি? কি সেই বৈশিষ্ট্য, কোথায় সেই প্রচণ্ড শক্তির কেন্দ্র ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের, যার জন্য যুগে যুগে প্রবল প্রতাপশালী রাজা-রাজ্‌ড়া নবাব-বাদ্‌শাহের সকল রকমের আঘাত অত্যাচার উৎপীড়ন তার পক্ষে অচল অটলভাবে সহ্য করা সম্ভব হয়েছে? ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার নির্বিকার আত্মকেন্দ্রিকতাই হল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার প্রচণ্ড শক্তি। শুধু ভারতবর্ষের নয়, এসিয়াটিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি। কার্ল মার্ক্‌স তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে ভারতীয় তথা এসিয়াটিক সমাজের এই বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন :[৬]

> একই ধরনের সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য। ভেঙে গেলেও এই গ্রাম্যসমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই একঘেয়ে সরলতাই হল এসিয়াটিক সমাজের সুস্থিরতার অন্যতম কারণ। এসিয়াটিক রাজ্য ও রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন ভাঙাগড়ার মধ্যে এসিয়াটিক সমাজের

নিশ্চলতা ও স্থিরতার বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝার নিচে এসিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে থাকে।

উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারতের সর্বত্র এই গ্রাম্যসমাজের অস্তিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একরকম অটুট ছিল। রোজ সাহেব ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে লিখেছেন :

> পঞ্জাব প্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রামের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যেই তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্তর তৈরি হত। ভূসম্পত্তির মালিকদের অধীনে থাকত নানাশ্রেণীর কারিগর কারুশিল্পী, নানারকমের বৃত্তিজীবী। এই বৃত্তিজীবীরাই ক্রমে বিভিন্ন 'বর্ণে' রূপ পেয়েছে। এই সব বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা স্বাবলম্বী ছিল না, থাকতে পারে না। তাদের স্বাতন্ত্র্য বলেও কিছু ছিল না। এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রাম অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর ছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এইবার দাক্ষিণাত্যের একটি গ্রামের কথা বলছি। গুডইন সাহেব দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যসমাজের (১৮৪৫) যে নকশা এঁকেছেন তা অতুলনীয়। এখানে তাঁরই একটা নকশার পরিচয় দিচ্ছি। পাতিল কুলকার্নি ছুতার লোহার চম্ভার (চামার) কুম্ভার (কুমোর) নেহায়ি (নাপিত) পুরিত (ধোবা) যোশী (জ্যোতিষী) গুরু সোনার মুহার (চৌকিদার), এই ক'জনকে নিয়েই একটা গ্রাম্যসমাজ গড়ে উঠত। এদের সঙ্গে ভিল কোলি মুলানাও (মৌলানা) ছিল। পাতিল ও কুলকার্নিরা হল ভূস্বামীশ্রেণী, রাজস্ব আদায়ের ও নির্ধারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হত তাদের উপর। গ্রামের মধ্যে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি সকলের চাইতে বেশি। ছুতোরেরা কারিগরদের মধ্যে প্রধান, তারা কাঠের হাতিয়ার গড়ত, ঘরবাড়ি নির্মাণ করত, মেরামত করত, গরুর গাড়ি তৈরি করত। লোহার বা কর্মকার তৈরি করত লোহার যন্ত্রপাতি এবং তা মেরামতও করত। চামার তৈরি করত জুতো চাবুক দড়ি ইত্যাদি। এই ছুতোর লোহার ও চামারই ছিল কারিগরদের মধ্যে প্রধান। মজুরি ছাড়াও তারা এই সব কাজের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেত। চাষীদের জমির একটা অংশে তারা চাষ করার অধিকার পেত। চাষ অবশ্য তাদের নিজেদের করতে হত না। চাষীরাই চাষ করত, বীজ বুনত, তারা শুধু বীজ দিত আর ফসলটা ভোগ করত। কুমোর মাটির পাত্র তৈরি করত, অন্যান্য কারিগরেরা এই সব পাত্র তাদের প্রয়োজন মতন নিত এবং তার পরিবর্তে কুমোরের

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দিত। নাপিত সকলের খেউরি করে দিত, পুরিত কাপড়চোপড় ধুয়ে দিত। গুরু আর মৌলানারা পুরোহিতের কাজ করত, মন্দির আর মসজিদ ছিল তাদের কাজের জায়গা। সোনারের কাজ কতকটা সরকারী পোদ্দারের মতন ছিল। ধাতু কষে যাচাই করা, বিবাহের গহনাদি গড়া, এই ছিল সোনারের কাজ। ভিল গ্রামের পাহারাদার। গ্রামের মধ্যে কে আসছে যাচ্ছে, চুরি জুয়াচুরি হচ্ছে কি না, রাজকর্মচারীদের আসবাব-পত্তর ঠিক আছে কি না, রাজস্ব সময় মতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কি না, এইসব তদারক করা হল ভিলের কর্তব্য। 'কোলি' বা কুলিদের কাজ হল গ্রামে রাজকর্মচারী বা অন্যান্য মাননীয় অতিথিরা এলে তাদের সেবাযত্ন করা, মালপত্তর বয়ে নিয়ে আসা-যাওয়া। মঙদের কাজ কতকটা চামারদের মতন, দড়ি পাকানো, ঝুড়ি বোনা ইত্যাদি। মুহারের কাজ যে কি তা ঠিক করে বলা কঠিন। মুহারকে গ্রামের সকলের অভিভাবক বলা চলে, সকলের প্রয়োজন অভাব অভিযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মুহার পরিচিত। তাই কোনো ঝগড়াঝাটি নিষ্পত্তির সময় মুহারের সাক্ষি একান্ত প্রয়োজন।[৮]

১৮৪৫ সালে গুডইন সাহেব দাক্ষিণাত্যের গ্রামসমাজের এই নকশা এঁকে-ছিলেন। এই নকশা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, অর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ভারতীয় গ্রামসমাজের গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। কৃষক ও কারিগরদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, তারই সংলগ্ন চাষের জমি, চারণভূমি। কৃষকেরা জমি চাষ করে ফসল ফলায়, উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ রাজস্ব দেয়, কিছু দেয় গ্রামের কারিগরদের, বাকিটা নিজে ভোগ করে। জমি যতদিন কৃষক আবাদ করে এবং তার নির্দিষ্ট রাজস্ব দেয় ততদিন জমি তার, পুরুষানুক্রমেও তার ভোগ করতে বাধা নেই। কারি-গর কারুশিল্পী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী যারা তারা তাদের নিজেদের কাজ করে, গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মেটায় এবং তার পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ তারা পায়। গ্রামের হাট বা সীমানার বাইরে যাবার তাদের দরকার হত না। পথঘাট যানবাহন যখন একরকম ছিলই না বলা চলে, তখন গ্রামের সঙ্গে গ্রামের অথবা গ্রামের সঙ্গে নগরের যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হত না। খেয়ে পরে কাজ করে গ্রামের মধ্যেই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনের দিনগুলো কেটে যেত। তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্যম বা কোনোটারই মূল্য ছিল না মানুষের কাছে। তাই পরম নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রামসমাজ অচল অটল হিমালয়ের মতন সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা বিক্ষোভ মাথা পেতে সহ্য করেছে।

দুঃখদারিদ্র্য অভাব অভিযোগ বিক্ষোভ আমাদের এই গ্রামসমাজের নির্বিকার উদাসীনতা যে মধ্যে মধ্যে ভেঙে দেয়নি তা নয়। দুর্ভিক্ষ মহামারী অন্যায় অত্যাচার অনেকবার হয়ত পাঁচ লক্ষ 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ের' ধ্যানভঙ্গ করেছে। প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজা সবসময় তাঁর কর্তব্য পালন করতেন না, রাজস্ব কর-আবওয়াবও নানা উপায়ে বাড়াতেন। শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত বোঝাটা কৃষক ও কারিগরদের পিঠের উপরে পড়ত। গ্রামণী গ্রামিক সমাহর্তা সংবিধাতা প্রধান দেশমুখ্য পাতিল কুলকানি ডিহিদার সিরাজদার থানাদার চৌধুরী প্রভৃতি দেশপ্রধানরা সবসময় যে ন্যায়দণ্ড নিয়ে রাজকাজ করতেন তাও কল্পনা করবার কোনো কারণ নেই। পাতিল ও কুলকানিদের কর্তৃত্বের দাপটে দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যসমাজ যে রীতিমত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও দেখা যায় যে হিন্দুযুগের সামন্তরাজারা কোনো রাজার অধীনতা স্বীকার করতেন না। তাঁরা একরকম স্বাধীনভাবেই থাকতেন, আর রাজারা 'নিখিল চক্রতিলক'-রূপে উপরে বিরাজ করতেন। সামন্তরাজাদের নিজেদের সৈন্যসামন্ত, বিচারের আদালত প্রভৃতি ছিল। পাঠান রাজত্বকালে জায়গীরদারেরা দেশের ভিতরে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। দেশে শাসন ও শান্তি রক্ষার জন্য হিন্দুদের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হত। সেইজন্য পাঠান আমলে হিন্দু ভূস্বামী ও অধিকারীদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। মোগল অধিকারের ঠিক আগে এই ভূস্বামীরা 'ভুঁইয়া' নামে প্রসিদ্ধ হন। এই ভুঁইয়ারাই 'বারভূঞে বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল' (মানিক গাঙ্গুলী), 'গজপৃষ্ঠে নৃপতি বেষ্টিত বারভুঞা' (ঘনরাম)। মোগলেরা এঁদের রাজ্য অধিকার করে নিলেও এঁরা স্বাধীন ছিলেন। 'সমস্ত পাঠান ও বাঙালীরা ইহাদের অধীনতা স্বীকার করে'।[৯] প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রামচন্দ্র, ঈশা খাঁ প্রমুখ ভুঁইয়াদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি 'নিখিল চক্রতিলকের' রাজকীয় প্রভাবকে ম্লান করে দিত। পাঠান আমলে আদায়কারী চৌধুরী ও ক্রোরীরা বংশানুক্রমে জমিদারে পরিণত হন। যেমন একালের প্রধান জমিদারদের মধ্যে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় মোগলদের বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙলায় আসেন এবং তাঁর পুত্র বাবু রায় বর্ধমান ও তার পাশাপাশি পরগণার চৌধুরীর কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্তী বর্ধমান অধিপতিরা 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। দিনাজপুরে আকবরশাহের রাজত্বের শেষভাগে বিষ্ণুদত্ত প্রাদেশিক কানুনগো ছিলেন।* শাজাহানের রাজত্বকালে তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত 'চৌধুরী'

---

* জমিদারী বন্দোবস্তের হিসাব রক্ষার জন্য কানুনগো নিয়োগ করা পাঠান আমলে

দিনাজপুরের জমিদারী পান। শ্রীমন্তের দৌহিত্রের বংশই দিনাজপুরের রাজা হন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দও কানুনগো দফ্‌তরে কাজ করতেন। পরে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে ভবানন্দ উখড়া প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদারী পান। এইভাবে পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে বাঙলা-দেশে চৌধুরী ক্রোরী কানুনগো আমিল শীকদার পাটোয়ারী প্রভৃতি রাজ-কর্মচারীরা ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। দেশীয় প্রথানুসারে পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায় করার জন্য এইসব রাজকর্মচারী ক্রমে ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী হয়ে উঠলেও সেকালের জমিদারেরা আজকালকার জমিদারদের মতন ভূমির স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেননি। ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মতন গ্রাম্যসমাজের প্রজারাও পুরুষানুক্রমে একই স্থানে বসবাস ও চাষবাস করার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু এ সবই হল প্রথানুগত্য, বিধিবদ্ধতা এর মধ্যে কোথাও ছিল না।[১০]

রাজা-রাজ্‌ড়া, নবাব-বাদ্‌শাহ, জায়গীরদার-ডিহিদার-চাকলাদার-তরফদার চৌধুরী-ক্রোরী-হাজারী, কানুনগো-পাটোয়ারি-আমিল-শীকদার প্রভৃতি যত-রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী স্বত্বভোগীর উদ্ভব হোক না কেন, বাংলার তথা ভারতের গ্রাম্যসমাজের ভিত তাঁদের দাপটে কেঁপে উঠলেও ভেঙে পড়েনি। ভারতের তথা সারা এসিয়ার গ্রাম্যসমাজের এই হল বৈশিষ্ট্য। 'মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝঞ্ঝার নিচে এসিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে ছিল'—কার্ল মার্ক্‌সের এই কথার গুরুত্ব খুব বেশি। সকলের সবরকমের স্বত্ব-উপস্বত্ব স্বীকার করেও বলা যায়, কারও উপরেই বিধিবদ্ধ দখলীস্বত্ব নেই কারও, যে যার স্বত্ব দেশীয় প্রথানুসারে পুরুষানুক্রমে ভোগ করে মাত্র, রাজা রাজার, জমিদার জমিদারের, প্রজা প্রজার। উদাসী বৈরাগীর মতন সকলের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব উপেক্ষা করেছে এদেশের আত্মকেন্দ্রিক ধ্যানমগ্ন গ্রাম্যসমাজ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোনো রাজা-বাদ্‌শাহ ভূস্বামী তার ধ্যান ভাঙতে পারেননি।

প্রবর্তিত হয়। মোগল রাজত্বকালে পরগণার নিরিখবন্দী এবং জমিদার ইজারাদারদের কাজকর্ম তদারক করার জন্য পরগণা-কানুনগো থাকতেন। 'নিরিখবন্দী' অর্থে গ্রামের বা পরগণার জমির বিঘাপ্রতি ধার্য করের হিসাব-রেজিস্টার বোঝায়। গ্রাম্য পাটোয়ারি এই নিরিখবন্দী অনুসারে কাগজপত্র রাখতেন। নতুন বন্দোবস্ত তাঁর দফ্‌তরেই খারিজ-দাখিল করে নিতে হত। এই কারণে প্রধান কানুনগো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে প্রধান কানুনগো বংশের বসতবাড়ি আছে। (১৯৪৮)

'গ্রাম্যসমাজগুলি ঠিক যেন ছোট ছোট গণরাষ্ট্রের মতন। তাদের যা প্রয়োজন সবই তারা নিজেরাই সরবরাহ করে, বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে হয় না। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট। রাজ্য ভাঙে গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে, হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা শিখ ইংরেজ সকলের প্রভুত্ব একে-একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু গ্রাম্যসমাজের কোনো পরিবর্তনই হয় না। ঝড়ঝঞ্ঝা গৃহযুদ্ধের সময় তারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। বিজয়ী রাজার সেনা-বাহিনী হয়ত গ্রামের পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে অভিযান করে যায়। গ্রাম্যসমাজ তার শস্যসম্পদ গবাদি পশু সব আগ্‌লে রেখে দেয়। তা সত্ত্বেও যদি আক্রমণ অত্যাচার তাদের উপরেই হয় তাহলে একস্থান থেকে আর-একস্থানে তারা চলে যায়। তারপর আবার যখন ধীর শান্ত হয়ে আসে চারিদিক, তখন তারা ফিরে আসে স্বস্থানে, এবং সেই স্থানের সেই গ্রাম্যসমাজ গড়ে তোলে। এমন কি একপুরুষ ধরেও যদি কোথাও অশান্তির ঝড় বইতে থাকে তাহলেও তার পরবর্তী বংশধরেরা আবার পরিবেশ শান্ত হলে ফিরে আসে, সেইখানেই আগেকার ভেঙে-যাওয়া গ্রাম্যসমাজ আবার সযত্নে গ'ড়ে তোলে।'[১১]

মেট্‌কাফ সাহেব গ্রাম্যসমাজের এই নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা শিখের সঙ্গে ইংরেজের নাম উল্লেখ করা মারাত্মক ভুল হয়েছে। তার কারণ কার্ল মার্ক্‌সের প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সুন্দর করে বলা হয়েছে: 'যে সব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চাইতে উন্নত। ব্রিটিশরা ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্পবাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে...'। তাছাড়া প্রাচীন ইতিহাসে এদেশে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রামেরও উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পিটক ও সূত্তপিটকে একবর্ণবহুল গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন ব্রাহ্মণগ্রাম ব্রাহ্মণনিগম ক্ষত্রিয়গ্রাম বৈশ্যগ্রাম ইত্যাদি। একবর্ণবহুল গ্রামের মতন এমন কতকগুলি গ্রামের কথাও জানা যায় যেখানে একবৃত্তির লোকেরা বাস করত, যেমন কুম্ভকারগ্রাম সূত্রধরগ্রাম তন্তুবায়গ্রাম কর্মকারগ্রাম ইত্যাদি। কেন এইভাবে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে উঠেছে তাও ভাবা দরকার। গ্রাম্য-সমাজের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য তা নিশ্চয়ই এই গ্রামগুলির মধ্যে ছিল না। পাশাপাশি সব গ্রাম গ'ড়ে উঠত এবং এইরকম কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম্যসমাজ, অথবা উচ্চবর্ণের সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে, বর্ণবিদ্বেষের

প্রতিক্রিয়ায় এইভাবে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে ওঠাও আদৌ অস্বাভাবিক নয়।[১১]

যাই হোক না কেন, গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এবং তার অবনতি ও বিপর্যয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এদেশে ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত তার প্রধান ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম এই গ্রাম্যসমাজের ভিত পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে। কেন ভেঙেছে এবং কিভাবে ভেঙেছে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। তার আগে সেকালের নগর ও নাগরিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ ইংরেজরা শুধু যে এদেশের গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে তা নয়, মধ্যযুগের নগর ও নাগরিক জীবনও ধ্বংস করে দিয়েছে।

সেকালের নগর ও নাগরিক জীবন

ভারতীয় নগরগুলির বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তীর্থস্থান, রাজদরবার অথবা বাণিজ্যের বন্দর কেন্দ্র করেই এগুলি গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রথম দুইশ্রেণীর নগরই বেশি, বাণিজ্যকেন্দ্র বেশি নয়।[১২] প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বৌদ্ধযুগের তক্ষশিলা বারাণসী শ্রাবস্তী উজ্জয়িনী কৌশাম্বী বৈশালী রাজগৃহ প্রভৃতি অনেক সমৃদ্ধশালী নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও হিন্দুযুগের নগরগুলি থেকে আরম্ভ করে আহমেদনগর বিজাপুর গোলকুণ্ডা দিল্লী আগ্রা মুর্শিদাবাদ ঢাকা প্রভৃতি মুসলমানযুগের নগরের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় একই দেখা যায়। মধ্যযুগে ইয়োরোপের নানাস্থানে যেসব নগর গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের নগরগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হিন্দুযুগের নগরের মোটামুটি পরিচয় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' দেখা যায় নগরগুলি প্রায়ই পরিখা ও প্রাকার-বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ছোট ছোট দুর্গ থাকত। প্রাচীর সাধারণত পাথরের তৈরি হত, পাথরের অভাবে কাঠ দিয়েও তৈরি হত। দুর্গের মধ্যে সদাসর্বদা সুসজ্জিত সৈন্য থাকত। লোক-জনের আনাগোনার জন্য প্রাচীরের মধ্যে 'দ্বার' থাকত. 'অর্থশাস্ত্রে' এইরকম দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে 'মহাদ্বার' বলা হত, তার একদিকে থাকত মহাদ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্মচারী ও রক্ষীদের বাসস্থান, অন্যদিকে থাকত শুল্কাধ্যক্ষের অফিস বা শুল্কশালা। কেউ নগরের

মধ্যে প্রবেশ করতে অথবা বেরোতে গেলে নগরপালের কর্মচারীরা তার পরিচয় নিয়ে তবে অনুমতি দিত। আগন্তুকদের 'মুদ্রা' বা পাসপোর্ট দেখাতে হত। শুল্কাধ্যক্ষের কর্মচারীরা সকলের মালপত্তর পরীক্ষা করত, নির্দিষ্ট পণ্যের উপর ধার্য শুল্ক না দিয়ে কেউ রেহাই পেত না। নগরপরিকল্পনা সম্বন্ধেও 'অর্থশাস্ত্র' থেকে মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। নগরের ভিতরে পুব থেকে পশ্চিমে তিনটি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনটি রাজপথ থাকত। এই কয়টি রাজপথ ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট পথ ও অলিগলি থাকিত। নগরের ভিতরে এক-এক বর্ণের ও বৃত্তির লোক বাস করত। গন্ধমাল্য ব্যবসায়ী, সূত্র ব্যবসায়ী, ধান্য ব্যবসায়ী, তন্তুবায় চর্মকার কুম্ভকার স্বর্ণকার লৌহকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরা নগরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও দাসদের স্বতন্ত্র বসতির ব্যবস্থা ছিল। নগরের নানাস্থানে মন্দির স্তূপ বিহার উদ্যান পুষ্করিণী ক্রীড়াশৈল ক্রীড়াব্যাপী ফলফুল লতাগুল্ম নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করত।[১৪] 'অর্থশাস্ত্র' ছাড়াও 'মানসার', 'শিল্পরত্ন', 'শিল্পশাস্ত্র', 'শুক্রনীতি', 'বাস্তুচন্দ্রিকা' প্রভৃতি শিল্প-শাস্ত্রের মধ্যে সেকালের নগরপরিকল্পনার বিষয় জানা যায়। নগর, দুর্গ (সুরক্ষিত নগর), রাজধানী, পত্তন (সামুদ্রিক বন্দর), দ্রোনমুখ (নদীমুখের বন্দর), শিবির, স্থানীয় (সীমান্ত নগর), নিগম (শিল্পবাণিজ্য নগর), শাখানগর (শহরতলী) ইত্যাদি বিভিন্ন নগরের এবং 'দণ্ডক' (সোজা দণ্ডের মতন একপথবিশিষ্ট নগর), 'স্বস্তিকা' (স্বস্তিকাচিহ্নের মতন নগর), 'পদ্মক' (পদ্মফুলের মতন নগর), 'কর্মুক' (ধনুকের মতন নগর), 'চতুর্মুখ' (চারটি মুখ বা দ্বারবিশিষ্ট নগর), 'প্রস্তর' (প্রস্তরনির্মিত নগর), 'সর্বতোভদ্র' (এগারটি উত্তরমুখী এবং এগারটি পূর্বমুখী পথবিশিষ্ট নগর), 'নন্দাবর্ত' (উদ্যানপুরী) ইত্যাদি নগরপরিকল্পনার পরিচয় এইসব শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া যায়।[১৫] হিন্দুযুগের নগরগুলির এই পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানযুগের নবাব-বাদ্‌শাহরা একেবারে বর্জন করেননি। মুসলমানযুগে নগরের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হলেও নগরপরিকল্পনার বিশেষ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। হিন্দুযুগের নগর বিহার মন্দির মুসলমান নবাব-বাদ্‌শাহরা অনেক ধ্বংস করেছিলেন। তার পরিবর্তে তাঁরা বড় বড় মসজিদ প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন, নগরের প্রাকারগুলোকে আরও মজবুত ও উঁচু করেছিলেন, আর সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য প্রশস্ত বাদ্‌শাহী শরণি তৈরি করেছিলেন।[১৬] ভারতীয় 'স্থাপত্যে' ইসলামের দান বিশেষ উল্লেখ্য হলেও, মধ্যযুগের 'নগর-পরিকল্পনা'য় মুসলমানযুগের দান খুব বেশি নয়।

মধ্যযুগের নগরপরিকল্পনা সেযুগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি এবং সংকীর্ণ জীবনদর্শনের সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেকথা গেডেস, মামফোর্ড প্রমুখ খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানীরা ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় নগরগুলির বিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই পৃথিবীর সর্বত্র, কি ইয়োরোপে, কি এসিয়ায়, মধ্যযুগের নগরগুলির সাদৃশ্য এত বেশি। সেই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাকার ও দুর্গ গঠন, সেই রাজা-বাদ্‌শাহের বিরাট বিরাট কারুকার্য-করা প্রাসাদ অট্টালিকা বিলাসভবন প্রমোদ-উদ্যান, সেই গির্জা-বিহার মন্দির-মসজিদ, বাণিজ্যকেন্দ্র, টোল-পাঠশালা-মক্তব-মাদ্রাসা, কারুশিল্পীদের কারখানা কারুসংঘ বা গিল্ড প্রভৃতি সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এদেশের প্রাচীন নগরগুলিতে ছিল। নগর প্রাসাদ মন্দির মসজিদ এবং ভোগবিলাসের শৌখিন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য, নির্মাণের জন্য কারিগর ও কারুশিল্পীদের নগরে নিয়ে আসাও হত। এইভাবে গ্রাম থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরেরা উজাড় হয়ে যেত। কারুশিল্পীরা নগরে এসে সাধারণত রাজা-বাদ্‌শাহ আমলা-অমাত্যবর্গ পারিষদবর্গ প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর অভিজাতদের জন্য বিলাসের জিনিস তৈরি করত। রাজা-বাদ্‌শাহরা নিজেদের সরকারী কারখানাতে বেতন দিয়েও কারিগর নিযুক্ত করতেন। সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা শৌখিন জিনিস কারুশিল্পীরা তৈরি করত। তাদের কারিগরি ও দক্ষতা অসাধারণ ছিল। এদেশে মুসলমানযুগে কারুশিল্প ও কারিগরিবিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতি হয়। কিন্তু কারিগরি সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বলতে উন্নত নির্মাণপদ্ধতি বা হাতিয়ারের ব্যবহার বোঝায় না। কারিগরিবিদ্যা প্রথমে গোষ্ঠী ও সংঘের মধ্যে, পরে বংশের মধ্যে এবং ক্রমে বংশ থেকে সেরা শাগরেদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। উন্নত হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়নি, শুধু অসীম অধ্যবসায় এবং অমানুষিক অভি-নিবেশের প্রয়োজন হয়েছে। রাজা-বাদ্‌শাহের অনুগ্রহের ছায়াতলে, কারখানার বন্দী ঘরে কারুশিল্পীরা দিনের পর দিন শৌখিন জিনিস তৈরি করেছে। তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে, দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত বংশানুক্রমে লব্ধ কারিগরিবিদ্যাও লুপ্ত হয়েছে। উৎপাদনের শক্তি বাড়েনি, উৎপাদনের পদ্ধতি কলাকৌশল ও হাতিয়ারের উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত শুধু সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার সংকীর্ণ আনাচে-কানাচে ঘুরে কারুশিল্প জড়ত্বলাভ করেছে, কারুশিল্পীর অপমৃত্যু ঘটেছে।

দাসযুগ সামন্তযুগ ও বণিকযুগের বিকাশ (ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে)

এখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কেন ইয়োরোপের মতন ভারতবর্ষে সামন্তপ্রথার (Feudalism) পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি ? ধনবান শ্রেষ্ঠী সদাগর ভারতবর্ষে যথেষ্ট থাকলেও, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার হলেও, কেন এদেশে ইয়োরোপের মতন সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপ থেকে বনিকতন্ত্রের (Mercantilism) বিকাশ হয়নি এবং সেই বনিকতন্ত্র কেনই বা ধীরে ধীরে ধনিকতন্ত্রের (Capitalism) মধ্যে পরিণতিলাভ করেনি। উত্তর হল, ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এই উত্তর সম্পূর্ণ নয়। আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে গ্রাম্যসমাজের বিকাশ পৃথিবীর অন্যত্রও হয়েছিল, কিন্তু সেই গ্রাম্যসমাজ পরবর্তী যুগে ভেঙে গেছে। ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের এই অচলতার ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণ কি ? প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আজ পর্যন্ত যাঁরা গবেষণা করেছেন, শুধু তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই তাঁদের গবেষণাপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়েছে।[২৭] বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগ ও হিন্দুযুগের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিলালিপি ও শাস্ত্রবচনের সাহায্যে বিবৃত করেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানীর কার্যকারণ-সম্বন্ধের দৃষ্টি নিয়ে কেউ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেননি। তাই তাঁদের ইতিহাস সৃজনশীল না হয়ে তথ্যবহুল ক্যাটালগ হয়েছে মাত্র। প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তির শতাব্দীব্যাপী জড়তার মূল কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের বিষয়-বহির্ভূত। তাহলেও উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন এবং ভারতের অর্থনৈতিক জড়তার মূল কারণ নির্দেশ না করলে ব্রিটিশযুগে বাংলার তথা সারা ভারতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব-জাগরণের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এখানে তাই মূল কারণটি শুধু নির্দেশ করার চেষ্টা করব।

মূল কারণ হল টেক্‌নোলজিকাল। যুগে যুগে অর্থনৈতিক প্রগতি প্রত্যেক দেশে সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির ক্রমোন্নতির জন্য। 'টেক্‌নো-লজিকাল উন্নতির' অর্থ হল উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-হাতিয়ারের উন্নতি। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা যাকে লৌহযুগ (Iron Age) বলেন সেই লৌহযুগের পর থেকে, অর্থাৎ প্রায় ঐতিহাসিক যুগের গোড়া থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-হাতিয়ারের বিশেষ কোনো উন্নতি এদেশে হয়নি। ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের জড়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্‌স ঠিক

এই কথাই বলতে চেয়েছেন। মার্ক্স বলেছেন: 'একই ধরনের সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদন-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য।' এখানে বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে টেক্‌নোলজিকাল স্থিতি অথবা অবনতিই ভারতে অর্থনৈতিক কাঠামোর জড়ত্বের মূল কারণ। শুধু সামন্তপ্রথা নয়, দাসপ্রথা ও সামন্তপ্রথা কোনোটাই ভারতবর্ষে ইয়োরোপের মতন পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থারূপে বিকাশলাভ করেনি। ইয়োরোপের মতন ভারতবর্ষে সামন্তপ্রথার বিকাশ কেন হয়নি তার কারণ বিশ্লেষণ করে এঙ্গেল্‌স বলেছেন: 'আমার মনে হয় আরব পারস্য ভারতবর্ষ প্রভৃতি এসিয়াটিক দেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশই হল প্রধান কারণ। এই সব দেশের মাটির গুণে ঠিক ইয়োরোপের মতন ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিকাশ এখানে হয়নি দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের ব্যবস্থা না করলে এখানে কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী, এবং এই জটিল ব্যবস্থার গুরুদায়িত্ব 'কমিউন' বা প্রদেশের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ। প্রধানত এই কারণেই প্রাচ্যসমাজে (ভারতবর্ষেও) ইয়োরোপের মতন সামন্তপ্রথার অথবা ভূমিস্বত্বের বিকাশ হয়নি।'[১৮] সামন্তপ্রথার বিকাশ তো হয়ই নি, গ্রীস ও রোমের মতন ভারতবর্ষে দাসপ্রথারও বিকাশ হয়নি অনেকটা এই একই কারণে। এই কারণেই টেক্‌নোলজিকাল উন্নতির যে বাস্তব তাগিদ ও উদ্যম তা ভারতবর্ষে দেখা যায়নি। তাই উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-হাতিয়ারের কোনো উন্নতি হয়নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়েছে, বিজ্ঞানচর্চার অবনতি হয়েছে। ছদ্মবেশী ধর্মরাজ্যের আওতায় শিথিল দাসপ্রথা ও সামন্তপ্রথা যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে তাই পাশাপাশি পুষ্টিলাভ করেছে। এমন কি, ব্রিটিশ যুগের পরিবর্তন সত্ত্বেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বৈদিকযুগের চাষবাস পশুপালন ও রাজপ্রথার পরে বৌদ্ধযুগের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কি দেখা যায়? রিস ডেভিস বলেছেন:[১৯] "সমাজের শীর্ষস্থানে ক্ষত্রিয়েরা, অভিজাতরা ছিল। তারপর যাজ্ঞিক পুরোহিতদের বংশধর বলে দাবি করে ব্রাহ্মণেরা ছিল। তার নিচে ছিল কৃষকেরা ও জনসাধারণ। তাদের নিচে ছিল শূদ্ররা। শূদ্রদের নিচেও 'হীন জাতি' বা ছোট জাতি এবং 'হীন সিল্পানি' বা ছোট কারবারের লোকেরা ছিল।' এছাড়াও ছিল গোলামরা। যারা যুদ্ধে বা লুঠতরাজে ধরা পড়ত, অন্যায়ের জন্য দণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা হারাত, তারা গোলামে পরিণত হত। গোলামরা অধিকাংশই বাড়ির চাকর থাকত, তাদের প্রতি সব সময় খারাপ ব্যবহারও

করা হত না। গোলামদের কোনোরকমের স্বাধীনতা ছিল না, তারা ছিল গরুর মতন, মনিবের করুণাশ্রিত।[২০] তাছাড়া 'গঙ্গামালা' জাতকে দেখা যায় যে, দিনমজুরশ্রেণীও ছিল। দিনমজুরেরা মনিবের বাড়িতে খাটত, খেতে পেত, সন্ধ্যার পরে নিজেদের বাসায় ফিরে যেত। এখানে গোলামদের চাইতে দিনমজুরদের অবস্থা ভাল ছিল দেখা যায়।

যাই হোক, বৌদ্ধযুগে যে দাসপ্রথা ছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। দাসরা শুধু যে মনিবের বাড়িতে চাকর থাকত তাও নয়। ক্ষেত-খামারে চাষের জন্য, শিল্পোৎপাদনের কাজের জন্য এবং ব্যক্তিগত সেবা-শুশ্রূষার জন্য দাসদের নিযুক্ত করা হত। বৌদ্ধজাতকে ও ত্রিপিটক গ্রন্থগুলিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[২১] কিন্তু তাহলেও বৌদ্ধযুগে গ্রীস ও রোমের মতন এই দাসপ্রথার ব্যাপক বিকাশের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। দাসপ্রথার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি বলেই ভারতবর্ষে আদিম গোষ্ঠীসমাজ আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজে পরিণত হয়ে জড়ত্বলাভ করেছে। অনেকে এইকথা শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন এবং মানবতার দিক থেকে বিচার করে বলবেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাসপ্রথার ব্যাপক বিকাশ না হওয়াতে ভারতের গৌরববৃদ্ধি হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে অনেকে এই দিক থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[২২] কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা তা কখনই স্বীকার করবেন না, বিশেষ করে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা। প্রাচীনকালে ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে দাসপ্রথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির সহায়তা করে মানবসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে দেখা যায়। এঙ্গেল্‌স 'দাসপ্রথার' এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন :[২৩]

> দাসপ্রথা আবিষ্কৃত হয়েছিল।* আদিম সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তাদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রধান উৎপাদন-পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে আবার এই দাসপ্রথাই তাদের অবনতির কারণ হয়। কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে শ্রমবিভাগ সর্বপ্রথম দাসপ্রথার জন্যই সম্ভবপর হয় এবং হয় বলেই প্রাচীন সভ্যতারও পূর্ণ বিকাশ হয়। দাসপ্রথার প্রবর্তন না হলে গ্রীক রাষ্ট্র, গ্রীক শিল্পকলা,

* 'Slavery was invented'—এঙ্গেল্‌সের এই উক্তির মধ্যে 'invented' কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাসপ্রথা যে একটা 'টেক্‌নিক' বিশেষ, এঙ্গেল্‌স এই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন। উৎপাদনের টেক্‌নিকের উন্নতি না হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হতে পারে না। আদিম গোষ্ঠীসমাজের পরবর্তীকালে দাসপ্রথা উন্নত টেক্‌নিকরূপেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। (১৯৪৮)

গ্রীক বিজ্ঞানের বিকাশ হত না। দাসপ্রথা ভিন্ন রোম সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হত না। গ্রীক সভ্যতা ও রোম সাম্রাজ্যের বিকাশ না হলে আধুনিক ইয়োরোপের জন্ম হত না।··· প্রাচীনযুগের এই দাসপ্রথা ভিন্ন আধুনিক যুগের সোশ্যালিজ্‌মেরও বিকাশ হত না।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে নীতি ও মানবতার দিক থেকে অভিযোগ করা খুব সহজ। বর্তমান যুগের বাস্তব পরিবেশ অথবা মানসিক অবস্থার সঙ্গে দাস-প্রথার কোনো কিছু খাপ খায় না। কিন্তু কেবল এই কারণে দাসপ্রথাকে আমরা ঘৃণ্য বলে বর্জন করতে পারি না। দাসপ্রথার উদ্ভব কেন হয়েছিল, কি অবস্থায় হয়েছিল এবং ইতিহাসে তার দানই বা কি তা জানার প্রয়োজন আছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, তবু বলতেই হবে যে এককালে এই দাসপ্রথার প্রবর্তনের জন্যই মানুষের ও ইতিহাসের প্রগতি সম্ভব হয়েছিল। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে পশুত্বের বিরুদ্ধে মানুষকে প্রধানত পাশবিক উপায়েই সংগ্রাম করতে হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে রুশিয়া পর্যন্ত পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে প্রাচীন 'কমিউন' বা গোষ্ঠী-সমাজের অস্তিত্ব ছিল সেখানেই দেখা গেছে স্বেচ্ছাচারী প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। যেখানে এই আদিম গোষ্ঠীসমাজ ও গ্রাম্যসমাজবিলুপ্ত হয়েছে সেখানেই মানুষের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। দাসপ্রথাই এই গোষ্ঠীসমাজ ও গ্রাম্যসমাজ ধ্বংস করে উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেছে, উৎপাদনবৃদ্ধি করেছে।

দাসপ্রথার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌সের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে সরল ও স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ দাসপ্রথার জন্য সম্ভব হয়েছিল বলে প্রাচীনকালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি এবং কলাশিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে শিল্পবাণিজ্য ও কলাশিল্পের বিকাশ হয়েছিল, সাম্রাজ্যও প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু কতটা তা দাসপ্রথার ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য, আর কতটা ধর্মরাজতন্ত্রের বদান্যতা এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সংহতির জন্য, তা বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের প্রাধান্য বৌদ্ধযুগে নগণ্য ছিল না, ইয়োরোপীয় 'গিল্ডের' অনুরূপ কারুশিল্পীসংঘের পরিচয়ও বৌদ্ধযুগ থেকে পাওয়া যায় [২৪], কিন্তু তা সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ অথবা বণিক-তন্ত্রের উদ্ভব ভারতবর্ষে সম্ভব হয়নি। ইয়োরোপে যাকে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয় সেই অন্ধকার যুগেই ঘোড়ার লোহার ক্ষুর ও লাগাম (যার জন্য ঘোড়ার চলার বেগ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং স্থলযানবাহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন

ঘটে), জলচালিত যন্ত্র, বায়ুচালিত যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই মধ্যযুগে দাসপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব হয়নি।[২৫] মধ্যযুগের শেষে বাষ্পীয় শক্তি ও নানারকমের উৎপাদনযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হয় এবং বণিকতন্ত্রের ভিতর দিয়ে আধুনিক ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ভারতবর্ষে টেক্‌নোলজিকাল প্রগতি বা উৎপাদন-পদ্ধতি ও হাতিয়ারের উন্নতি আদৌ হয়নি, যানবাহন ব্যবস্থারও কোনো উন্নতি হয়নি। মহাভারতের 'মনোজবগামিনী' 'সর্ববাতসহ' 'যন্ত্রযুক্তা' নৌকা নিশ্চয়ই বাষ্পীয়পোত নয় এবং রামায়ণের 'পুষ্পকযান' যে কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় তা বলাই বাহুল্য। উৎপাদন-পদ্ধতির সহজ সরল আদিম রূপের পুনরাবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ টেক্‌নোলজিকাল অনুন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অবনতির জন্য, এবং সবার উপরে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য, ভারতবর্ষে দাসপ্রথা ও সামন্ত-প্রথা পাশাপাশি বিরাজ করেছে, দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। দাস সামন্ত শ্রেষ্ঠী বণিক সকলের উপরে প্রভুত্ব করেছেন রাজা-বাদশাহরা এবং সমস্ত 'তন্ত্রের' উপরে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কখনও ধর্মের সিংহাসনে, কখনও বীরত্বের সিংহাসনে। ইয়োরোপের মতন নগর ও গ্রামের মধ্যে শ্রমবিভেদের জন্য কোনো বিরোধ ভারতবর্ষে দেখা দেয়নি, নগরে বণিকের প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসমাহিত নির্বিকার উদাসীন, নগর সাধারণত শাসনকেন্দ্র অথবা তীর্থকেন্দ্র, কদাচিৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। দাসপ্রথা সামন্তপ্রথা সদাগরীপ্রথা সবই তাই ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় রাজপদ-প্রথার কাছে মাথা হেঁট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, সামন্ত-তন্ত্রও নয়, বণিকতন্ত্রও নয়।[২৬]

ব্রিটিশযুগের ঘাতপ্রতিঘাত

ব্রিটিশযুগে সর্বপ্রথম এই স্থবির ও স্থিতিশীল গ্রাম্যসমাজের ভিত পর্যন্ত ভেঙে যায়, কারুশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত পর্যন্ত ভারতের সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। জীর্ণ পুরাতনকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড গতিশীল নতুন যুগের আবির্ভাব যদি সম্ভব হত তাহলে তাকে ঐতিহাসিক অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা হত না। ব্রিটিশযুগে পুরাতনকে চূর্ণ দীর্ণ ও ধ্বংস করার প্রচণ্ডতা সর্বক্ষেত্রে দেখা গেলেও, নতুন যুগের আবির্ভাবের জন্য গঠন ও নির্মাণের উদযোগ কিন্তু আদৌ

দেখা যায়নি। তা না দেখা গেলেও, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্রিটিশদের গঠন ও নির্মাণের কাজ খানিকটা করতে হয়েছে এবং তার জন্যই চারিদিকে ধ্বংস-স্তূপের মধ্যেও নতুন যুগের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে।

বণিকের মানদণ্ড বাস্তবিকই 'পোহালে শর্বরী' রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয়নি। দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। ইংরেজ বণিকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে কোথাও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। এই শক্তিশালী পুঁজিপতি হবার চেষ্টাতেই ঘর ছেড়ে তাদের বাইরে যাত্রা করতে হয়েছে। উপনিবেশের গোড়াপত্তন এই অভিযানের পর থেকেই শুরু হয়। ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাইরের পৃথিবীতে ধনসম্পদ লুটের জন্য ব্রিটিশ বণিকদের অভিযান শুরু হয়। বণিকদের কোম্পানি গঠনও এই সময় আরম্ভ হতে থাকে। ব্রিটিশ বণিকদের মনোভাবের পরিচয় জন হেল্‌স ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটর টমাস মান প্রমুখ ইংরেজদের অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৭] ১৬২৮ সালে লিখিত এবং ১৬৬৪ সালে প্রকাশিত *England's Treasure by Forraign Trade* গ্রন্থে টমাস মান লেখেন :

> The ordinary means to encrease our wealth and treasure is by Forraign Trade, wherein wee must ever observe this rule : to sell more to strangers yearly than wee consume of theirs in value.[২৮]
>
> ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে হলে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করাই সাধারণ উপায়। কিন্তু এই উপায় সম্বন্ধে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিদেশীদের জিনিস আমরা যা ব্যবহার করব তার চাইতে বেশি জিনিস আমাদের বিক্রি করতে হবে বিদেশীদের কাছে।

এই উক্তির মধ্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের খাঁটি বণিক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক অভিযান এবং ইংরেজ বণিকদের সেই উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়েছে, আরেকদিকে ভারতের কৃষি কুটিরশিল্প অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য সমস্ত ধ্বংস করে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। কার্ল মার্ক্‌স বলেছেন :[২৯]

> ঔপনিবেশিক অভিযানের ফলে বাণিজ্য ও বাষ্পীয়যানের আশ্চর্য বিকাশ হল। বাণিজ্যের সনদ পেল যেসব কোম্পানি তারা বণিকশ্রেণীর প্রাথমিক

পুঁজি সঞ্চয়ের কাজে সহায় হল। উপনিবেশগুলি উদীয়মান বণিকদের পণ্যের বাজার তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয়ে দ্রুত মূলধন সঞ্চয়ে তাদের সাহায্য করল। প্রভুত্ব করে, লুঠতরাজ করে, খুনজখম করে, ইয়োরোপের বাইরে থেকে এইভাবে তারা যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল, অজস্র ধারায় সেই সম্পদ স্বদেশের ভাণ্ডারে এসে জমা হয়ে রূপান্তরিত হল 'মূলধনে'।

ইংলণ্ডের বণিকযুগ থেকে ধনিকযুগের পদার্পণের সন্ধিক্ষণে ভারতের পূর্বাঞ্চল ঘানয়ে এল। প্রভাবপ্রতিপাত্তিশালী ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সময় ভারতবর্ষে প্রভুত্ব লুঠতরাজ ও খুনজখম করে যে ধনসঞ্চয় করল, পরে সেই সঞ্চিত ধন 'মূলধনে' পরিণত হয়ে তাদের নিজেদের দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করে দিল। এই লুঠ-তরাজ-শোষণের কাহিনীতে এযুগের ভারতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি কলঙ্কিত হয়ে আছে। অনেক ইতিহাস-লেখক ও সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[৩০] তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই এখানে। দু'একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব, বিশেষ করে বাংলাদেশ সম্বন্ধে, কারণ তা না হলে ভারতের ইতিহাসে ইংলণ্ডের যে দু'টি ভূমিকার কথা ('double mission') কার্ল মার্ক্স বলেছেন—'destructive' এবং 'regenerating'—তার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

অত্যাচার লুঠতরাজ ও শোষণ সম্পর্কে উইলিয়ম বোলট্স লিখেছেন : 'এই অত্যাচার সর্বক্ষেত্রেই। বেনিয়ান ও গোমস্তাদের সংযোগিতায় ইংরেজরা খুশমত স্থির করত কোন্ ব্যবসায়ী কত দামে কি জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য। তাঁতিদের সম্মতির কোনো প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করত না। তাঁতিরা শর্ত পালন না করলে তাদের জিনিস কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে টাকা আদায় করা হত। রেশম ব্যবসায়ীদের উপরেও এই রকম অত্যাচার চলত। অত্যাচারের ফলে তারা অসহ্য হয়ে তাদের আঙুল পর্যন্ত কেটে ফেলেছে, যাতে তাদের কাজ করতে আর বাধ্য না হতে হয়।' এইভাবে গ্রামের তাঁতি কারিগর সব উজাড় হয়ে যায়। টমাস মানের নীতি কার্যক্ষেত্রে পরিণত হতে থাকে। গবর্নর হ্যারি ভেরেল্স্ট লিখেছেন : 'ইংরেজ কর্মচারীরা বা গোমস্তারা শুধু যে লোকের ক্ষতি করত তা নয়, সরকারের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করে যেখানে নবাবের কর্মচারীরা কিছু বলতে আসত সেখানেই তাদের উপর অত্যাচার করা হত। এইজন্যই মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।' ভেরেল্স্টের হিসাব অনুসারে ১৭৬৬, ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ সালে বাংলাদেশ থেকে

রফ্‌তানি হয়েছে ৬৩,১১,২৫০ পাউণ্ড এবং আমদানি হয়েছে ৬,২৪,৩৭৫ পাউণ্ড দামের জিনিস। তার ফলে, ভেরেল্‌স্টের কথায় প্রত্যেকটি ইয়োরোপীয় কোম্পানি এদেশের টাকায় তাদের বাৎসরিক ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়েছে, কিন্তু তাতে এদেশের সম্পদ একেবারেই বাড়েনি।'[৩১] স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ বলেছেন: 'আমি এসে দেখলাম, কোম্পানির কর্মচারীদের যেসব ইয়োরোপীয় এজেন্ট আছে এবং সেই এজেন্টদের আবার যেসব এদেশী অনুচর আছে তারা এদেশে ইংরেজদের সুনাম কলঙ্কিত করবে।' যে দেওয়ানী পাবার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রকৃত প্রভু হয়ে দাঁড়াল, সেই দেওয়ানী সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছেন: 'এর ফলে সমস্ত খরচ বাদ দিলেও কোম্পানির খাঁটি মুনাফা হবে অন্তত ১২১ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১৬,৫০,৯০০ পাউণ্ড স্টার্লিং।'

এইভাবে ইংরেজ বণিকদের নির্লজ্জ শোষণ ও লুঠতরাজ চলতে লাগল। কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প ধ্বংস তো হলই, ভূমিরাজস্বব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলার কৃষকের ও কৃষির চরম অবনতি ঘটল। ১৭৭০-৭১ সালে (১১৭৬ সন) দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে ইতিহাসে কুখ্যাত। কিন্তু তাতে কোম্পানির আয় কমল না। ১৭৭২ সালে বাংলার গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস কোর্ট অব ডিরেক্টার্সদের লিখলেন: 'যদিও এই প্রদেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মরে গেছে এবং চাষবাসের চরম অবনতি হয়েছে, তাহলেও ১৭৭১ সালের নিট আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশি। এ সম্ভব হয়েছে শুধু কড়া তাগিদের ফলে।' ১৭৭২ সালে ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড অব্ রেভিনিউ গঠন করে বিভিন্ন স্থানে কলেক্টর নিয়োগ করা হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত করা হয়। তারপর কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য এদেশে আসেন। ১৭৮৯ সালে শোর সাহেব তাঁর বিখ্যাত স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি বলেন যে বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই হওয়া উচিত এবং সরকারী রাজস্ব মোট খাজনার দশভাগের নয়ভাগ হোক। ১৭৯১ সালে দশসালা বন্দোবস্তের জন্য নতুন আইন পাস করা হল। ১৭৯৩ সালের মধ্যে এই বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হল এবং তাতে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ১৭৯০-৯১ সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ হল ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা। মীরজাফরের রাজত্বের শেষ বছরে (১৭৬৪-৬৫ সালে) মহারাজা নন্দকুমার যে রাজস্ব আদায় করেছিলেন তা এর এক-তৃতীয়াংশ এবং জাফর খাঁ বা সুজা খাঁর মোট রাজস্বের পরিমাণ এর

অর্ধেকের বেশি ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব বেশি হারেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে বলে। ডিরেক্টরর এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ এই বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী' হবে বলে ঘোষণা করেন। রাজস্ব এইভাবে বাড়ানো হলেও কৃষি জলসেচব্যবস্থা অথবা অন্য কোনো জনকল্যাণকর কাজে সেই অনুপাতে তা ব্যয় করা হত না। ১৮৫০-৫১ সালেই দেখা যায় মোট ১,৯৩,০০,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হলেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতে জন-কল্যাণকর কাজে মাত্র ১,৬৬,৩৯০ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ০·৮ ভাগ ব্যয় করেন। বাংলার তথা ভারতের গ্রামসমাজ এই নতুন রাজস্বব্যবস্থার চাপে ভেঙে পড়ে। এঙ্গেল্‌স তাই মার্ক্‌সকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন :[৩১]

> প্রাচ্যরাষ্ট্রের তিনটি মাত্র বিভাগ উল্লেখযোগ্য : প্রথমটি হল অর্থ-বিভাগ (দেশের ভিতরে শোষণের সুবিধার জন্য), দ্বিতীয়টি হল যুদ্ধবিভাগ (ঘরে-বাইরে লুণ্ঠনরাজের জন্য,), আর তৃতীয়টি হল জনকল্যাণকর বিভাগ (উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্য)। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল দেখা যায়, কিন্তু তৃতীয় বিভাগটি তারা বর্জন করে। তার ফলে ভারতের কৃষিব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটে।

কৃষির অবনতি হয়, দুর্ভিক্ষে প্রদেশের পর প্রদেশ উজাড় হয়ে যায় এবং বহুযুগের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরতা ভেঙে যায়। কুটীরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশ বণিকরা টমাস মানের অর্থনৈতিক মন্ত্র বর্ণে বর্ণে পালন করে—'to sell more to strangers yearly than wee consume of theirs in value'—এবং তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এদেশে ইংলণ্ড থেকে শুধু তুলোর জিনিসের আমদানি ১৭৯৪ সালে মাত্র ১৫৬ পাউণ্ড স্টার্লিং থেকে ১৮১৩ সালে ১,০৮,৮২৪ পাউণ্ড স্টার্লিং পর্যন্ত বেড়ে যায়। বাস্তবিক মান সাহেবের 'Forraign Trade' বা বৈদেশিক বাণিজ্যই যে ধনসম্পদবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা তাতে সন্দেহ নেই। সদাগরী অর্থনীতির সাদাসিধা আদর্শ এবং ব্রিটিশ বণিকবুদ্ধি এইভাবে সার্থক হল এদেশে।

ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর মানদণ্ড ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। ব্রিটিশ বণিকদের অত্যাচার লুণ্ঠনরাজ শোষণ এবং বিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কায়েমী শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় পরিণত হল। শ্রমশিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) নামে ঐতিহাসিক টেক্‌নো-লজিকাল বিপ্লব প্রায় একশতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডে ঘটে গেল। হারগ্রীভ্‌স ক্রম্পটন আর্ক্‌রাইট প্রমুখ প্রতিভাবানেরা নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে

বয়নশিল্পে যুগান্তর আনলেন। জেম্‌স ওআট ও অন্যান্য গবেষকদের সাধনায় বাষ্পীয়শক্তি এবং বাষ্পীয়যন্ত্রের বিকাশ হল। বাষ্পীয়শক্তি চালিত যান্ত্রিক হাতুড়ি, বেসামার-মুসেট পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হল। লোহাকয়লাকেন্দ্রে বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠল।[৩৩] নতুন যুগ এল, বৈপ্লবিক এক নতুন যুগ, শ্রমশিল্প ও বিজ্ঞানের যুগ। ইংলণ্ডে বণিকযুগের অবসান এবং শ্রমশিল্পযুগের বিকাশ হল। ইংলণ্ডে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্রমিক বৃদ্ধির হার থেকে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়।* ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা সম্বন্ধেও সচেতন হল।

ঠিক এইসময় আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলে সেখানকার উপনিবেশগুলি ব্রিটিশের হাতছাড়া হয়ে যায়। নেপোলিয়ন ইয়োরোপীয় মহাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রায় বিতাড়িত করেন। সুতরাং ভারতবর্ষের দিকেই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দৃষ্টি পড়ে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার এইসময় কেড়ে নেওয়া হয়। তা না হলে ইংলণ্ডে শ্রমশিল্পের বিকাশ হয় না, শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বাজার মেলে না, নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর মূলধন নিয়োগ এবং মুনাফা বৃদ্ধিরও সুবিধা হয় না। তাই ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে এবং আর বিশ বছরের মধ্যে চীনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটে অধিকার লোপ পায়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একেবারে তুলে দেওয়া হয় এবং রাজ্যশাসন ও উপনিবেশ-শোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন সম্রাট, অর্থাৎ নতুন যাঁরা রাজা হলেন ইংলণ্ডে তাঁরা—ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী।

ইংলণ্ডের বাইরে ব্রিটিশ মূলধনের গতি-পরিবর্তনের ধারা থেকে ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্বার্ট বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিনির ব্যবসা এবং আফ্রিকার দাসব্যবসায় ব্রিটিশ জাতি ধনসঞ্চয় করতে আরম্ভ করে।[৩৪] নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর

---

* ইংলণ্ডে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির হার :

১৯১৩=১০০

১৭২০-২১=২·১	১৭৭০-৭১=৩·০
১৭৬০-৬১=২·৬	১৭৮০-৮১=৩·৫
১৭৯০-৯১=৪·৬	১৮১০-২১=৯·৭
১৮০০-০১=৫·৭	১৮৩০-৩১=১৪·৩
১৮১০-১১=৭·১	১৮৪০-৪১=১৯·৬

J. Kuczynski : A Short History of Labour Conditions in Great Britain, 1750 to the Present day, 2nd ed. 1944 পৃ: ৩৮

ইয়োরোপের পুনর্গঠনই ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির গবর্নমেন্ট-সিকিউরিটিতে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ মূলধন নিযুক্ত হয়। এ ছাড়া লাটিন আমেরিকায় ২ কোটি পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নালা বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ৫০-৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্রিটিশ ধূলধন এই সময়ের মধ্যে নিযুক্ত হয়।[৩৫] ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ মূলধনের প্রবাহ প্রধানত ইয়োরোপ ও আমেরিকামুখী ছিল। এইসময় রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রচুর ব্রিটিশ মূলধন ফ্রান্স বেলজিয়ম ইটালি অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে নিযুক্ত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রেলপথ তৈরির লোহার জিনিস ইংলণ্ড থেকে বাইরে রফ্‌তানি করা হয়। ১৮৫৭ সালে দেখা যায়, মোট ব্রিটিশ রফ্‌তানির এক-পঞ্চমাংশ হল লোহা তামা ও টিনের জিনিসপত্তর। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে প্রধানত ভারতীয় রেলপথ নির্মাণ ও জনকল্যাণকর ব্যবস্থাদির জন্য ব্রিটিশ মূলধন খাটানো হয়। ভারতীয় রেলপথের লোহার জিনিস সব ব্রিটেনই সরবরাহ করে এবং 'ইণ্ডিয়া অফিস' এই সময় ভারতের রেল কোম্পানিগুলির 'Fiscal Agent'-এ পরিণত হয়।[৩৬] প্রাইস বলেন যে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মূলধন প্রধানত ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের আমদানি রফ্‌তানি, জায়গা জমি গৃহসম্পত্তি কেনা এবং গুদামঘর তৈরির কাজেই নিযুক্ত ছিল। ১৮৭২ সালের মধ্যে দেখা যায় প্রায় ৯ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ মূলধন ভারতবর্ষে খাটানো হয়েছে।[৩৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে টেক্‌নোলজিকাল বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্রমিক বৃদ্ধি, পণ্য রফ্‌তানি বৃদ্ধি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক, বিশেষ করে মধ্যভাগ থেকে, ব্রিটিশ মূলধনের স্ফীত ও বহির্মুখী গতি, ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার, এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে হল ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর বিদেশে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ইতিহাসের মধ্যে ব্রিটিশ বণিকতন্ত্র ও বণিকশ্রেণীর অবসান এবং ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, বিশেষ করে মধ্যভাগে, ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্যের অবসান এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব বিস্তার এই কারণেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এইসময় কোম্পানির আমলের ধ্বংস ও লুণ্ঠনরাজের কাজ আরও দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হলেও, নতুন যুগের নির্মাণ ও পুনর্জীবনের

কাজও কিছুটা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন যুগের নির্মাণ ও নবজাগরণ অত্যন্ত মন্থরগতিতে হলেও নিশ্চিত শুরু হয়, মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চিহ্নগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অবশ্য 'নবজাগরণ' প্রধানত পাশ্চাত্ত্য ভাবসংঘাতের আলোড়ন, এবং সেই আলোড়নও প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নবাশিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল।

নতুন যুগের অর্থনৈতিক রূপ

ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের একমাত্র লক্ষ্য হল ইংলণ্ডের কলকারখানার প্রসারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা এবং ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য দ্রব্যের বাজার গ্রাম থেকে নগর মহানগর পর্যন্ত গড়ে তোলা। কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য চালানের সুবিধার জন্য যানবাহনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি হল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রধান কাজ। রেলপথ কয়লাখনি পাটকল চা-বাগান কফিবাগান ও নীল-ক্ষেতেই ব্রিটিশ মূলধন খাটানো হল বেশি। এমন সব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধন খাটে নো হল যা আবাদ করলে সোনা ফলবে অর্থাৎ মূলধন তো ফাঁপবেই, উপরন্তু এদেশের কাঁচামালে ব্রিটেনের কলকারখানারও উন্নতি হবে। একটিলে দুই পাখি মারার সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ভারতবর্ষে শ্রমশিল্পবিপ্লব ঘটল না। ভারতের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামো লণ্ডভণ্ড করে ব্রিটিশ পুঁজি-পতিরা নতুন যে শক্তি সঞ্চারিত করল তার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির পথে তারাই আবার বাধা সৃষ্টি করল। ভারতের বণিকশ্রেণী, ভারতের ভবিষ্যৎ ধনিকশ্রেণীকে ব্রিটিশ ধনিকরাই সচেতন করল, নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করল, পুরাতন প্রাকারবেষ্টিত নগর ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ সীমানা থেকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে নতুন যন্ত্রযুগের মুখোমুখি তাদের দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর পদে পদে তাদের অগ্রগতি ও আধিপত্য বিস্তারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করাই হল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু তাহলেও ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হল, প্রাচীন ভারতীয় সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল করে দিয়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করা। মার্ক্স বলেছেন : ৩৮

ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে জনসাধারণের সামাজিক

দুরবস্থার বাস্তব উন্নতি বা মুক্তি সম্ভব হতে পারে না। তার জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং শুধু বৃদ্ধিও নয়, সেই উৎপাদনশক্তি জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হবে তাতে আর কিছু না হোক, এই উন্নতি মুক্তি ও শক্তিবৃদ্ধির বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হবেই। ইতিহাসে কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর চাইতে বেশি কিছু করতে পেরেছে ?...

ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজব্যবস্থার বীজ ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে চারিদিকে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ইংলণ্ডের মজুরশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, অথবা যখন ভারতের জনসাধারণ নিজেরা সংগ্রাম করে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত হবে।

নতুন যুগের এই যে 'material premises' এবং 'new elements of society'র কথা মার্ক্স বলেছেন তা আরও চমৎকারভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মালিকশ্রেণীর রেলপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। মার্কস পরিষ্কার করে বলেছেন : [৩৬]

আমি জানি, ব্রিটিশ মিলমালিকশ্রেণী (millocracy) ভারতে রেলপথ নির্মাণে উদ্‌যোগী হয়েছে যাতে তাদের কলকারখানার জন্য তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধা হয়। কিন্তু একবার কোনো দেশের মধ্যে যানবাহনব্যবস্থায় যদি যন্ত্রদানবের আবির্ভাব হয় এবং সেদেশে লোহা ও কয়লাসম্পদ প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে, তাহলে সাধ্য কার যে তার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে ? বিরাট একটা দেশের ভিতরে যদি স্নায়ু-মণ্ডলীর মতন রেলপথ নির্মাণ করা হয় তাহলে বাধ্য হয়ে সেই রেলপথ চালু রাখার প্রয়োজনে সেদেশে যন্ত্রচালিত কলকারখানাও গড়ে তুলতে হবে। তার সঙ্গে অনিবার্য নিয়মে এমন সব কারখানাও গড়ে উঠবে, এমন সব শ্রমশিল্পে যন্ত্রশক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যার সঙ্গে রেলপথের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্কও থাকবে না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে রেলপথ ভারতীয় শ্রমশিল্পযুগের অগ্রদূত...রেলপথ বিস্তারের জন্য যেসব আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ হবে তার আঘাতে ভারতের অগ্রগতির পথের অন্তরায়গুলি একে একে দূর হয়ে যাবে, ভারতের বর্ণগোঁড়ামি, গ্রামসমাজের জড়তা, কূপমণ্ডূকবৃত্তি সব ভেঙে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির ধারা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও, একেবারে মিথ্যা হয়নি। নতুন যুগে ভারতের সামাজিক

প্রগতির যে 'বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি', 'নতুন উপাদান' ও 'নতুন বীজ' বপনের কথা মার্ক্স বলেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশযুগে বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দিকে ভারতের অর্থনৈতিক ঝোঁকের কথা অস্বীকার করা ভুল। নতুন যুগের এই নতুন ঝোঁক, নতুন গতিই হল বৈপ্লবিক।[৪০] রেলপথ তৈরি হবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল তৈরি হয়। ১৮২০ সালে রানীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনি খোঁড়ার পর প্রায় বিশ বছরের মধ্যে আর কোনো নতুন খনি খোঁড়া হয় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ তৈরির সময় থেকে খনির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে রানীগঞ্জে ও তার আশেপাশে প্রায় ৫৬টি কয়লাখনিতে কাজ শুরু হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে বোম্বাই প্রদেশে ১৮টি এবং বাংলায় ২টি কাপড়ের কল তৈরি হয়। পাটচাষ ও পাটশিল্প বাংলাদেশেরই একচেটিয়া ছিল বলা চলে। ১৮৫৪ সালে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পাটশিল্প আরম্ভ হয়নি। ঐ বৎসরে জনৈক মিঃ অক্‌ল্যাণ্ড প্রথম পাটের কল নির্মাণ করেন শ্রীরামপুরে। ১৮৮২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ২০টি পাটের কল তৈরি হয়, তার মধ্যে ১৮টি হয় বাংলাদেশে এবং এই ১৮টির মধ্যে ১৭টি কলিকাতার উপকণ্ঠে। আসামে চাবাগানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৬ সালের মধ্যে। গুজরাট ও পশ্চিমভারতে আগে নীলচাষ হত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তার অবনতি ঘটে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই নীলচাষের পুনঃপ্রবর্তন করে বাঙলাদেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাঙলাদেশে পূর্ণোদ্যমে নীলচাষ আরম্ভ হয় এবং মধ্যভাগে যথেষ্ট পরিমাণে নীল রফ্‌তানি হতে থাকে। রেলপথ নির্মাণের পর ভারতের সর্বত্র যে আধুনিক কলকারখানা ও খনির প্রসার হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়: [৪১]

ভারতের কলকারখানা খনি ও মজুরসংখ্যা

	১৮৭৯-৮০	১৮৮৯-৯০	১৯০০-০১
কাপড়ের কল			
মিলের সংখ্যা:	৫৮	১১৪	১৯৪
মজুরের সংখ্যা:	৩৯,৭৩৭	৯৯,২২৪	১০৬,৩৫৫
পাটের কল			
মিলের সংখ্যা:	২২	২৭	৩৬
মজুরের সংখ্যা:	২৭,৪৯৪	৬২,৭৩৯	১১৪,৩৯৫

কয়লার খনি
খনির সংখ্যা : ৭৬ (বাঙলাদেশের রানীগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে)
মজুরের সংখ্যা : ২২,৭৪৭ (১৮৮৫ সাল)

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ থেকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের আমদানি রফ্‌তানির হ্রাসবৃদ্ধি থেকে ভারতের নতুন অর্থনৈতিক প্রথার ঝোঁক্‌ আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে :

ভারতে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের আমদানি-রফ্‌তানি

	১৮৭৯	১৮৯২	১৯০৭
শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য			
টাকার হিসাব			
আমদানি :	২১৯,৮৬৫,৮৭২	৩৬১,২৩১,৮২৭	৬৯৮,৮৯৫,০০০
রফ্‌তানি :	৫২,৭৮০,৩৪০	১৬৪,২৪৭,৫৬৬	৩৯২,৯৮১,০০০
কাঁচামাল			
টাকার হিসাব			
আমদানি :	১৩৭,৫৫৫,৮৩৭	২৬৩,৮১৮,৪৩১	৭৯৯,৬৬৮,৩৭৪
রফ্‌তানি :	৭৯৬,৭২৭,৯৯১	৮৭৫,২০৯,৪৯৯	১,১৪১,২৩১,৩৩৫

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়লাখনি রেলপথ চাবাগান পাটকল কাপড়ের কল ইত্যাদি বেশি তৈরি হয় এবং সর্বক্ষেত্রে প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনই নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহলেও ভারতবর্ষে যে শ্রমশিল্পের বিকাশ হচ্ছে, বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণের পর, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এই সময় থেকে ভারতের অর্থনৈতিক গতি বণিকতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের দিকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই গতি ব্যাহত হয় ব্রিটিশের স্বার্থে এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ক্রমে নবজাগরণের ব্যর্থতায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।*

মহানগর অভিমুখে যাত্রা

রেলপথ ও যানবাহনের প্রসারের ফলে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কারুশিল্প ও কুটীরশিল্প উৎখাত হয়ে যায়। কারুশিল্পী ও কারিগরদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, উৎপাদনের

* সংযোজিত অধ্যায় 'বাংলার নবজাগরণ : সমীক্ষা ও সমালোচনা' পঠিতব্য।

যন্ত্রপাতির উপর কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিস্বাধীনতা তাদের আর থাকে না, সামান্য পুঁজিতে আর কুলোয় না। তার ফলে তারা বণিক ও ধনিকশ্রেণীর অধীনে বেতনভুক মজুরশ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে।[৪২] এই সঙ্গে গোমস্তা কেরানী ব্যাপারী দালাল প্রভৃতি নিয়ে এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। শ্রমশিল্প ও যানবাহনকেন্দ্রে নতুন শিল্পনগর গড়ে ওঠে। প্রাচীন মধ্যযুগীয় 'কোর্ট-টাউনের' জাঁকজমক ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। শিল্পকেন্দ্রে ও যানবাহন-কেন্দ্রে যে নতুন শহর ও মহানগর গড়ে ওঠে সেইদিকেই যাত্রা করতে থাকে নতুন বণিক ও ধনিকশ্রেণী, নতুন মধ্যবিত্ত ও মজুরশ্রেণী। আগ্রা আমেদাবাদ লক্ষ্ণৌ ঢাকা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মধ্যযুগের নগরগুলির প্রভাব ও আকর্ষণ কমতে থাকে। আমেদাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :[৪৩]

> আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো-ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর গল্পের।
>
> সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে ; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে ; ঘোড়-সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচ্‌কাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনানি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো—তার চারদিকে কোথাও নেই সেই রঙ, সেই সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

'পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে ; তার মাথার খুলিটা আছে, মুকুট নেই।' একথা শুধু পুরাতন আমেদাবাদ সম্বন্ধে যেমন সত্য, অন্যান্য মধ্যযুগের 'কোর্ট-টাউন' সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। নতুন যুগের স্বর্গপুরী হল শিল্পনগর শহর মহানগর। মহানগরেই দেশবিদেশের লোকসমাগম হয়, মহানগরেই কাজকর্মের অফুরন্ত সুযোগ পাওয়া যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষা চাকুরী মোসাহেবি সব কিছুর প্রশস্ত ক্ষেত্র মহানগর। তাই মহানগর অভিমুখে ঐশ্বর্য ধনসম্পদ ও মুনাফাবৃদ্ধির লোভে বণিক ও ধনিকরা যাত্রা করে, সুযোগসন্ধানী ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তরা ভাগ্যবান হবার আশায় আর হতভাগ্য ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক ও কারিগরেরা দিনমজুরির আশায়, জীবন-

ধারণের তাগিদে ভিড় করে মহানগরে। কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচী কানপুর জামসেদপুর প্রভৃতি নতুন যুগের শিল্পনগর শহর ও মহানগরের দ্রুত বিকাশ হয়, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপে নগরপরিকল্পনারও পরিবর্তন শুরু হয়। এযুগের রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি যদি বিগত শতাব্দীতেও থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তখন এরকম বিজ্ঞাপন দেশের ভিতরে নানাস্থানে দেখা যেত :[৪৪]

মহানগরে যাও

মুক্তি পাবে

উন্নতি হবে

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যেসব শিল্পনগর গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে চার্লস ডিকেন্স তাঁর 'হার্ড টাইম্‌স' গ্রন্থে 'কোক টাউন' বলে বর্ণনা করেছেন। এঙ্গেল্‌সও এইসব শিল্পনগরের নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। লুইস মামফোর্ড লিখেছেন :[৪৫]

> ১৮২০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নতুন শক্তি ও সঙ্গতি নিয়ে যেসব শহর গড়ে উঠল সেগুলো ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মতন। শক্তি ও সঙ্গতি অনুযায়ী তাদের বিকাশ হল। শিল্পপতি ব্যাঙ্কার ও নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবকরাই হলেন নতুন শহরের কর্তাকর্তাবিধাতা। তাঁদেরই তাগিদে 'কোক টাউনের' প্রসার হল। ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে এই সময় কোক-টাউনের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে নতুন নগরপত্তন হল এর রাজনৈতিক স্তম্ভ হল প্রধানত তিনটি : পুরাতন গিল্ডগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নতুন মজুরশ্রেণীর জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নষ্ট করা ; পণ্যদ্রব্য ও মেহনত বেচাকেনার বাজার তৈরি করা, কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য বাইরে উপনিবেশ দখল করা এবং সেখানে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা। নতুন নগরের অর্থনৈতিক স্তম্ভ হল কয়লাখনি লোহা আর স্টীম ইঞ্জিন।

মামফোর্ড যাকে রাজনৈতিক ভিত্তি বলেছেন সাধারণভাবে সেটাকেই অর্থনৈতিক ভিত্তি বলা যায় এবং তাঁর অর্থনৈতিক ভিত্তি হল টেকনিকাল ভিত্তি। এই হল নতুন শ্রমশিল্পযুগের অর্থনৈতিক সংগঠন এবং তারই বহিরঙ্গ হল কোক-টাউন। ইয়োরোপের মতন আমাদের দেশে এইভাবে কোক-টাউনের উদ্ভব হয়নি। বণিক ও ধনিকযুগের সন্ধিক্ষণের নগরই এদেশে গড়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা যায়, এদেশের শিল্পনগরগুলি ইয়োরোপীয় কোক-টাউনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক গেডেস যাকে 'town aggregates' বা 'conurbation' নাম দিয়েছেন, সেরকম 'শাখানগরসমষ্টি' মহানগর কেন্দ্র করে এদেশেও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে দেখা যায়।[৪৬] কাঁচালোহা ও কয়লাখনির কেন্দ্রে গুরুশিল্পের বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক এবং তার জন্য বন্দর ও যানবাহনকেন্দ্র কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে বিহারের কয়লাখনি ও খনিজ লোহার কেন্দ্রে জামসেদপুরের মতন 'coal-iron conurbations'-এর প্রচুর সম্ভাবনা দেখা-দেয়। কিন্তু জামসেদপুরেরও প্রধান বন্দর হল কলিকাতা। তাছাড়া রানীগঞ্জ আসানসোল কুলটি বার্নপুর কেন্দ্র করে বাংলাদেশেও শক্তিশালী 'কনার্বেশন্‌সের' সম্ভাবনা দেখা দেয়। কলিকাতা থেকে হাওড়া হুগলি বর্ধমান মানভূম সিংভূম পর্যন্ত অত্যন্ত শক্তিশালী জনবহুল কয়লা-লোহা-উপনগরসমষ্টি যে অদূর ভবিষ্যতেই গড়ে উঠবে তাও বোঝা যায়।[৪৭]

বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা। কলিকাতার প্রাধান্য

নতুন শ্রমশিল্পের যুগে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং বাংলার নতুন রাজধানী কলিকাতা মহানগরের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলিকাতার প্রাধান্যের জন্যই বাংলার প্রাধান্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কলিকাতার দুর্নিবার অগ্রগতি বাংলার অগ্রগতির লক্ষণ বলে গণ্য। নতুন যুগের ঐতিহাসিক নব-জাগরণের নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে কলিকাতার, তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজাগৃতির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাংলার।

উইলিয়াম হাণ্টার বলেছিলেন: 'প্রথম থেকে বাংলাই ছিল ভারতের কামধেনু। অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশ থেকেই অর্থশোষণ করত।' মোগলযুগে যা সত্য ছিল, কোম্পানির আমলে বা ব্রিটিশযুগে তা মিথ্যা হয়নি। ব্রিটিশ বণিক ও ধনিকশ্রেণীর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা অভিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ছিল বাংলাদেশ। সুতরাং অন্যদিকে তার গঠন উদ্যমের বিকাশও বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হয়েছে এবং ব্যাপকভাবেই হয়েছে। কলকারখানা কয়লাখনি রেলপথ বন্দর এবং সবার উপরে 'মহানগর' গঠনের কাজ বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে বললে ভুল হয় না। কলিকাতা তথা বাংলার অর্থনৈতিক প্রাধান্য অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে। কোম্পানির

আমলের প্রথম যুগের 'মার্কেণ্টাইল হাউস' ও 'এজেন্সি হাউসগুলি' কলিকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বেশি :[৪৮]

ব্রিটিশ মার্কেণ্টাইল হাউসের সংখ্যা
(১৮৩৭ সাল পর্যন্ত)

কলিকাতা :	৬২	সিঙ্গাপুর :	১৫	পেনাঙ :	২
বোম্বাই :	১৭	মাদ্রাজ :	১০	ক্যাণ্টন :	১১

কোম্পানির আমলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করে রামচন্দ্র রাও যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়, ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে একমাত্র কলিকাতাতেই ১১টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলির অন্য কোথাও শাখাপ্রতিষ্ঠান ছিল না, কলিকাতাতেই ব্যাঙ্কিঙের সব কাজকর্ম করা হত। এ ছাড়া ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে লণ্ডনের ৯টি ব্যাঙ্কের শাখা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৭টি ব্যাঙ্কের শাখা (১৮৩৩-১৮৪৬) কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৯] এই ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা থেকে কলিকাতার তথা বাংলার অর্থনৈতিক প্রাধান্য বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। আজ থেকে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলার বাইরের অবাঙালীদের এবং ভারতের বাইরের অভারতীয়দের সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র হয় কলিকাতা।

কলিকাতা 'fungus' নয়, 'chance-directed' 'chance-erected'-ও নয়। তা যে নয় তা হাণ্টার সাহেব ব্যাখ্যা করে বলেছেন :[৫০]

> বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র অনিবার্য ঐতিহাসিক তাগিদে গড়ে ওঠে. কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের খামখেয়ালে তা গড়ে ওঠে না। এই গড়ে তোলার দায়িত্ব রীতিমত কঠিন, এত কঠিন যে আমাদের আগে পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী সকলেই ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, একমাত্র আমরা ইংরেজরাই সর্বপ্রথম সফল হয়েছি। আমাদের আগে এই বিশাল ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে যেসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে তাদের মত আমরা আসিনি। আমরা হিন্দুদের মত মন্দির অথবা মুসলমানদের মত প্রাসাদ মস্‌জিদ আর কবরখানা নির্মাণের দিকে নজর দিইনি, মারাঠাদের মত দুর্গ কিংবা পর্তুগীজদের মত গির্জাও গড়িনি। আমরা এসেছি আধুনিক নগরনির্মাণের জন্য। একাজে আমাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের মহানগর নির্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন শ্রমশিল্প-যুগের সূচনা হয়েছে।

কলিকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জলাভূমি জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কিভাবে কলিকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরের রূপ ধারণ করেছে সে-কাহিনী বলার কোন প্রয়োজন নেই এখানে। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব বলেন, সে-কাহিনী নাকি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত প্রায় একলক্ষ খণ্ড সরকারী নথিপত্তরের মধ্যে সবিস্তারে লেখা আছে।[৭১] মানুষের জৈবিক ক্রমবিকাশের কাহিনীর মত কলিকাতার ক্রমবিকাশের কাহিনীও সুদীর্ঘ। এখানে তা আলোচনা করা অনাবশ্যক। কলিকাতার আধুনিক মহানাগরিক রূপের বিকাশের ধারাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। *

নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ চক্রদ্বীপ (চাকদহ) খড়্গদ্বীপ (খড়দহ) আড়িয়াদ্বীপ (আড়িয়াদহ) শৃগালদ্বীপ (শিয়ালদহ) ইত্যাদি নামের শেষে যে 'দ্বীপ' এবং 'দহ' আছে তা থেকেই বোঝা যায়, চব্বিশপরগণা খুলনা যশোহর সেকালে (সপ্তম খ্রীস্টাব্দেও) নিচু জলাভূমি ছিল। গঙ্গা পলিমাটি ঢেলে ঢেলে জলাডোবা ভরাট করেছে, নিম্নভূমি উঁচু করেছে, তার ফলে লোকজনের বসবাস বেড়েছে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ গড়ে উঠেছে, কলিকাতা গোবিন্দপুর সুতানুটি ইত্যাদি। এইসব গ্রামে জেলে কুমোর কলু ছুতোর কাঁসারি শাঁখারি প্রভৃতি কারিগর ও কারুশিল্পীদের বাস ছিল। আজও তার পুরনো স্মৃতি জেলিয়াপাড়া ছুতোরপাড়া কুমোরটুলি কলুটোলা কাঁসারিপাড়া শাঁখারিপাড়া ইত্যাদি নামগুলি বহন করছে। ইংরেজরা আসার আগে, পলাশীর যুদ্ধের পরে, কলিকাতার অনেক প্রাচীন বনেদী বংশের আদিপুরুষেরা এইসব অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন। তার মধ্যে বড়বাজার ও চোরবাগানের বনেদী মল্লিকবংশের প্রতিষ্ঠাতা, রাজা সুখময় রায়, রামদুলাল দে, মতিলাল শীলের

* চার্লস বুথ, রাউনট্রি প্রমুখ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের মত এদেশেও কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরের Social Survey করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তা না হলে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি যথার্থরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। কলিকাতার অস্বাভাবিক জনসংহতি এবং অবৈজ্ঞানিক নগরপরিকল্পনার জন্য যে বাসস্থান-সংকট ও স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিয়েছে, নানাশ্রেণীর (বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণীর) যে অর্থনৈতিক সংকট গভীর হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। (১৯৪৮)

কলকাতা শহরের সার্ভে সম্প্রতি কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু এই সমস্যাসংকুল মহানগরের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বহুমুখী সার্ভে, প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, আজও করা হয়নি। অথচ কলকাতার সংকট আজ সর্বভারতীয় সমস্যারূপে প্রকট হয়ে উঠেছে। (১৯৭৮)

পূর্বপুরুষেরা, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের দেব-পরিবার, বাগবাজারের কালিপ্রসন্ন সিংহ ও গোকুল মিত্রের আদিপুরুষরা অন্যতম।

আমিরাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি পরগণার প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার তখন লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের (মজুমদার, রায় চৌধুরী) বংশধর মনোহর রায়, মনোহর সিংহ। ১৬৯৮ সালে নবাবের কাছ থেকে ফর্‌মান পাবার পর ইংরেজরা এই জমিদারদের কাছ থেকেই এই গ্রামগুলি বাৎসরিক খাজনায় লীজ নেয়।[৫১] তারপর জলাজঙ্গল বাগান কেটে ইংরেজদের দুর্গ বসতি অফিস আদালত স্কুল কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। লটারী কমিটির টাকায় রাস্তাঘাট ট্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে দেশের বনেদী জমিদার, ইংরেজদের এদেশী বেনিয়ান মুৎসদ্দী ও রাজকর্মচারীরা, ধনী ব্যবসায়ী ও বণিকরা সুতানুটি কলিকাতা গোবিন্দপুরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র মহারাজা গুরুদাস (সুতানুটি), মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর (শোভাবাজার), অমিচাঁদ (অমিচাঁদের বিখ্যাত বাগান এখনও হাল্‌সিবাগান নামে খ্যাত), মহীশূর ও অযোধ্যার নবাব পরিবার (টালিগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজ), আন্দুল রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গবর্নর ভ্যান্সিটার্টের বেনিয়ান দেওয়ান রামচরণ, হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবু (জোড়াসাঁকো), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ রাজা পীতাম্বর মিত্র, মুন্‌শী সদরুদ্দীন (মেছুয়াবাজার), বাবু বৈষ্ণবচরণ শেঠ, গৌরী সেন ('লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন') ইত্যাদি ধনিক ব্যবসায়ীরা (বড়বাজার) কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এঁদের অর্থে ও সামর্থ্যে এবং ইংরেজদের প্রয়োজনে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি হয়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নবযুগ-প্রবর্তকদের সকলেরই প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতা শহর অথবা শহরতলী। ক্লাইভ স্ট্রীট, হেস্টিংস স্ট্রীট, ডালহৌসি স্কোয়ার, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, ভ্যান্‌সিটার্ট রো, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীট ইত্যাদির পাশাপাশি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যুগনেতাদের নামের রাস্তাগুলিও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের পরিচয় দিচ্ছে। কলিকাতা অবশ্য তখনও এযুগের মহানগরের কর্মচঞ্চল ব্যস্তবাগীশ মূর্তি ধারণ করেনি।

শহরে ছ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির

চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস-ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আঁকা, চামড়ার আধঘোমটা-ওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর-বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা।[৫৩]

এ হল রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলার' কলিকাতার বর্ণনা, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলিকাতার রূপ। নতুন যুগের প্রতিমূর্তি কলিকাতা তখনও পুরোপুরি নয়। কলিকাতা তখন যুগসন্ধিক্ষণের কলিকাতা।*

নবদ্বীপ-মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা

রাজমহল গৌড় নবদ্বীপ ঢাকা মুর্শিদাবাদ কলিকাতা—বাংলার রাজধানী। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা যুগসন্ধিক্ষণের কলিকাতা, সেকালের 'মাথার খুলিটা' তখনও সে বহন করছে, কিন্তু মুকুট পরে আসছে একাল, নতুন বিজ্ঞান আর যন্ত্রের যুগ, তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। নবদ্বীপ মুর্শিদাবাদ থেকে রেলপথে কলিকাতা খুব বেশি দূর নয়, কিন্তু যুগের দূরত্ব অনেক। নবদ্বীপ যদি বাংলার 'অক্সফোর্ড' হয় তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা নিঃসন্দেহে বাংলার 'ফ্লোরেন্স', বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ-কেন্দ্র। টোল-চতুষ্পাঠীর যুগ, নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ, রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত রঘুনন্দনের যুগ অস্তমিত। নতুন বিজ্ঞানের যুগ, বৈজ্ঞানিক জীবনাদর্শ ও সংস্কারমুক্তির যুগ, অবাধ অর্থনৈতিক ও মানসিক মুক্তির যুগ উদীয়মান। 'ছেলেবেলায়' রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা মিথ্যা নয়:[৫৪]

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে একথা স্পষ্ট

* এবিষয়ে আমি আমার 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে (১৯৬৯) সবিস্তারে আলোচনা করেছি। (১৯৭৮)

বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের।···অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্ণিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে, সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি।

সেকালের নবদ্বীপের মহিমা বর্ণনা করেছেন বাংলার বৈষ্ণব কবিরা :

নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাই,
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
... ...
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়,
নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যারস পায়।

—চৈতন্য ভাগবত (আদি)

এযুগের কবিরা অসংখ্য কবিতা লিখবেন কলিকাতা মহানগর সম্বন্ধে। তাঁরাও বলবেন 'কলিকাতা হেন' মহানগর ভারতবর্ষে নেই, যেখানে রামমোহন দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সকলেই অবতীর্ণ হয়েছেন। যেখানে গঙ্গাঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক আজও হয়ত স্নান করে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নানাজাতের লোক সদাগরী অফিসে যায় কেরানীগিরি করতে, হাজার হাজার লোক টাকার জন্য, মুনাফার জন্য ব্যবসাবাণিজ্য করে, লক্ষ লক্ষ মজুর কারখানায় ছোটে বাঁচার তাগিদে। যেখানে 'প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস,' 'দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান' অথবা 'মাঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর'—এসবের আধিক্য নেই, আছে ইটপাথরের প্রাসাদ অট্টালিকা, কলকারখানার ভোঁ, চিম্‌নির ধোঁয়া, যান্ত্রিক ট্র্যাফিকের শব্দ জনতার উন্মত্ত কল্লোল। যেখানে পণ্ডিত অধ্যাপকের অভাব নেই, কিন্তু 'তাল পড়ে টিপ করল, না টিপ করে তাল পড়ল', 'পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র'—এই তর্কের মীমাংসা করাই চূড়ান্ত বিদ্যাচর্চা নয়। মুকুন্দ পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপের 'বিস্তর পড়ুয়ার' মতন এখানকার স্কুল কলেজেও পড়ুয়ার অভাব নেই। কিন্তু এযুগের

'পড়ুয়াদের' পাঠ্যবিষয় অনেক বদ্‌লে গেছে এবং কলিকাতায় তাদের লেখা-পড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্যও দৌড় দিয়েছে। কলিকাতায় নবযুগের বিজ্ঞান এসেছে, যুক্তিবাদ এসেছে। সেকালের নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি আর একালের কলিকাতার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। বেশ বোঝা যায়, যুগান্তরের ঢেউ এসেছে কলিকাতায়, সেই ঢেউয়ের বিস্তার যাই হোক না কেন। ছাদের কার্নিসে ব্রহ্মদৈত্য যে আর আরামে পা ঝুলিয়ে রাখতে পারছে না, ভূতপ্রেতের আনাগোনাও যে আর নেই, অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে যে তারা দৌড় দিয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়, নতুন যুগের নতুন মহানগরে যুগমানসের অভিব্যক্তির সূত্রপাত হয়েছে। বিজ্ঞান ব্যক্তিস্বাধীনতা সংস্কারমুক্তি গণতন্ত্র ও শিক্ষার নতুন ভাবাদর্শের আমদানি হচ্ছে পণ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের সঙ্গে কলিকাতার বন্দরে। অর্থনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে আদর্শ-সংঘাতও দেখা দিচ্ছে মহানগরে। অনিবার্য ঐতিহাসিক নিয়মে নবযুগের বাংলার নবজাগৃতিকেন্দ্র হচ্ছে কলিকাতা।

মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারে' বলেছেন : 'বুর্জোয়াশ্রেণী সমস্ত দেশকে নতুন শহরের অধীন করেছে। তারা বড় বড় মহানগর গড়েছে, গ্রামের তুলনায় নগরের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে। এইভাবে গ্রাম্য-জীবনের জড়তা ও নির্বুদ্ধিতা থেকে তারা লোকসংখ্যার বিরাট একটা অংশকে মুক্তি দিয়েছে।' কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ মহানগর এবং অন্যান্য শহর ব্রিটিশ ও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর তাগিদে তৈরি। গ্রাম্যজীবনের জড়তা ও স্থিতিশীলতা থেকে এদেশের মানুষকে আংশিক মুক্তিও দিয়েছে এই মহানগরগুলি। তাই বাংলার তথা সারা-ভারতের নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা মহানগর। নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা অনেক দূর। কালিক দূরত্বের কথা বলছি।

বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

ইতিহাসের আগেকার যুগগুলিতে প্রায় সবত্রই সমাজের মধ্যে একটা অত্যন্ত জটিল স্তরবিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার স্তরভেদ দেখা যায়। যেমন প্রাচীন রোমের প্যাট্রিসিয়ান নাইট প্লিবিয়ান ক্রীতদাস; মধ্যযুগের সামন্তপ্রভু, গিল্ডভুক্ত কারিগর, শিক্ষানবীশ, অর্ধদাস; এইসব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপশ্রেণী।

ফিউডালসমাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়াসমাজের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যেও সেই একই শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিরোধ রয়েছে। কেবল আগেকার শ্রেণীবিন্যাসের বদলে নতুন শ্রেণীভেদ গড়ে উঠেছে, নতুন পীড়ন ও শোষণের বাস্তব অবস্থা এবং নতুন ধরনের শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে।

—মার্ক্স-এঙ্গেল্স, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার', ১৮৪৮

যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে শ্রমশিল্পক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটল তার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে মধ্যযুগের সামন্তসমাজের গড়ন ভেঙে গেল। মধ্যযুগীয় শ্রেণীবিন্যাসেরও রূপান্তর ঘটল। অকস্মাৎ ঘটল না, ধীরেসুস্থে ঘটল। পুরাতন সমাজের গঠন ও শৃঙ্খলা ভেঙে গেল এবং বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ-শৃঙ্খলা ও শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল। এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের সময় সমাজে বুর্জোয়া-শ্রেণী (ধনিকশ্রেণী বা পুঁজিপতিশ্রেণী) মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। তার সঙ্গে 'প্রলেটারিয়েটশ্রেণী' বা শ্রমজীবীশ্রেণীর আবির্ভাবও ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। পূর্বে যে সমাজে ধনিকশ্রেণী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ছিল না তা নয়। কিন্তু সেকালের শ্রেণীগুলির সঙ্গে একালের সমশ্রেণীভুক্তদের যে মৌল পার্থক্য ঘটল সেইটাই যুগান্তকারী।

এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যই সমাজের রূপ বদলে গেল। মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণীবিচারের সর্বপ্রধান মানদণ্ড ছিল বংশগৌরব বা রক্তের সম্পর্ক। বংশানুক্রমে শ্রেণীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত। সদাগরশ্রেণী কারিগরশ্রেণী অথবা অবস্থাপন্ন কৃষকশ্রেণী ধনসম্পত্তির দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করলেও তাদের সেই শ্রেণীমর্যাদা দেওয়া হত না। বংশ ও রক্তসম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের আভ্যন্তরিক শ্রেণীকাঠামো সেকালের অর্থনৈতিক কাঠামোর মতনই অচল অটল স্থিতিশীল ছিল। একশ্রেণী থেকে আর একশ্রেণীতে উন্নতির সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না বলা চলে। কিন্তু নতুন শ্রমশিল্পের যুগে, ধনতন্ত্রের যুগে, সচল সক্রিয় যন্ত্রযুগে মধ্যযুগের সামাজিক অচলায়তন ভেঙে গেল। সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে 'সামাজিক গতিশীলতা' (social mobility) বলেছেন সেই গতিশীলতা সঞ্চারিত হল সমাজে।[১] মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতি মধ্যযুগের বংশপ্রধান দুর্ভেদ্য শ্রেণীপ্রাচীর ভেঙে দিল। স্বাধীন অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে তাদের নিম্ন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নতির পথে আর কোন বাধা থাকবে না। প্রভাবপ্রতিপত্তি ও শ্রেণীমর্যাদার অবাধ অধিকারও সকলের স্বীকৃত হল! বংশগৌরব কৌলিন্য ও রক্তসম্পর্কের আভিজাত্যকে জয় করল সচল সক্রিয় সর্বশক্তিমান মুদ্রা (Money), সেক্‌সপীয়র যাকে তাঁর *Timon of Athens*-এ 'thou common whore of mankind' বলেছেন। শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার যখন স্বীকার করা হল তখন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার অবাধ স্বাধীনতাও সকলে পেল। এইভাবে নতুন যন্ত্রযুগ ও শিল্পবিপ্লবের যুগে, মুদ্রা ও পণ্যের প্রাধান্যের যুগে, শিক্ষার প্রসারের যুগে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগে, সমাজে যে নতুন শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল, সচলতাই হল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীর অবশ্যই রইল, একশ্রেণী থেকে আর একশ্রেণীতে উন্নতির পথেও যথেষ্ট অন্তরায় থাকল। কিন্তু রক্তসম্পর্ক ও বংশগৌরবের মতন সে-প্রাচীর গোড়া থেকেই (পরে হলেও) দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠেনি। পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশের ফলে পরবর্তীকালে পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে যেমন একচেটে পুঁজিপতি (Monopoly Capitalist) ও সাধারণ পুঁজিপতিদের পার্থক্য দেখা দেয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও তেমনি নানারকম স্তরভেদ প্রকট হয়ে ওঠে এবং তলার প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য ও দুঃখদুর্দশাও বাড়তে থাকে। সমাজজীবনের গতিশীলতা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রেণীকাঠামো ক্রমেই স্থিতিশীল ও দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে।

এই স্থিতিশীলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণীর উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারিতা, সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) দিকবিদিকে অভিযান, মধ্য-শ্রেণীর আর্থিক সংকট, বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংস্কৃতিসংকট, প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর সংঘবদ্ধ চেতনা এবং শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংঘর্ষ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স এই কথাই বলেছেন।[২] জার্মান সমাজ-বিজ্ঞানী ফ্রিড্রীশ জাহ্ন (Freidrich Zahn) ১৯২৫ সালে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস থেকে শ্রেণীবিন্যাসের ধারা সম্পর্কে গবেষণা করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ :[৩]

বর্তমান শ্রেণী	পিতার শ্রেণী		
	উচ্চশ্রেণীভুক্ত		মধ্য ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীভুক্ত
	বুদ্ধিজীবী	বিত্তবান	
	%	%	%
বড় পুঁজিপতি	১৩·৯	৭০·৯	১৫·২
ধনিক ব্যবসায়ী			
প্রকাশক ও ব্যাঙ্কার	১৭·৮	৬৭·২	১৫·০
জমিদার, ছোটজমিদার	১৪·৮	৮৫·২	×
উচ্চশিক্ষিত চাকুরিজীবী	৩৮·৮	৩৬·৯	২৪·৩
	৪০·৫	৩৭·২	২২·৩
ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান,			
বিল্ডার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি	৩১·৭	৩৪·১	৩৪·২
অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক			
বিভাগের প্রতিনিধি	৪২·৬	৩৫·০	২২·৪
সর্বসাকুল্যে	২৮·৯	৫১·৪	১৯·৭

এখানে দেখা যায়, বড় বড় পুঁজিপতিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন, ধনিক ব্যবসায়ী প্রকাশক ও ব্যাঙ্কারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৭·২ জন এবং জমিদারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ জন স্বশ্রেণীভুক্ত পিতার পুত্র। যাদের পিতা মধ্য ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন, আর যাদের পিতা উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছিল তাদের মধ্যে ১৩·৯, ১৭·৮ এবং ১৪·৮ জন যথাক্রমে বড় পুঁজিপতি, ধনিক ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও জমিদারশ্রেণীভুক্ত হয়েছে। শ্রেণী-উন্নতিও সামান্য হয়েছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি বিবাহবন্ধনের জন্য হয়েছে তা—বলা কঠিন। কার্ল ম্যান্‌হাইম অবশ্য এই সামাজিক শ্রেণীনির্বাচনের মধ্যে "restraining conservative" এবং "dyna-

mic progressive", এই উভয়নীতিরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে, "Selection by achievement is the dynamic element here", কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কৃতকার্যতার জন্য নতুন যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য যে ক্রিয়াশীলতা তা ক্রমেই মন্থর হয়ে স্থিতিশীল হয়ে আসছে।[৪] সামাজিক গতিবিজ্ঞানের (Social Dynamics) নিয়ম অনুযায়ী নতুন যুগে যে নতুন শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব হয় তার স্থিতি-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধানপ্রাচীর আবার দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। সচল সক্রিয় যন্ত্রযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মূলধন ও মুনাফা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে। শিক্ষার অধিকার ও সুযোগবৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আয়তন বাড়ে, বেকারসমস্যা বাড়ে এবং "Proletarianization of the Intelligentsia" দ্রুতগতিতে কার্যকর হয়। সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংকটও এইভাবে দেখা দেয়। উচ্চশ্রেণী যদি ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে তাহলে মধ্যশ্রেণী ও প্রলেটারিয়েটশ্রেণী সম্প্রসারিত হতে বাধ্য, কিন্তু তার জন্য শ্রেণীরূপান্তর ঘটে না, শ্রেণীবিরোধের (class-conflict) তীব্রতার ভিতর দিয়ে সেই রূপান্তরের পথ পরিষ্কার হয় মাত্র। বর্তমান যুগে মজুরশ্রেণীর দিকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা বড় অংশের নিশ্চিত ক্রমাবনতি এবং বিশাল প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর সংঘবদ্ধ শ্রেণীচেতনা ও শক্তির বিকাশ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাংলার নতুন শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ মার্ক্সের ভাষায় 'প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়কালে' বাংলাদেশেও বুর্জোয়াশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এবং প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর বিকাশ হয়। অর্থনীতিবিদ্ মরিস ডব বলেছেন :[৫]

> সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা হল, উপনিবেশের সামাজিক শ্রেণী-কাঠামো ঠিক সেইভাবে গড়ে তোলা যেভাবে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে অন্যান্য দেশগুলিতে এই শ্রেণীকাঠামো গড়ে উঠেছিল। শ্রমশিল্পে মূলধন নিয়োগ করার পূর্বে প্রথমে প্রয়োজন গ্রাম্য প্রলেটারিয়েট। শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মুৎসদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্‌যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হ'তে থাকে।

ঐতিহাসিক নিয়মে এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়েছে। বণিক মুৎসুদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী থেকে যৎকিঞ্চিত শিল্পোদ্‌যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত বাঙালী বুর্জোয়াশ্রেণীরও (ঔপনিবেশিক) বিকাশ হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসারের ফলে নতুন বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (elite) আবির্ভাব হয়েছে। গ্রাম থেকে উৎখাত বাংলার কৃষক ও কারিগরেরা হয়েছে (সামান্য সংখ্যায় হলেও) শহরের কলকারখানার নতুন প্রলেটারিয়েটশ্রেণী। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর একাধিপত্যের জন্য এবং ঔপনিবেশিক শোষণনীতির ফলে বাঙালী বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি। বাঙালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি অনুপাতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও (প্রধানত চাকুরি) বাড়েনি। আর শ্রমশিল্প ও কলকারখানার প্রসার স্বাভাবিকভাবে না হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে উৎখাত কৃষক ও কারিগরেরা দলে দলে শহরেও আসেনি, প্রলেটারিয়েটশ্রেণীভুক্তও হয়নি। গ্রামের বোঝা বেড়েছে, কৃষির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে এবং নতুন এক নিঃস্ব ক্ষেতমজুর-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর ব্রিটিশ আমলে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্বভোগী যে নতুন জমিদারশ্রেণী গজিয়ে উঠল, সরকারের নির্দিষ্ট রাজস্ব দেওয়া ভিন্ন যাদের আর কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য রইল না, তাদের ধনসঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত হল বটে, কিন্তু মাটির সঙ্গে তাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। সুতরাং অপূর্ব আলস্যে বসে বসে ডিম পাড়াই হল তাদের কাজ এবং অত্যাচারী ও উদাসীন মধ্যস্বত্বভোগীতে গ্রাম ছেয়ে গেল। শহরের আড়ষ্ট বুর্জোয়াশ্রেণী, সমস্যাকাতর মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এবং প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর পাশাপাশি গ্রামের নতুন অলস অত্যাচারী জমিদারশ্রেণী, পত্তনিদার গাঁতিদার বর্গাদার ইত্যাদি নিয়ে গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী এবং গ্রাম্য প্রলেটারিয়েট বা ক্ষেতমজুরশ্রেণী বাংলার সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াল। শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূর হল না, বেড়ে গেল। অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংকট ঘনিয়ে এল। এই হ'ল আধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক অবস্থা।* কিন্তু অন্যান্য দেশের মতন আমাদের বাংলাদেশের তথা সারা ভারতবর্ষের উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে যে কিঞ্চিৎ গতিশীলতা ও প্রাণশক্তি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে, নতুন

* গ্রন্থকারের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৯৬৯) দ্রষ্টব্য। (১৯৭৮)

মনীষা, গঠনকুশলী সমাজসংস্কার ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যশিল্প প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।

বাংলার নতুন জমিদারশ্রেণী

আগে বলেছি পাঠান ও মোগল আমলে বাংলাদেশে চৌধুরী ক্রোরী কানুনগো আমিল শীকদার পাটোয়ারি প্রভৃতি রাজস্বআদায়কারীরা ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। বর্ধমান দিনাজপুর নদীয়া প্রভৃতি প্রাচীন জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা এইভাবে হয়। মুর্শিদ কুলিখাঁ ১৭২২ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বন্দোবস্তের নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'। নবাব সুজা খাঁর আমলে মুর্শিদের নির্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র বাদ যায় এবং সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও বেশি নতুন আব্ওয়াব ধার্য করে উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন। এই জমিদারী বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমন কি দশসালা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি-স্বরূপ। কয়েকটি জমিদারী বন্দোবস্তের কথা তাই এখানে বলা প্রয়োজন।

মুর্শিদকুলি খাঁর বন্দোবস্তে ১৭২২ সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে ৫৭টি পরগণায় ২০,৪৭,৫০৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয়। মীরকাসেমের আমলে 'কর আব্ওয়াব' ইত্যাদি নিয়ে এই রাজস্ব হয় ৩২,২৬,৯৩৪ টাকা। মুর্শিদের বন্দোবস্তে দিনাজপুরের জমিদারী ৮৯ পরগণায় ৪,৬২,৯৬৪ টাকা রাজস্ব স্থির হয় এবং মীরকাসেমের আমলে রাজস্ব প্রায় চারগুণ বেড়ে ১৮,২০,৭৮০ টাকা হয়। নদীয়ার জমিদারী ৭৩ পরগণায় ৫,৯৪,৮৪৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয় এবং মীরকাসেমের আমলে দ্বিগুণ বেড়ে হয় ১০,৯৮,৩৭৯ টাকা। রাজশাহীর জমিদার রাজা রামজীবনের সঙ্গে মুর্শিদের বন্দোবস্তে ১৩৯ পরগণায় জায়গীর বাদে ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা জমার ব্যবস্থা হয়। এই সময় মুর্শিদাবাদ, ভূষণা ও ঘোড়াঘাট এই তিন চাকলা নিয়ে রাজশাহী জমিদারী বিস্তৃত ছিল। রাণী ভবানীর সময়ে আরও কতকগুলি ছোটবড় পরগণা এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন রাজমহল থেকে বগুড়া পর্যন্ত এই জমিদারীর বিস্তৃতি ছিল। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে এই রাজস্ব দ্বিগুণ বেড়ে ৩৫,৫৩,৪৮৫ টাকা হয়। পাঠান রাজত্বকালে বীরভূম ছিল হিন্দু রাজবংশের অধীনে। পাঠান-মোগল বিপ্লবের সময় এই হিন্দু রাজাদের কর্মচারী আসদ্উল্লা ও জোনাদ্ খাঁ নামে দুই ভাই বীরভূম হস্তগত করেন। জোনাদের পুত্র রণমস্ত খাঁর পৌত্র সাধুশীল আসদ্উল্লার সঙ্গে মুর্শিদের বন্দোবস্ত হয়। ২২টি পরগণায় বীরভূম জমিদারীর

সদর জমা ৩,৬৬,৫০৯ টাকা ধার্য হয়। মীরকাসেমের সময়ে রাজস্ব বেড়ে হয় ১৩,৪২,১৪৩ টাকা। ভবেশ্বর রায় ও তাঁর পুত্র মহাতপ রায় রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করে বর্তমান যশোহরের সৈদপুর প্রভৃতির জমিদারী পান। মহাতপের পৌত্র মনোহর রায় ১৬৯৬ সালে ইউসুফপুর প্রভৃতির জমিদারী পেয়ে 'রাজা' উপাধি পান। তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায়ের সঙ্গে মুর্শিদের বন্দোবস্তে ২৩ পরগণায় ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমা ধার্য হয়। এঁদের বংশাবলী যশোহর চাঁচড়ার রাজবংশ বলে পরিচিত। মীরকাসেমের বন্দোবস্তে এই রাজস্ব বেড়ে ৪,১৬,৩১৮ টাকা হয়। চাক্‌লে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার সমস্ত খাল্‌সা ভূমি এবং ভূষণা ও ঘোড়াঘাটের সামান্য অংশ নিয়ে এই জমিদারী বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদের বন্দোবস্তে জায়গীর বাদ দিয়ে এই বিভাগের ১৫৫ পরগণায় ৮,৯৯,৭৯০ টাকা জমা ধার্য হয়। চাক্‌লে ঘোড়াঘাটের উত্তরভাগ অর্থাৎ কুচবিহারের দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, সরকার বাজুহার মধ্যস্থিত কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণা নিয়ে 'ফকিরকুণ্ডীর' উৎপত্তি। এই ফকিরকুণ্ডীই পরে রংপুর জেলায় পরিণত হয়। এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট তালুকও ছিল। ৯০,৫৪৮ টাকা জায়গীর বাদে ২৪৪ পরগণায় এই জমিদারীর রাজস্ব ২,৩৯,১২৩ টাকা নির্দিষ্ট হয় এবং মীরকাসেমের আমলে বেড়ে হয় ৬,৩৭,৬৩২ টাকা।[৬]

বাংলাদেশের প্রাচীন জমিদারবংশগুলির এই হল মোটামুটি পরিচয়। ইংরেজের আমলে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই জমিদারশ্রেণীর মৌল রূপান্তর ঘটল এবং নতুন একশ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি হল। স্থির হল ১১ ভাগের ১০ ভাগ রাজস্ব পাবেন সরকার আর বাকি ১ ভাগ পাবেন জমিদারেরা। সমস্ত অনাবাদী জমিও জমিদারদের দান করে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট রাজস্ব যথাসময়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের সঙ্গে জমিদারদের আর কোনো সম্পর্ক রইল না। প্রজার মঙ্গল ও আবাদের উন্নতির দায়িত্ব জমিদারের, একথা কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের মধ্যে থাকলেও তা শুধু কাগজপত্তরেই থাকল। আসলে জমিদারেরা ইংরেজের আমলে গোত্রান্তরিত হলেন। তাঁরা আগে ছিলেন রাজস্বআদায়কারী, জমিজমার উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা তাঁদের ছিল না, যদিও বংশানুক্রমে তাঁদের অধিকার এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকত। এখন তাঁরা হলেন জমির মালিক, সরকারের দেয় রাজস্ব দেওয়া ভিন্ন তাঁদের আর কোন দায়িত্ব রইল না। জমিদারী তাঁদের মূলধনে পরিণত হল। আগে দেশীয় প্রথানুসারে খোদ্‌কস্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষের ও বাসের ভূমির উপর যে অধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থার ফলে রইল না। জমিদাররা প্রজাদের উচ্ছেদ করা ও খাজনাবৃদ্ধি করার পূর্ণ অধিকার

পেলেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানাপ্রথা প্রবর্তনের ফলে জমিদাররা বহু ক্ষুদে মালিক সৃষ্টি করলেন। পত্তনিদার দরপত্তনিদার গাঁতিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, এক-একটি জেলায় ৫০ জন পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হল।[৭] জমিদাররা ধীরে ধীরে দায়িত্বজ্ঞানহীন অলস বিলাসী অত্যাচারী ব্যভিচারী রাজস্বভোগী ধনসঞ্চয়ী মালিকশ্রেণীতে পরিণত হলেন। ইংরেজের শাসন ও শোষণপ্রথার প্রধান স্তম্ভ হলেন এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর জমিদারশ্রেণী।

অবশ্য ইংরেজের আমলে বাংলার প্রাচীন জমিদারবংশ অনেক ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৮৫ সালে কোম্পানির কাছে নদীয়ারাজের খাজনা বাকি পড়ে। কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন ট্রাস্টির হাতে জমিদারী তদারকের ভার দিয়ে রাজাকে ১০০,০০০ টাকা ভাতা দেবার বন্দোবস্ত করেন। ১৮০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালে বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজ-বাড়িতে বন্দী করা হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন যে, জমিদারেরা বর্ধিত খাজনা দিতে অক্ষম হন এবং ক্রমশ ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান।[৮] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও ১৮৭৭ সালে এক স্মারকলিপিতে এই একই অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন :[৯]

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্রাচীন বনেদী জমিদারবংশগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এই বন্দোবস্তের ফলে অত্যধিক বর্ধিত নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের যে কঠোর ব্যবস্থা করা হয় তারই চাপে পড়ে এই জমিদার-বংশগুলি লোপ পায়।
>
> চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলার তিনভাগের একভাগই প্রায় জঙ্গল ছিল। প্রজাদের ঋণ দিয়ে অল্প খাজনায় জমি বিলি করে, বাঁধ খাল পথ ঘাট তৈরি করে বাংলার জমিদাররাই এই সব বনজঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করেছেন, আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। জমিদাররা যে-পরিমাণে মূলধন নিযুক্ত করেছিলেন সেই অনুপাতে মুনাফা পাননি।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের যুক্তি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অভি-যোগের সমর্থন ১৮১২ সালের সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টের মধ্যেও পাওয়া যায়।[১০] কিন্তু এ-যুক্তি হল রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে কঠোর প্রজাবিরোধী আইনগুলি (Regulation VII of 1799 ইত্যাদি) প্রণয়ন করার স্বপক্ষে যুক্তি, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করার কারণও হল তাই। কিন্তু জমিদারবংশের ধ্বংসের এইসব যুক্তি সহজেই খণ্ডন

করা যায়। উক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেই যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে এযুক্তি একেবারেই টেঁকে না :

> বাংলাদেশের বাকি রাজস্বের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দু'জনের কাছে বাকি : বীরভূম ও রাজশাহীর জমিদার। সরকারী রাজস্ব থেকে নিজেদের ব্যভিচার ও বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করার দরুনই তাঁদের দেয় রাজস্ব তাঁরা দিতে পারেননি এবং তাঁদেরই বংশধরদের নির্দেশে জমিদারী থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে।
>
> —গবর্নর জেনারেল ইন্ কাউন্সিল : ২৭ মার্চ ১৭৯৫

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বর্ধিত রাজস্বের চাপে বনেদী অথবা নতুন জমিদারেরা সকলে পথের ভিখারী না হয়ে অনেকে যে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় :

> লর্ড কর্নওয়ালিস যখন বন্দোবস্ত করেন তখন তাঁর হিসাবে দেখা যায়, কোম্পানির জমিদারীর তিনভাগের একভাগই জঙ্গল ছিল। এই হিসাব যে নির্ভুল সে সম্বন্ধে কোল্‌ব্রুক বলেছেন : 'বাংলাদেশের জমিজমা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন গবেষণা করে আমিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। বাংলার তিন ভাগের একভাগ জমি এই সময় আবাদযোগ্য পতিত জমি ছিল। একেবারেই আবাদযোগ্য নয় এরকম জমির হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। এই আবাদযোগ্য পতিত জমির সম্পূর্ণটাই জমিদারদের দান করে দেওয়া হয়েছিল।'[১১]
>
> আঠার বছর হয়ে গেল, জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে দেখা গেছে, আগে যেসব জমা থেকে জমিদারদের ১০% থেকে ১২% আয় হত, এখন সেই জমা থেকে ৩০%, ৪০%, ৫০% পর্যন্ত আয় হয়।[১২]
>
> গড়পড়তা হিসাবে দেখা যায়, যেসব জমা থেকে সরকারী রাজস্ব বাবদ জমিদাররা ১০০ টাকা দেন, সেই সব জমা থেকে তাঁরা নিজেরা প্রায় ২০০ টাকা আয় করেন।
>
> —আর. ডি. ম্যাঙ্গলস : ৩১ মার্চ, ১৮৬৮
>
> অধিকাংশ জমিদারই তাঁদের জমিদারী থেকে সরকারী রাজস্বের চাইতে প্রায় ৭৫% বেশি আয় করেন।[১৩]
>
> —ইণ্ডিগো প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন : ১০ জুন, ১৮৫৬

পতিত জমির আবাদ, মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি খাজনাবৃদ্ধি এবং আব্‌ওয়াবাদি থেকে জমিদারদের প্রভূত ধনসঞ্চয়ের পথ যে প্রশস্ত হয়েছে

তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাজনা নজর আব্‌ওয়াব ইত্যাদি আদায়ের জন্য, জমি দখল ও শস্যাদি লুট করার জন্য জমিদাররা যেভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তার দু'একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

জমিদারদের (বর্ধমান নদীয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের) দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য থানাদার পাইক ইত্যাদি বহাল করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তার ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার পৃথক ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট জমার হিসাবের মধ্যেই এই খরচ ধরা হয়েছিল। যেসব জমিদারের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁরা তা সাধুভাবে পালন করা প্রয়োজনবোধ করলেন না। পেশাদার ডাকাতদের সাধারণত তাঁরা থানাদার নিযুক্ত করতেন। এই থানাদাররা লুঠতরাজ করার কাজেই তাঁদের সাহায্য করত। গ্রামের প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।...বড় বড় ডাকাতের দলগুলির সঙ্গে জমিদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র দেখা যায়।[১৪]

—মিনিট অব দি গবর্নর জেনারেল, ৭ ডিসেম্বর, ১৭৯২

ডাকাতির কমিশনার আমাকে জানালেন যে জমিদারের লাঠিয়ালরা অধিকাংশই বাঙালী নয়, উত্তরপশ্চিম ও বিহারের বাছা বাছা ভাড়াটে গুণ্ডা। জমিদারেরা এই সব বিহারী ও পাঠান লাঠিয়াল বেতন দিয়ে রাখতেন প্রজাদের উপর অত্যাচার করার জন্য।[১৫]

—ওয়েল্‌বি জ্যাকসনের রিপোর্ট

বকেয়া খাজনার দায়ে প্রজাদের উচ্ছেদ করা জমিদারদের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখেছি, দশজনের মধ্যে প্রায় ন'জন প্রজার ক্ষেত্রে এই বাকি খাজনার অভিযোগ একেবারে মিথ্যা। এই অত্যাচার ও উচ্ছেদের ব্যাপার জমিদারদের জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়।

—রংপুরের অস্থায়ী জজ্‌ এফ. এ. গ্লোভার, ১৮৫৮

জমিদাররা যেভাবে তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তাতে আইন-কানুনের সাহায্যে তাঁদের সংযত করা এখনই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।[১৬]

—ময়মনসিংহের জজ টেলার, ১৮৫৮

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জমিদারদের সপক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন তা যে সত্য নয় তা পূর্বোধৃত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। প্রজাদের বাকি খাজনার দায়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে, থানাদার

পাইক লাঠিয়াল পাঠিয়ে লুঠতরাজ করতে যাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না, বাংলাদেশের অধিকাংশ ডাকাতের দলের যাঁরা স্রষ্টা, সর্দার ও পৃষ্ঠপোষক, পুলিস যাঁদের টাকার গোলাম, তাঁরা যে কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের ফলে বর্ধিত রাজস্বের চাপে পড়ে নির্বংশ হয়েছেন তা কোনো তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকই স্বীকার করবেন না। তাই যদি হয় তাহলে এদেশের বেনিয়ান গোমস্তা মুৎসদ্দী প্রভৃতি যাঁরা দালালির গচ্ছিত ধনে এই সব জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন, তাঁরা তা কিনলেনই বা কেন এবং কিনে তা থেকে প্রচুর ধনসঞ্চয় করলেন কি করে? কিশোরীচাঁদ মিত্রের যুক্তিও তাই ধোপে টেঁকে না। বাংলার বনেদী জমিদারবংশের ধ্বংসের জন্য যাঁরা বিলাপ করেন এবং 'স্বদেশপ্রীতির' আতিশয্যে তার জন্য কোম্পানির আমলকে দায়ী করেন, বাংলার নতুন জমিদারশ্রেণীই তাঁদের যুক্তি প্রীতি সহানুভূতি কোনোটাই সমর্থন করবেন না। সেকালের রাজস্বআদায়কারীরা বনেদী জমিদার হয়েছিলেন, একালের ইংরেজের দালাল বেনিয়ানরা অনেকে সেইরকম নতুন জমিদার হয়েছেন। সেটা অভিনব ব্যাপার নয়। অভিনব ব্যাপার হল, জমিদারদের গোত্রান্তর। গোত্রান্তরিত বনেদী (অথবা নতুন) জমিদারদের মধ্যে যাঁরা সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে, জালজুয়াচুরি করে সম্পত্তি নিলামে তুলে, বেনামীতে কিনে, ব্যভিচার ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, উপস্বত্বভোগীর আধিক্যে যাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা চরম সীমায় পৌঁছেছিল, শাস্ত্রসম্মত ন্যায্য উত্তরাধিকারীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যাঁদের জমিদারী শত টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল, তাঁরাই কেবল ধ্বংস হয়ে গেছেন। ইংরেজের নতুন জমিদারীব্যবস্থার জন্য অথবা রাজস্বের চাপে তাঁরা যে নির্বংশ হয়ে যাননি তা ইংরেজরাজত্বকালে নতুন জমিদারশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভাববৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়।

বাংলার মজুরশ্রেণী

ইংরেজের নতুন জমিদারীব্যবস্থার ফলে যদি কেউ ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে বাংলার প্রজারা এবং বাংলার কৃষক-কারিগরেরা ধ্বংস হয়েছে। বাংলার প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছে, জমিদারের দস্যু ও লাঠিয়ালরা তাদের ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে গ্রামছাড়া করেছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী ধরে এইভাবে জমিদাররা যে কৃষকশ্রেণীকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন তারাই

পরে শহরের কলকারখানার সর্বস্বান্ত মজুরশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু উৎখাত কৃষকদের সংখ্যানুপাতে দ্রুত কলকারখানার বিকাশ হয়নি, মজুরের চাহিদা বাড়েনি, তাই এই সময় ভবঘুরে ভিখারী ও চোরডাকাতের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। কার্ল মার্ক্স তাই বলেছেন :[১৭]

They were turned *en masse* into beggars, robbers, vagabonds, partly from inclination, in most cases from stress of circumstances. ...The fathers of the present working-class were chastised for their enforced transformation into vagabonds and paupers.

তারা (উৎখাত কৃষকরা) দলে দলে ভিখারী ভবঘুরে দস্যু হল, কতকটা ইচ্ছা করে, কিন্তু সাধারণত অবস্থার চাপে পড়ে।...আজকের মজুরশ্রেণীর পূর্বপুরুষদের এইভাবে অবস্থার চাপে পড়ে ভবঘুরে ও ভিখারী হওয়ার জন্য কঠোর শাসন করা হয়েছিল।

Thus were the agricultural people, first forcibly expropriated from the soil, driven from their homes, turned into vagabonds, and then whipped, branded, tortured by laws grotesquely terrible, into the discipline necessary for the wage system.

এইভাবে কৃষকরা প্রথমে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত হয়ে ভবঘুরের দলে পরিণত হল। তারপর কঠোর আইন-কানুনের চাবুক মেরে, শাসন করে, নির্যাতন করে তাদের আধুনিক যন্ত্রযুগের মজুরশ্রেণীর নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হল।

বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে এইভাবে গ্রাম থেকে উৎখাত সর্বস্বান্ত কৃষক-কারিগরদের কঠোর আইনের চাবুক মেরেও নতুন যুগের মজুরশ্রেণীতে পরিণত করা হয়নি। শ্রমশিল্প ও কলকারখানার প্রসার এদেশে অত্যন্ত মন্দগতিতে হয়েছে বলে গ্রামের উৎখাত কৃষক কারিগরেরা মজুর হয়নি। মজুর যে একেবারেই হয়নি তা নয়। অনেকে পাটের কল, কয়লাখনি ও রেলের মজুর হয়েছে, অনেকে নীলক্ষেত ও চাবাগানের মজুর হয়েছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা জুড়ে সেসময় জমিদারদের প্রজা-উচ্ছেদ ও লুটতরাজ চলছিল। তাই বাংলার কয়লাখনি ও কলকারখানায় বিহারী উড়িয়া সাঁওতালী মজুরেরও অভাব হয়নি।* কর্মক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতার জন্যই বাঙালী

*বাংলাদেশে অবাঙালী মজুরের, বিশেষ করে বিহারী উড়িয়া সাঁওতালী মজুরের

মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি যতখানি বাংলাদেশে হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। কলকারখানায় মজুরের কাজের সুযোগও তাদের অনেক কমে গেছে। কর্ম-বিমুখতার জন্য যে বাংলাদেশের সর্বস্বান্ত উৎখাত কৃষকরা মজুর হয়নি তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।†

বাংলাদেশের উৎখাত কৃষক ও কারিগরদের সামনে জীবনধারণের দুটি প্রশস্ত পথ খোলা রইল : ক্ষেতমজুরি ও চুরিডাকাতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই ক্ষেতমজুর ও চোরডাকাতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জমিদাররা লাঠিয়াল ডাকাত পাঠিয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করতেন, আর সেই উৎসন্ন কৃষকরা মরিয়া হয়ে ডাকাতদের দল গঠন করে লুঠতরাজ করত। এইভাবে লুঠতরাজ দস্যুবৃত্তির দুষ্টচক্রে পড়ে বাংলাদেশে এক মারাত্মক 'মাৎস্যন্যায়ের' যুগ এল।[১৮] ইংলণ্ডের মতন এদেশের এই ভবঘুরেদের ও দস্যুদের আইনের চাবুক মেরে কারখানার মজুর তৈরি করা হল না। চাবুকের চোটে তাদের পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, ডাণ্ডাবেড়ীর চাপে হাতে-পায়ে কড়া পড়ে গেল, কিন্তু কারখানার মজুর হওয়ার সুযোগ হল না সকলের। অধিকাংশই ক্ষেতমজুর হয়ে গ্রামেই রইল, শহরের দিকে এল না।

বাংলার নতুন শ্রেণীবিন্যাসের যুগে যাঁরা এইভাবে সমাজটাকে ভেঙেচুরে ফেললেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীশ্রেণী এবং তাঁদেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাংলার বনেদী ও নতুন হঠাৎ-জমিদারশ্রেণী। বনেদী জমিদারদের মধ্যে একশ্রেণীর জমিদারের বেসামাল হয়ে ভরাডুবি ও নির্বংশ হওয়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার, আদৌ বৃহৎ ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হল, নতুন জমিদারশ্রেণীর ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব, বহু উপস্বত্বভোগী ক্ষুদে জমিদারদের আবির্ভাব, গ্রাম কৃষি ও

আবির্ভাব এই সময় থেকেই হয়। তারপর থেকে এই অবাঙালী মজুরদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাংলাদেশে আরও বাড়তে থাকে, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমশিল্পের প্রসার বিহার উড়িষ্যায় বিশেষ হয়নি, যা হয়েছিল বাংলাদেশে। (১৯৪৮)

†একথাও সম্পূর্ণ সত্য নয় যে বাংলার কারিগর-কারুশিল্পীরা, যেমন কর্মকার কংসকার প্রভৃতি, 'নবশাখ' পর্যায়ভুক্ত বলে গ্রাম্যসমাজের মর্যাদা তাদের ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং তা হয়নি বলে কারখানার মজুর জীবনের অথবা শহুরে সমাজের আকর্ষণ তাদের কাছে বাড়েনি। বরং বাংলার মাটি সুজলা সুফলা বলে গ্রাম্যজীবনে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সাধারণ দরিদ্র চাষীরাও তেমন অনুভব করেনি। এমনকি ২৪-পরগণা হাওড়া হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও যে-সমস্ত বাঙালী কৃষক-কারুজীবী শিল্পকারখানার মজুর হয়েছে, তারাও এক পা গ্রামে রেখে আর এক পা কারখানার দিকে বাড়িয়েছে, অর্থাৎ পুরো proletarianized হয়নি। আজকের দিনেও তা দেখা যায়। (১৯৭৮)

কৃষকের সঙ্গে জমিদার ও উপজমিদারদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কচ্ছেদ। জমিদাররা হলেন রাজস্বের কন্‌ট্র্যাকটর, এবং তাঁদের অধীনে থাকলেন অসংখ্য স্তরবিন্যস্ত সাব-কন্‌ট্র্যাকটর। জমিদাররা গ্রামের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে শহরের অট্টালিকায় এলেন, বুলবুলি হাফ্‌-আখড়াইয়ের দল, শখের যাত্রাপার্টি, কবির লড়াই এবং মদমেয়েমানুষের জন্য অনর্গল অর্থব্যয় করতে লাগলেন :

> পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান··· দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা। বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত···
>
> —কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

অনেকে নতুন যুগের শিক্ষা ও শিল্পকলার 'পেট্রন' হয়ে 'সম্ভ্রান্ত' হবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের সঞ্চিত ধন 'শ্রমশিল্পের মূলধনে' পরিণত হল না, কারণ ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা সে-সুযোগ তাঁদের দিলেন না। ব্যভিচার-বিলাসিতায় এবং বংশধরদের মামলা-মোকদ্দমায় সঞ্চিত ধন ক্ষয় হতে থাকল। আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হল এই যে গ্রামের নিপীড়িত কৃষক কারিগরশ্রেণীর অধিকাংশই সর্বস্বান্ত ক্ষেত-মজুরশ্রেণী ও চোরডাকাতের দলে পরিণত হল এবং সামান্য অংশ শহরের নতুন কলকারখানা রেল ও কয়লাখনির মজুর হল। গ্রামের ক্ষেতমজুর ও শহরের কারখানার মজুর সমাজের তলায় একই স্তরে এসে দাঁড়াল। গ্রামের নতুন পুঁজিপতিশ্রেণী (জমিদারশ্রেণী) এবং শহরের নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ এদেশে মূলধন সঞ্চয়ের প্রাথমিক যুগে প্রায় অভিন্ন হয়ে গেল।

বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণী

বাঙলার বুর্জোয়াশ্রেণীর ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা সহজ নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যে ধীরে ধীরে বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিকাশের ধারা রীতিমত জটিল হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশে শ্রমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মুৎসদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্‌যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে। বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ঠিক এই ধারাতেই পুঁজিপতিশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে।* ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আওতায় বাঙলার

বণিক মুৎসদ্দী দালাল ও শিল্পোদ্‌যোগী পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীতে পরিণত হন। নতুন যুগের এই বণিক মুৎসদ্দী ও শিল্পোদ্‌যোগীদের সঙ্গে আগেকার যুগের নাথজী শেঠজীদের পার্থক্য আছে। সে-বিষয়ে আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। নতুন যুগের শিল্পোদ্যম ও প্রতিযোগিতা বাধাবন্ধ-হীন এবং শিল্পবাণিজ্য হল যন্ত্রযুগের শ্রমশিল্প ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যেরই বাণিজ্য। তাছাড়া নতুন যুগে শিল্পোদ্‌যোগীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রাধান্য হল ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আওতায় পরিপুষ্ট হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীর এই উদ্যম এবং তার চেয়েও বেশি আধিপত্য উল্লেখযোগ্য। বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস তাই এদেশে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের সনদ পেয়ে এদেশে 'এজেন্সি হাউস' প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই এই এজেন্সি হাউসগুলি প্রধানত কলিকাতায় গড়ে ওঠে। ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত কাজই তখন এই এজেন্সি হাউসগুলি করত। ১৭৯৭ সালের মধ্যেই কলিকাতায় প্রায় ১৯টি এজেন্সি হাউস প্রতিষ্ঠিত হয় দেখা যায় :[১৯]

---

* অনেক লেখকের রচনার মধ্যে এদেশের বনেদী জমিদারবংশগুলি এবং শেঠজী নাথজীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ধ্বংস হবার জন্য বিলাপের সুর ফুটে ওঠে। আমাদের দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, এও অনেকে মনে করেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেঠজী নাথজীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং কয়েকটি নগরের সমৃদ্ধি যদি শ্রমবিপ্লবের পটভূমিকা তৈরি করে থাকে তাহলে বলতে হয় বৌদ্ধযুগ থেকেই ভারতবর্ষে এই পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল। বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজির যে অগ্রগতি শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রয়োজন তা ভারতবর্ষে বাদশাহী যুগে হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। তাছাড়া শ্রেষ্ঠী বণিক শেঠদের প্রভূত ধনসম্পদের প্রতিপত্তি আর স্বাধিকারজনিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিপত্তি এক নয়। ভারতবর্ষে শেঠ ও বণিকদের (মধ্যযুগে বা মোগল যুগে) কোনোদিন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক প্রতিপত্তি ছিল না, অথচ এই প্রতিষ্ঠাই শিল্পবিপ্লবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রিটিশযুগে ভারতীয় বণিকদের এই প্রতিপত্তির সুযোগ সামান্য হলেও সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা সোৎসাহে যন্ত্রপাতি আমদানি করেননি এবং কলকারখানার প্রসারেও উৎসাহ দেননি, একথা অত্যন্ত সহজ সত্য কথা। সাম্রাজ্যবাদের নীতিই হল তাই। কিন্তু ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে এবং শোষণের ঐতিহাসিক তাগিদে এদেশে যেটুকু যন্ত্রপাতি এনেছেন, কলকারখানা রেলপথ ইত্যাদি তৈরি করেছেন, তার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, এদেশে খানিকটা শিল্পায়নের সূচনা হয়েছে। তার মধ্যেই এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর ধীরে ধীরে বিকাশ হয়েছে! (১৯৪৮)

ককারেল, ট্রেল এণ্ড কোং	ফ্রুসলহার্ড এণ্ড লাপ্রিমাউদে
ফেয়ার্লি, গিলমোর এণ্ড কো°	টড এণ্ড মিলার
ল্যাম্বার্ট, রস্ এণ্ড কো°	ভিরালার্স এণ্ড কোং
বার্বার, পামার এণ্ড কোং	জেম্‌স ম্যাটাগার্ট
পিরাউ এণ্ড পলিং	এবট্‌স ব্লান্‌সহার্ড এণ্ড পার্‌সি
কলভিন্‌স এণ্ড বাজেট	গ্রিলার্ড এণ্ড কোং
গার্ডিনার, মস্‌ক্রপ এণ্ড আলেকজাণ্ডার	ক্যাম্বেল এণ্ড ক্লার্ক
হামিল্টন এণ্ড এবার্ডিন	ক্যাম্বেল এণ্ড র‍্যাড্‌ক্লিফ
গওয়ান্‌স এণ্ড হর্সলে	ডুবস্ট, রুস্‌সাক এণ্ড কোং
ডাউনি এণ্ড মেইটল্যাণ্ড	

১৮০৫-০৬ সালেও ১৯টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে কয়েকটি নতুন নাম আছে :[১০]

আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং	টমাস হিগিন্‌স এণ্ড কোং
ম্যাকিন্‌টস, ফাল্টন এণ্ড কোং	আর্কিবল্ড সিম্পসন এণ্ড কোং
এলেন ম্যাক্‌লিন	জি. ভিগনন এণ্ড কোং

১৮০৭ সালে ১৮টি এজেন্সি হাউসের নাম দেখা যায়, তার মধ্যে 'জোসেফ ব্যারোটা এণ্ড কোং' এবং 'স্কট উইল্‌সন এণ্ড কোং' নাম দুটি নতুন। ১৮০৮ সালে ১৮টি এবং ১৮১০ সালে ২৭টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলির পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, অনেক কোম্পানির অংশীদারের নাম বদলেছে মাত্র।[১১] এজেন্সি হাউসগুলির সাধারণত তিন-চারজন করে অংশীদার থাকত এবং সকলেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী। হাউসগুলির প্রতিষ্ঠার সময় অংশীদারদের নিজেদের কোনো মূলধন ছিল না, কোম্পানির কর্মচারীদের আমানত থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হত। কোম্পানির কর্মচারীদের বাৎসরিক সঞ্চয় থেকে আমানত যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেত, এদেশী ধনিক বণিকরাও এইসব হাউসে গচ্ছিত রাখতেন।[১২] এই এজেন্সি হাউসগুলির উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে টমাস ব্রাকেন 'হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির' কাছে বলেন :

> ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন উচ্চপদস্থ সিভিল ও মিলিটারী কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা দেখলেন যে কোম্পানির দাসত্ব করার চাইতে এই বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তাঁরা টাকা গচ্ছিত পেলেন এবং মূলধন হিসাবে সেই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা সঞ্চয় করলেন। এইভাবে তাঁরা এক-একজন বেশ মোটা পুঁজি নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরলেন।[১৩]

এজেন্সি হাউসগুলি যে লভ্যাংশ দিত তা থেকেই অংশীদারদের মুনাফা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হতে পারে :[২৪]

পামার এণ্ড কোং	৩০%
জি. ম্যাক্‌ক্লিপ এণ্ড কোং	২৬%
আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং	৬%
ফার্গুসন এণ্ড কোং	৩৬॥০%
ম্যাকিন্‌টস এণ্ড কোং	১২%
কল্‌ভিন এণ্ড কোং	২৪॥০%

এই এজেন্সি হাউসগুলিই যে ইংরেজ বণিকদের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই হাউসগুলির মারফত তাঁরা এদেশে রেশম নীল পাট তুলা ইত্যাদির ব্যবসা করেছেন, প্রায় ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত সুদে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়েছেন এবং তার ফলেই তাঁরা ধীরে ধীরে 'mercantile leviathans of the East' হয়েছেন।[২৫]

১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একচেটে বাণিজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার পর এজেন্সি হাউসগুলি প্রচণ্ড ধাক্কা খায় এবং তার ফলে অনেক হাউস উঠে যায় :

> কলিকাতা নগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্র কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তাদ্দ্বারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে।
>
> —সমাচার দর্পণ, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৩২

ফার্গিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া হয়। (সমাচার দর্পণ, ২৫ নবেম্বর ১৮৩৩) পামার কোম্পানি, ফার্গুসন কোম্পানি, আলেকজাণ্ডার কোম্পানি প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় এজেন্সি হাউস এই সময় দেউলিয়া হয়ে যায়। ক্রফোর্ড বলেছেন, ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটে বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে যখন ইংরেজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা দেওয়া হল, তখন এজেন্সি হাউসগুলি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অনেকেই টিকতে পারল না। নতুন নতুন কোম্পানি ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠল।[২৬] অর্থাৎ, বণিকতন্ত্রের অবসানের পর ধনতন্ত্রের যুগে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যখন মুনাফার সন্ধানে বহির্মুখী হলেন তখন এদেশে অনেক বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানি ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার যে কয়েকটি বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানির নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান হল :[২৭]

র‍্যালি ব্রাদার্স	বেগ ডানলপ এণ্ড কোং
ম্যালকম এণ্ড কোং	মার্টিন বিলার্স এণ্ড কোং
জে. মরিসন এণ্ড কোং	টার্নার, ক্যাডোগান এণ্ড কোং
জার্ডাইন স্কিনার এণ্ড কোং	কেলি এণ্ড কোং···ইত্যাদি

এই কোম্পানিগুলির প্রতিষ্ঠা ১৮১৩ সালের পরে হয়েছে বলে মনে হয় এবং 'টার্নার মরিসন', 'মার্টিন কোং' ইত্যাদি নাম দেখে বোঝা যায় পরবর্তী-কালে অংশীদার বদল হয়েছে।* বর্তমানের 'ম্যানেজিং এজেন্সিপ্রথা' এই ধারারই পরিণতি।

এদেশের উদ্‌যোগী ব্যবসায়ীরা প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে 'এজেন্সি হাউসগুলির' দেওয়ানী ও মুৎসদ্দীগিরি করতেন এবং পরবর্তীকালে বড় বড় ব্রিটিশ বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ও এজেণ্ট নিযুক্ত হতেন। এই দেওয়ানী দালালি বেনিয়ানগিরি ও এজেন্টের কাজে তাঁরা প্রভূত ধনসঞ্চয় করেছেন।

> পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যাভাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরেজরা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন।
>
> —সমাচার চন্দ্রিকা, ২ মে ১৮৩১

> তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এই রূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন।
>
> —শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৬৮ পৃঃ

> ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া···বেতনোপভুক্ত হইয়া কিম্বা রাজের

---

* একথা কতটা সত্য তা বলা কঠিন, তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাঙলার ও কলিকাতার 'Directory' ও 'Almanack'-গুলি অনুসন্ধান করে যা পাওয়া গেছে তা থেকে এদেশের ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির গোড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে এই রকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। এখনও যেসব কোম্পানি এদেশে আছে তাদের প্রচারিত ইতিহাস নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ কোম্পানির মালিকের পরিবর্তন হয়েছে এবং বর্তমানে যাঁরা মালিক তাঁদের কাছ থেকে কোম্পানির গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার মতো নথিপত্র পাওয়া যায় না। চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তাঁরা বলেন, নথিপত্র নাকি বিলেতে আছে। (১৯৪৮)

সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা···কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···

—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'নববাবুবিলাস'

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকীর দাওয়ানিতে বিলক্ষণ দশটাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশলক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন।

—কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

১৮০৫-'০৬ সালের কলিকাতার "বার্ষিক ডিরেক্টরী ও অ্যাল্‌ম্যানাকে" এদেশীয় বণিক দালাল ও শ্রফ্‌দের একটা নামের তালিকা পাওয়া যায়, তার মধ্যে দালাল ও শ্রফ্‌দের নামগুলি এই :

লক্ষ্মীকান্ত বড়াল	স্বরূপচাঁদ শীল
দত্তরাম দত্ত	জগমোহন শীল
রামমোহন পাল	আনন্দমোহন শীল
মথুরামোহন সেন	স্বরূপচাঁদ আঢ্য
নিত্যচরণ সেন	কানাইলাল বড়াল
রামসুন্দর পাইন	সনাতন শীল

এর মধ্যে দেখা যায়, সকলেই প্রায় সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের। ১৮১০ সাল পর্যন্ত এই তালিকার মধ্যে দু' একটি নতুন নাম যুক্ত হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এখানে বাংলার বণিকদের মধ্যে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের উদ্যম বিশেষ লক্ষণীয়। ১৮৫৮ সালে বাঙালী পরিচালিত কয়েকটি বড় বড় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় :[১৮]

প্রতিষ্ঠানের নাম	অংশীদারদের নাম	ব্যবসায়কেন্দ্র
আশুতোষ দে এণ্ড কোং :	আশুতোষ দে, শ্যামাচরণ মিত্র, রামধন ঘোষ :	লিয়নস্ রেঞ্জ
চ্যাটার্জি মিত্র এণ্ড কোং :	চন্দ্রকুমার চ্যাটার্জি, উমাচরণ মিত্র :	পোলক স্ট্রীট
দে মুখার্জি এণ্ড কোং :	গোবিন্দ চন্দ্র দে রামাচরণ মুখার্জি :	পোলক স্ট্রীট
রামগোপাল ঘোষ এণ্ড কোং	রামগোপাল ঘোষ :	লিয়নস রেঞ্জ
দত্ত লিন্‌জি এণ্ড কোং :	জন লিন্‌জি, রাজেন্দ্র দত্ত : এ. এইচ. রোড স, এস. মাউয়ার	লিয়নস রেঞ্জ

মোহনচাঁদ দত্ত এণ্ড সন্স :	পীতাম্বর দত্ত, সাগর দত্ত : দ্বারকানাথ দত্ত	রাধাবাজার
মতিলাল মল্লিক এণ্ড কোং :	মতিলাল মল্লিক :	সোয়ালো লেন
প্রেমচাঁদ, ফিল্‌স এণ্ড কোং :	ত্রৈলক্যনাথ মুখার্জি :	সুতিবাগান
রাধানাথ দত্ত এণ্ড কোং :	রাধানাথ দত্ত :	চীনাবাজার

এছাড়া প্রায় ৬৫ জন বেনিয়ানের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে বড় বড় কয়েক-জনের নাম এখানে উল্লেখ করছি :

বেনিয়ানের নাম	কোম্পানির নাম
আশুতোষ দে এণ্ড কো	: চার্লস কার্ন্টন এণ্ড কোং, বার্লি ব্রাদার্স জে. ই. এমরি, চার্লস ফবেষ্টাব, জে. এইচ. এডাম্‌স
বিমলাচরণ দেব	ম্যাল্‌কম এণ্ড কোং, বেগ্ ডানলপ এণ্ড কোং, জে. মরিসন এণ্ড কোং
ঈশানচন্দ্র বসু	জার্ডাইন্ স্কিনার এণ্ড কোং, ই প্রেষ্ট্ উইচ মিড্‌লটন এণ্ড কোং
গোরাচাঁদ দত্ত	ক্রুক, গ্রে এণ্ড কোং
গুরুচরণ সেন	কল্‌ভিন এর্নাসল কাউই এণ্ড কোং, চাচ জুনিয়র এণ্ড কোং, লিভিংষ্টন উইদার্স এণ্ড কোং, ক্রুক এণ্ড গ্রে
হরিশচন্দ্র বসু এণ্ড সন্স	এলান ডেকেল এণ্ড কোং, উড ওলিক্ এণ্ড কোং, জে. অক্সফোর্ড এণ্ড কোং, জে. বি. বার্তিয়ার্স, স্যামুয়েল এণ্ড সন্স, শ্যাণ্ড ফেয়ার্লি এণ্ড কোং
ক্ষেত্রমোহন দাস	ই. শিয়ারিন এণ্ড কোং, পেনিংটন এণ্ড কোং, জি. টাইল এণ্ড কোং, উইলিয়মসন ব্রাদার্স
অভয়চরণ গুহ	টানার ক্যাডোগান এণ্ড কোং, কাউয়েল এণ্ড কোং, এ. এল. টুরায়েল
প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোং	হেণ্ডার্সন ওয়ালেস এণ্ড কোং, কেলি এণ্ড কোং, রবিনসন বাফুর এণ্ড কোং, মে পিকফোর্ড এণ্ড কোং, জন. এলিয়ট এণ্ড কোং, স্মিথ ফেরারি এণ্ড কোং, চার্লস ও জনষ্টন
শম্ভুনাথ মল্লিক	স্মিথ গ্রীনষ্ট্রীট এণ্ড কোং
রাজকৃষ্ণ মিত্র এণ্ড কোং	এ. ষ্টিভেন্স এণ্ড কোং, হুইটনি এণ্ড ইয়ং
রামনাথ ব্যানার্জী	লার্পেন্ট, সণ্ডার্স এণ্ড কোং
রামনাথ গোঁসাই	মার্টিন পিলার্স এণ্ড কোং, লার্পেন্ট সণ্ডার্স এণ্ড কোং
শ্যামচরণ ঘোষ	গ্রিফিথ্‌স হে এণ্ড কোং, লংলয়েস এণ্ড কোং
জয়নারায়ণ বসু	দত্ত লিনজি এণ্ড কোং
কালীচরণ চ্যাটার্জী	ক্রুনেট এণ্ড কুইলেট

সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ছাড়াও সকল সম্প্রদায়ের বাঙালী যে নিজেরা ব্যবসায়ে উদ্‌যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা এই সব নামের তালিকা থেকে

বুঝতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বাঙালীদের বিরুদ্ধে শিল্পোদ্যমের অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ সাধারণত করা হয়ে থাকে তা ভিত্তিহীন। মারওয়াড় থেকে এদেশে এসে জগৎ শেঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন এবং তাঁরই অর্থ-সাহায্যে নবাবরা ও ইংরেজরা অনেক সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সত্য।[২৯] কিন্তু বাংলার লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধর, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, দ্বারকনাথ ঠাকুর, রামহরি বিশ্বাস, সুখময় রায়, রামচরণ রায়, রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিদের আর্থিক প্রতিপত্তি ও বাণিজ্যিক উৎসাহ জগৎ শেঠ অমিচাঁদের তুলনায় তাঁদের কালে কম ছিল না।

নকুড ধর নামেই লক্ষ্মীকান্ত ধর পরিচিত ছিলেন। নকুড় ধরের অর্থ-সাহায্যের জন্য ইংরেজরা অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছে জগৎ শেঠ যা ছিলেন, ইংরেজদের কাছে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে নকুড় ধরও তাই ছিলেন। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাই সে-সময় তাঁর বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর কন্যার একমাত্র জীবিত পুত্র সুখময় রায়। সার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানি করে সুখময় প্রভূত পরিমাণে সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। লর্ড মিন্টোর আমলে তিনি 'রাজা' উপাধি পান। সুখময় 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের' একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর ছিলেন। মতিলাল শীল সামান্য বোতল ও কর্কের ব্যবসা থেকে শুরু করে পরে নানারকম ব্যাবসাবাণিজ্যে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। তখনকার ৫০-৬০টি বাণিজ্যকুঠির মধ্যে প্রায় ২০টি কুঠির বেনিয়ান ছিলেন মতিলাল। বেনিয়ান-গিরি ছাড়াও তিনি জমির ব্যবসা করতেন। তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী জমির মালিক তখন আর কেউ শহরে ছিলেন কিনা সন্দেহ। জমিজমা থেকে মতিলাল মাসিক প্রায় ৩০,০০০ টাকা খাজনা পেতেন। অনেক বিদেশী "এজেন্সি হাউসের' অংশীদার হয়ে তিনি ব্যবসা করেন, তার মধ্যে "ফার্গুসন ব্রাদার্স এণ্ড কোং", "ওজওয়াল্ড শীল এণ্ড কোং", "টুলো এণ্ড কোং" ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি আটার কলেরও মালিক ছিলেন মতিলাল এবং এদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পর্যন্ত বিস্কুট চালান দিতেন। বিশ্বম্ভর সেন মাত্র ৮।১০৲ নিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, পরে প্রায় ২০টি বাণিজ্যকুঠির বেনিয়ান হন এবং মৃত্যুকালে ২ লক্ষ পাউণ্ড গচ্ছিত রেখে যান।[৩০] রাজা নবকৃষ্ণ মিরজাফরের নবাব হবার সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানী করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। রামচরণ রায় গবর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ানী করে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধি-

শালী ঠাকুর পরিবারের প্রধান শাখার আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। রামদুলাল দে বোধ হয় তাঁর সমসাময়িককালে কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। বাণিজ্যসূত্রেই রামদুলাল ধনী হন। ইনি বহুদিন ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর কারবারও ছিল। ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের লবণের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ানী করে রামহরি বিশ্বাস প্রভূত সম্পত্তিলাভ করেন এবং তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস এই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করেন। গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট বিত্তলাভ করেন। গোকুল-চন্দ্র মিত্র রসদের ঠিকাদারী করে সমৃদ্ধিলাভ করেন। পামার কোম্পানির খাজাঞ্চি গঙ্গানারায়ণ সরকার কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন, কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই তিনি বিত্তলাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর অবস্থা গোড়াতে মোটেই ভাল ছিল না, কিন্তু পরে লবণের ব্যবসায়ে তিনি অতুল ঐশ্বর্যলাভ করেন। মথুরামোহন সেন শ্রফের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই, রামলোচন ঘোষের পুত্রও বিশাল সম্পত্তির মালিক। রামমোহন হেস্টিংসের সরকার ছিলেন। বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী ছিলেন, এঁদের সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মল্লিকের ব্যবসায়ে লব্ধ।[৩১]

মতিলাল শীল, বিশ্বম্ভর সেন, রামদুলাল দে, রাধাকৃষ্ণ বসাক রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতির মধ্যে যে শিল্পোদ্‌যোগ দেখা গেছে তা যে নিশ্চয়ই যুগবৈশিষ্ট্য তা স্বীকার করতেই হবে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিচিত্র কর্মজীবনের মধ্যে নতুন যুগের এই সাহস উদ্যম ও তৎপরতা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।* দ্বারকানাথ ঠাকুর নীল ও রেশমের রফ্‌তানির কাজ করেন, নিমকের এজেন্ট প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ানি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ধনসঞ্চয় করে দ্বারকানাথ স্বাধীন বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে 'টেগোর অ্যাণ্ড কোং' নামে তিনি এক কোম্পানি স্থাপন করেন এবং 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' প্রধান কর্মকর্তা হন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পত্রিকায় দ্বারকানাথের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকেই তাঁর কর্মবহুল জীবনের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে : [৩২]

স্বাধীন শিল্পোদ্যমের আদর্শ দ্বারকানাথ তাঁর দেশবাসীর কাছে

* দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামদুলাল দে-র বাণিজ্যকর্মের বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থকারের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৯৬৯) গ্রন্থের 'বাঙালীর শিল্পোদ্যম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (১৯৭৮)

করে তুলে ধরেছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁর জমিদারীর প্রায় সর্বত্রই নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্‌যোগী হয়ে বাইরের দেশের মতন এদেশে তিনি চিনি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। জমিদার, প্লান্টার এবং উদ্‌যোগী ব্যবসায়ী হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, কলিকাতার প্রত্যেক ধনী ব্যবসায়ী এবং গবর্নমেণ্টের নানাবিভাগের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর এই প্রতিপত্তির জন্যই তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে তার একমাত্র মালিকও হন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালী কম্‌প্র্যাডোর বুর্জোয়াশ্রেণীর যে নিশ্চিন্ত বিকাশ শুরু হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই বিকাশ মন্দগতিতে অসমতল পথে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত, এদেশে ব্রিটিশের উপনিবেশ, দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দী হল সামন্তযুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণের যুগ। উপনিবেশ বলে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া কদাচ সম্ভব নয়। স্বার্থসচেতন ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এদেশের শিল্পোদ্‌যোগী ব্যবসায়ীদের তাই বাণিজ্যের অথবা প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের অথবা সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করার অবাধ স্বাধীনতা দেননি। কিন্তু স্বার্থের খাতিরেই এদেশের নতুন জমিদারশ্রেণীর ও উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর আনুগত্য তাঁদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই এদেশের বণিক ও উদ্‌যোগী ব্যক্তিদের বাধ্য হয়ে তাঁদের বেনিয়ান মুৎসদ্দী দেওয়ান এজেণ্ট, এমনকি ব্যবসায়ের অংশীদার পর্যন্ত করতে হয়েছে। তেমনি, রাজভক্তির ছায়ায় ভিন্ন এদেশের বণিকদের প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের কোন সুযোগও ছিল না। তাই এসময় রাজানুগত্য এদেশীয় প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দেখা যায়। রাজানুগ্রহের ছায়াতলে, ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের পার্শ্বচর ও অনুচর হয়ে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বাল্যকাল কেটেছে।*

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণকে মার্ক্‌স প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের যুগ বলেছেন। এযুগে ধনতান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চয়ই

* কেবল বাঙালী কম্‌প্র্যাডোর-বুর্জোয়াশ্রেণীই যে ইংরেজরাজভক্ত ছিলেন তা নয়, নতুন ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীও (elite) তাই ছিলেন। জাতীয় বিদ্রোহের (সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭) প্রতি বাঙালী নব্যধনিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব থেকে তা বোঝা যায়। ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছোট-অংশীদার হবার জন্য তাঁরা যে আন্দোলন করেছেন, তাও রাজানুগত্যের বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। (১৯৭৮)

সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। সামন্তযুগের উত্তরাধিকার বহন করে, সামন্ত-যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সন্ধিক্ষণের যুগের ব্যবসায়ীদের পুরাতন ও নতুন প্রথার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। জমিদারী কেনাবেচা করে, ব্যবসাবাণিজ্য দালালি দেওয়ানী এজেন্সি করে, যেভাবেই ধনসঞ্চয় করা হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রমশিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তা না করতে পারলে ধনতান্ত্রিক যুগের পরিপূর্ণ বিকাশও হতে পারে না।[৩৩] এদেশের উদীয়মান বুর্জোয়া-শ্রেণীর এই চেতনা থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, চেতনার তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দোলনের পর্যায়ান্তর হয় এবং বিংশশতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পরিণতি লাভ করে। যদি বলা যায়, প্রথম যুগের সঞ্চিত মূলধন নিয়োগের পরিপূর্ণ সুযোগ আমাদের দেশে এখন এসেছে, তাহলে বোধ হয় ভুল হয় না। এদেশের 'মূলধন' শ্রমশিল্পবিমুখ, একথা জোর করে বলার অধিকার এর আগে আমাদের ছিল না। আজ তার শিল্পবিমুখতা ও শিল্পপ্রচেষ্টা পরীক্ষা করার সময় এসেছে।

সুতরাং বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নিশ্চিত শুরু হয়েছে বলা যায় এবং সেযুগকে আমরা নিঃসংশয়ে উদীয়মান বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের যুগ বলতে পারি। শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যেমন যথাসম্ভব যুগোপযোগী উদ্যম সাহস ও কর্মতৎপরতার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন, তেমনি তাঁরা আবার বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ইতিহাসের ধারা সচল রেখেছেন।

বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী

নতুন ক্ষেতমজুরশ্রেণী, জমিদারশ্রেণী কারখানার মজুরশ্রেণী ও উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে বাংলার নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে সাধারণভাবে এই শ্রেণীর সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ দেওয়া কঠিন। ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণীর ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রেটেন সাহেব বলেছেন, সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমরা মধ্যশ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান।

এর ভিতর থেকে জমিদার ও কৃষকদের তিনি বাদ দিয়েছেন, কারণ ভূসম্পত্তি ও জমিজমাই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুদ্রা নয়। ধনিক শিল্পপতি, বণিক, শিক্ষিত চাকুরিজীবী ইত্যাদি যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, মুদ্রাই যাদের মূলমন্ত্র, যাদের কাছে ন্যায়-অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুদ্রা, যাদের জীবনসর্বস্ব মুদ্রা, তারাই হল মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৩৪] গতিশীল মুদ্রা যাদের শ্রেণী মর্যাদা। পদমর্যাদা সফলতা-বিফলতা, এমন কি মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে. গ্রেটন সাহেবের মতে তারাই হল 'মধ্যশ্রেণী'। 'আর 'বুদ্ধিজীবী' বা 'ইন্টেলিজেন্‌সিয়া' বলতে আমরা আজকাল যাদের বুঝি তাদের নামকরণ বোধ হয় সর্বপ্রথম জারের রুশিয়াতেই হয়।[৩৭] কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে পৃথক করে বিচার করা যুক্তিহীন। সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদেরই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলা হয়। এই শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বুদ্ধি ও শিক্ষার অস্বাভাবিক দম্ভ প্রকাশ পায়, যদিও সে-দম্ভ ধনতান্ত্রিক সমাজে একেবারেই ফাঁকা। বুদ্ধি শিক্ষা প্রতিভা সবই ধনতান্ত্রিক সমাজে মায়াবিনী মুদ্রার মুখাপেক্ষী এবং সকলেই মুদ্রার একান্ত অনুগত গোলাম। সুতরাং মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আর একটি উপশ্রেণী তৈরি করার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া মুদ্রা যখন নতুন গোত্রান্তরিত জমিদারশ্রেণী, বুর্জোয়াশ্রেণী এমন কি মজুর ও ক্ষেতমজুরশ্রেণীর জীবনেরও প্রধান অবলম্বন, সর্বক্ষেত্রে মুদ্রাপ্রাধান্য যখন নতুনযুগের বৈশিষ্ট্য, তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীকে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রার মাপ-কাঠিতে বিচার করাও অর্থহীন। এখানে আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধি-জীবীশ্রেণীকে একশ্রেণীভুক্ত হিসাবে বিচার করব। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর 'গঠন' পরিবর্তনশীল। নতুন যুগের সকল শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য যদিও পরিবর্তনশীলতা, তাহলেও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অন্যতম।

নতুন যুগের এই পরিবর্তনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ? ইয়োরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক অর্থনীতিবিদের রচনায় উল্লেখ আছে। এব্রাম কুম্‌ব, জন গ্রে, উইলিয়াম টম্‌সন, জন মর্গান, জে. এফ. ব্রে, র‍্যাভেন্‌স্টোন, টমাস হজ্‌স্কিন প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হজ্‌স্কিন বলেছেন : "দাস বা অর্ধদাস যারা তারাও একসময় তাদের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করেছিল···সম্পত্তির উপর তাদের ন্যায্য দাবি তাদের প্রভুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণীরও বিকাশ হয়েছে,

জমিদারশ্রেণীর কাছ থেকে তারাও তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী বিরাট এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে যারা মজুরি ও মুনাফা সংক্রান্ত সবরকমের আইনকানুনের বশ্যতামুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন। তাদের চরিত্রে পুঁজিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, অত্যন্ত ভরসার কথা। যন্ত্রের যত উন্নতি ও প্রসার হবে তত এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর কদর বাড়বে, সংখ্যাবৃদ্ধি হবে এবং সমাজকে এই মধ্যবিত্তরাই শেষ পর্যন্ত দাসত্ব ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করবে।" তারপর আরও পরিষ্কার করে হজ্‌স্কিন বলেছেন :

> মধ্যবিত্তশ্রেণী এমনই এক শ্রেণী যারা অল্প মেহনত করে এবং যন্ত্রযুগের প্রসারের তালে তালে যারা এমনই একটা স্থান সমাজে দখল করে নেয় যেখানে তাদের ধনিক ও মজুর দুই-ই মনে হয়। সাধারণ মজুরশ্রেণীর মতন তারা কেনাগোলামি করে না, কিন্তু মেহনত না করেও তাদের নিস্তার নেই। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপরেই আমার আশাভরসা সবচেয়ে বেশি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর আশ্চর্য বিস্তার হয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন বৃত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আরও দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হবে এবং গোলাম মজুরশ্রেণী ও সুদখোর মুনাফাখোর নিষ্কর্মা ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব মধ্যবিত্তশ্রেণীই সমাজের বুক থেকে মুছে ফেলে দেবে।[৩৬]

বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্বরূপ বিশ্লেষণে হজ্‌স্কিন বাস্তব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দেননি। সেই জন্য মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদ্গার করেও শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে সমাজে উচ্চশ্রেণীর অস্তিত্বের আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক, নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব ও প্রভাববৃদ্ধির কথা তিনি অনেকটা পরিষ্কার করে বলেছেন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হজ্‌স্কিন যা বলেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে পুঁজিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী চার্লস বুথ লণ্ডনের সকল শ্রেণীর লোকের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করে তা প্রমাণ করেছেন :[৩৭]

আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলে কেরানীদের অবস্থা আর কারিগর ও

মজুরদের অবস্থা একই বলা যায়। কেরানীরা বছরে ২৫ পাউণ্ড থেকে ১৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত উপার্জন করে, আর মজুরেরা করে সপ্তাহে ৩০।৪০। ৫০।৬০ শিলিং পর্যন্ত।

কিন্তু কেরানী ও মজুরদের আর্থিক অবস্থা এক হলে কি হবে? এ-হেন কেরানীজীবনেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বুথ বলেছেন :[৩৮]

কেরানীরা সকলে মেলামেশা করে কেরানীদের সঙ্গে, আর মজুরেরা করে মজুরদের সঙ্গে। উভয়শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মেলামেশার প্রচলন নেই বললেই হয়। মজুরদের জীবনযাত্রা আর কেরানীদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক। কেরানীদের স্ত্রীদের পর্যন্ত মেজাজ অন্যরকম। কেরানীদের চিন্তাধারা আদর্শ সবই স্বতন্ত্র, মজুরদের সঙ্গে মিল নেই কোথাও।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হজ্‌স্কিনের বিশ্লেষণ এবং বুথের দৃষ্টান্ত সমস্ত দেশের মধ্যবিত্তজীবনে প্রযোজ্য। কিন্তু তাহলেও ধনতান্ত্রিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান সহায় ও অনুচর হিসাবে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঐতিহাসিক গতিশীল ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এই কথা মনে রেখে আমরা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করব। আগেই বলেছি, এই দুই শ্রেণী-উপশ্রেণীর কোনো স্বাতন্ত্র্য আমরা স্বীকার করব না। সাধারণভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীশ্রেণী হিসাবেই এ মধ্যবিত্তদের বিচার করব।

বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই শ্রেণীর প্রভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে।* ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি, কারণ যতটা শাসকদের প্রয়োজনে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, সাধারণের স্বার্থের খাতিরে ততটা হয়নি। প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকদের এদেশীয় পণ্ডিত মুনশী মৌলবীদের প্রয়োজন ছিল শাসনকার্যের সুবিধার জন্য। তাই প্রথম যুগে সামান্য ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে তাঁরা এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন।

...কথিত আছে ঢেঁকি-যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেঁকে দেয়, ইত্যাদি হইতে পারে ইংরেজদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক

* গ্রন্থকারের 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৯৬৯) এবং 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' (২য় সংস্করণ ১৯৭৮) দ্রষ্টব্য।

সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইহা দেশবিখ্যাত আছে···

(সমাচার চন্দ্রিকা, ২মে ১৮৩১)

পরবর্তীযুগে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন হয়, হাইস্কুল কলেজ মেডিকাল কলেজ, ল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হয়। তৃতীয় যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। উচ্চসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই ছিল প্রথম দুই পর্বে গবর্নমেণ্ট ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের মুখ্য উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শিক্ষানীতিই অনুসৃত হয়। তারপর আধুনিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রচলন ধীরে ধীরে হতে থাকে। তাই আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলতে আমরা যাদের বুঝি সেই শ্রেণীর বিকাশ হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। হান্টার সাহেবের হিসাবে চব্বিশপরগণা ও কলিকাতায় (১৮৭০-৭৩ সালে) এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের বিকাশ সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক।[৩৯] যেমন :

ডাক্তার	৬৬৭	অধ্যাপক	৩৪	মৌলবী	৫১
হাকিম	১৪৩	স্কুলমাস্টার	১৮১৪	ছাত্র, বিদ্যার্থী	১০,২৮১
কবিরাজ	১২৬১	পণ্ডিত	৪৩৬	গ্রন্থকার	
গোবৈদ্য	৭৬	গুরুমশাই	৩৯০	সংবাদপত্রের	
ভেটারিনেরী সার্জন	৭	মুন্সী	২৭৪	সম্পাদক	২২
		এটর্নি	১২৭	ব্যারিস্টার	২৬
		উকিল	৭৩১		
		মুহুরি	৭৪৮		
		কাজি	১৯৬		

এই সঙ্গে কেরানী, ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীদেরও একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় :

নানাদ্রব্যের ব্যবসায়ী	৯৭৭
কেরানী	১০,২৪৭
রাইটার	১৫২২
(সরকারী কেরানী ?)	
সরকার	৭০২৬
দোকানদার	৩০,৪১৮

হান্টার সাহেবের এই গণনার মধ্যে যে যথেষ্ট গলদ আছে তা পরিষ্কার বোঝা

যায়। গলদ থাকাও স্বাভাবিক, কারণ সকলের বৃত্তিপরিচয় সঠিকভাবে এর মধ্যে দেওয়া হয়নি। ১৮৭০-৭৩ সালে ব্যারিস্টারের সংখ্যা ২৬ জন হতে পারে, কিন্তু কলেজ বা স্কুল থেকে পাস করা ডাক্তারের সংখ্যা নিশ্চয়ই ৬৬৭ জন হতে পারে না। এরকম ত্রুটি উক্ত সংখ্যাগণনায় যথেষ্ট আছে (যেমন উকিল অ্যাটর্নি ডাক্তার ইত্যাদির সংখ্যা)। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষক অধ্যাপক কেরানী ইত্যাদির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের ধারা খানিকটা বোঝা যায়। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের কলিকাতা শহর ও শহরতলীর সেন্সাস রিপোর্ট থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা হয়:[৪০]

১৮৮১		১৮৮১	
সরকারী কর্মচারী:		ব্যারিস্টার	৫১
আইন ও বিচার বিভাগ	১৬৭	উকিল	৩৫০
পুলিস বিভাগ	৩১৮৩	অ্যাটর্নি	৩১
জেল বিভাগ	১০৫	মোক্তার	৫১০
কাস্টমস্, আবগারী বিভাগ	১১১	শিক্ষক, অধ্যাপক	১৭৫২
টেলিগ্রাফ	৫৮	সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	৩৭
পোস্ট অফিস	৩১	দোকানদার	১৪,১৩১
অন্যান্য বিভাগ	৪৯০	কেরানী	১৬,৩১৫
মিউনিসিপালিটি ও পোর্ট কর্মচারী	৫৭		

১৮৯১		১৯০১	
সরকারী অফিসের কেরানী	৬৩৫৩	সরকারী কর্মচারী	১৮,৯৫০
সদাগরী অফিসের কেরানী	৭৮৫৭	ব্যবসায়ী (ছোট)	১১৫,৬৫৯
ব্যারিস্টার প্রভৃতি আইনজীবী	৫৪	বিদ্যাবুদ্ধিজীবী	১২,৫৩০
সলিসিটর	৬১		
মোক্তার	১০৩৯		

সেন্সাস রিপোর্টে প্রথমে যেভাবে বৃত্তিবিভাগ করা হয়েছে পরে সেভাবে করা হয়নি। তা না হলেও, হাণ্টার সাহেবের হিসাব এবং ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের কলিকাতা শহর ও শহরতলীর সেন্সাস রিপোর্ট থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। কেরানীদের সংখ্যাবৃদ্ধি যে-হারে হয়েছে, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের অর্থাৎ ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির সংখ্যাবৃদ্ধি সে-হারে হয়নি। না হওয়াই

স্বাভাবিক, কারণ ইংরেজদের শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য কেরানীদের প্রয়োজন ছিল বেশি। কেরানীদের সঙ্গে ক্ষুদে দোকানদার, খুচরা ব্যবসায়ী আর উকিল মোক্তারদের সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষক অধ্যাপকের সংখ্যাও শেষের দিকে কিছু বেড়েছে, কিন্তু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বাড়েনি। তার প্রধান কারণ, যন্ত্রশিল্পের প্রসার অত্যন্ত মন্দগতিতে হয়েছে বলে টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার হয়নি এবং টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাও সেইজন্য নগণ্য। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে কেরানীদের সংখ্যাধিক্য ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই দেখা যায় এবং বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সে-বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে।

বাঙালী মধ্যবিত্তের হিন্দুপ্রাধান্যের কারণ

এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দু-প্রাধান্যের কারণ কি? এর উত্তর বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস আলোচনা করার আগে হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ কিভাবে হয়েছে তা জানা দরকার। হাণ্টার সাহেবের হিসাবে ১৮৭১ সালে (এপ্রিল মাসে) বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা হল :

	হিন্দু	মুসলমান
(ক) সিভিল সার্ভিস	০	০
(খ) বিচার বিভাগ	০	০
(গ) অতিরিক্ত সরকারী কমিশনার	৭	০
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট		
ডেপুটি কালেক্টর	১১৩	৩০
আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	২৫	২
ছোট আদালতের জজ	২৫	৮
মুনসেফ	১০৮	৩৭
(ঘ) গেজেটেড পুলিস অফিসার	৩	০

(ক) ২৬০ জনই ইংরেজ
(খ) ৪৭ জনই ইংরেজ
(গ) মোট ৩৩ জনের মধ্যে বাকি ২৬ জন ইংরেজ
(ঘ) মোট ১০৯ জনের মধ্যে বাকি ১০৬ জন ইংরেজ

	হিন্দু	মুসলমান
(ঙ) জনকল্যাণ বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ার)	১৯	০
জনকল্যাণ বিভাগ (অন্যান্য)	১২৫	৪
জনকল্যাণ বিভাগ (অ্যাকাউন্টস)	৫৪	০
(চ) চিকিৎসা বিভাগ	৬৫	৪
(ছ) জনশিক্ষা বিভাগ	১৪	১
(জ) কাস্টমস, নৌ জরীপ ও আফিম ইত্যাদি	১০	০

১৮৯৬ সালে হাণ্টার সাহেব সরকারী কাজে নিযুক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় : [৪১]

	হিন্দু	মুসলমান
হাইকোর্টের জজ	২	০
ল' অফিসার	২	০
ব্যারিস্টার	৩	০
উচ্চপদস্থ কর্মচারী	০	০
উকিল	২৩৯	১
অ্যাটর্নি, সলিসিটর	২৭	০
আর্টিকেল্ড ক্লার্ক	২৬	০
এম. বি. ডাক্তার	১০	০
এল. এম. এফ.	৯৮	১

এই হিসাব থেকে সরকারী কাজে নিযুক্ত বাঙলার শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ১৮৮১ সালের কলিকাতার সেন্সাস রিপোর্টের সাধারণ হিসাবেও দেখা যায়, হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য :

	হিন্দু	মুসলমান
ব্যারিস্টার	১০	৩
উকিল	২৭১	১৭
অ্যাটর্নি	১৮	০

(ঙ) মোট ১৭৩ জনের মধ্যে বাকি ১৫৪ জন ইংরেজ
(চ) মোট ১৫৮ জনের মধ্যে বাকি ৮৯ জন ইংরেজ
(ছ) মোট ৫৩ জনের মধ্যে বাকি ৩৮ জন ইংরেজ
(জ) মোট ৪২২ জনের মধ্যে বাকি ৪১২ জন ইংরেজ

মোক্তার	৪২০	৮৯
শিক্ষক ও অধ্যাপক	১০৬৭	৫১১
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	০	০

কলিকাতার লেখাপড়া-জানা হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা হল :

	১৮৮১	১৮৯১
হিন্দুপুরুষ	৩৬·৯%	৩৯%
হিন্দুনারী	৬·৮%	৭·৫%
মুসলমান পুরুষ	১৪·২%	১৬·৭%
মুসলমান নারী	১%	১·৭%

বাংলার উচ্চপদস্থ হিন্দু-মুসলমান সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদির সংখ্যার যে-হিসাব উপরে দেওয়া হল তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী বিভাগগুলিতে মুসলমান কর্মচারী তো নেই-ই, হিন্দুদের সংখ্যাও নগণ্য। এইসব বিভাগের মোটা বেতনের চাকরি-গুলি ইংরেজদেরই একচেটে। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস ও বিচার-বিভাগে একটিও হিন্দু বা মুসলমানকে দেখা যায় না এবং সহকারী কমিশনার, গেজেটেড পুলিশ অফিসার, গবর্নমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসা জনশিক্ষা কাস্টমস্ নৌ জরীপ আফিম ইত্যাদি বিভাগের অফিসারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইংরেজ, দু চার দশজন মাত্র হিন্দু। উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার তখনও যে বিশেষভাবে হয়নি তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। তাছাড়া লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ইংরেজদের শাসননীতি ও শিক্ষানীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের শুরুতে পর্যন্ত হয়নি। শিক্ষিত হিন্দুদের প্রতি ইংরেজদের যে বিশেষ কোন সহানুভূতি বা দরদ ছিল না তা মনে হয় না। এমন কি, উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের রাজানুগত্যের প্রতি ইংরেজদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৭১ সাল পর্যন্ত দেখা যায় ২৬০ জনই ইংরেজ সিভিলিয়ান, বিচারবিভাগের ৪৭ জনই ইংরেজ, ১০৯ জন গেজেটেড পুলিস অফিসারের মধ্যে মাত্র ৩ জন হিন্দু। এগুলি তো মোটামুটি শাসনবিভাগ। জনশিক্ষাবিভাগেও দেখা যায়, ৫৩ জন অফিসারের মধ্যে ৩৮ জন ইংরেজ। তারপর হল শোষণবিভাগ এবং এই বিভাগের মধ্যে কাস্টমস্ নৌ জরীপ আফিম ইত্যাদি প্রধান। কাস্টমস্ নৌ জরীপ আফিম ইত্যাদি বিভাগের ৪২২ জন অফিসারের মধ্যে ১০ জন মাত্র হিন্দু এবং বাকি সব ইংরেজ। এদেশের শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান কোনো সম্প্রদায়কেই ইংরেজ শাসকরা দায়িত্বশীল কাজকর্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁদের সমান

মর্যাদাও দিতে চাইতেন না। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি বিচারপ্রসঙ্গে আমাদের এই কথা মনে রাখা দরকার।

শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের এই মনোভাবের যে মূলনীতি তার কোনো পরিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীতে হয়নি, সাময়িক সাম্রাজ্যবাদী কারসাজির পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। শাসন ও শোষণের মূলনীতি কার্যকর করার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল হল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলা। কখন হিন্দু, কখন মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে তাদের শোষণব্যবস্থা কায়েম করেছে। আজ পর্যন্ত আমরা সেই বহু পুরাতন ব্রিটিশ কূটকৌশলের ফাঁদে পা দিয়ে আছি। ১৮২১ সালে একজন ইংরেজ 'এসিয়াটিক জার্নালে' লিখেছিলেন: '*Divide et impera* should be the motto of our Indian administration', 'আমাদের ভারতীয় শাসন-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা।' এই নীতি সমর্থন করে আরএকজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার লিখেছিলেন: 'বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ না করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।'[৪২]

উনবিংশ শতাব্দীতে এই কর্তব্য ইংরেজ শাসকরা পালন করেছেন, বাংলার নতুন হিন্দু জমিদারশ্রেণী ও উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপস করে, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে সরকারী চাকরির মধ্য-নিম্নস্তরের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সন্তুষ্ট করে। তাই শিক্ষিত হিন্দুরা সিভিলিয়ান বিচারপতি, গেজেটেড পুলিস অফিসার, গবর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা কাস্টমস্ অফিসার না হলেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ছোট আদালতের জজ, মুনসেফ ইত্যাদি হয়েছেন, হিন্দু উকিল মোক্তার কেরানীর সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু মুসলমানদের অদৃষ্টে জুটেছে দফ্‌তরী বেয়ারা পিওন ড্রাইভার কচুয়ান আর লশ্‌করের কাজই বেশি।[৪৩] ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যেভাবে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমানরা সেভাবে করেননি। ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানসমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও গর্ববোধ থাকা তখন স্বাভাবিক। বাংলার মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই গোঁড়ামি দম্ভ ও রক্ষণশীলতা এবং স্বাভাবিক ইংরেজ-বিদ্বেষের জন্য সে-সময় ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। প্রথম যুগে

ইংরেজদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনও তাঁরা সুনজরে দেখেননি। এই অসহযোগিতা ও গোঁড়ামির জন্যই তাঁরা শিক্ষা ও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের পিছনে পড়ে গেছেন। কিন্তু মুসলমানদের এই অসহযোগিতা ও গোঁড়ামিই শুধু তাদের অনুন্নতির কারণ নয়। মুসলমানদের হাত থেকে এদেশের রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে হয়েছে বলে প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকদেরও মুসলমান-বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের আগ্রহ হিন্দুদের মতন মুসলমানদের ছিল না হয়ত, কিন্তু মুসলমানদের যে কোনো আগ্রহই ছিল না তা বলা যায় না। মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব থাকার জন্য ইংরেজ শাসকরাও হিন্দুদের মতন শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি। মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর, সৈয়দ আমির হোসেন প্রমুখ বাংলার শিক্ষিত মুসলমানসমাজের মুখপাত্রদের আলোচনা থেকে, বিচারপতি ফিয়ার, রেভারেণ্ড লঙ প্রমুখ বিশিষ্ট ইয়োরোপীয়দের সমালোচনা এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'দি বেঙ্গলি' প্রভৃতি হিন্দুসমাজের প্রধান মুখপত্রগুলির মন্তব্যের মধ্যে মুসলমানদের গোঁড়ামির চাইতেও ইংরেজদের এই মুসলমান-বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> বাঙলার মুসলমানরা যদি ইংরেজি-শিক্ষিত হতেন তাহলে ভারতীয় রাজনীতির ধারা বদলে যেত এবং ভারতের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধেও জনমত সজাগ হত।[৪৪]
>
> —মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর, ১৮৬৮

> ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মানলাভে তাঁরা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পশ্চাদ্‌গতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।[৪৫]
>
> —বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার

> ক্রমবর্ধমান মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্য কলিকাতার মুসলমান মহল্লায় একটি কলেজ (বি. এ. ডিগ্রী পর্যন্ত) স্থাপন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজ গবর্নমেণ্ট কলেজ হলেও হিন্দু মহল্লায় স্থাপিত এবং মুসলমান মহল্লা থেকে এত দূরে যে ছাত্রদের যাতায়াতের খরচই প্রায় ২০ টাকা পড়ে যায়।[৪৬]
>
> —সৈয়দ আমির হোসেন, ১৮৮০

ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলমানরা হিন্দুদের পিছনে পড়ে আছেন। জমিদারী সম্পত্তি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, অভিজাত মুসলমান পরিবার-গুলি প্রায় সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং শহরে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে দিন কাটাচ্ছেন। গবর্নমেণ্ট অফিসার এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য।

—পাইওনিয়ার, ১৭ নভেম্বর, ১৮৮০

মুসলমানদের মধ্যে একসময় যে গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই। এখন বাঙলার মুসলমানরা উচ্চশিক্ষার জন্য উদগ্রীব এবং সর্ব-ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুশ্রেণীর সমকক্ষ হতে তাঁরা চান। লর্ড মেয়ো ও সার জর্জ ক্যাম্পবেলের সময় মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি। কলিকাতা হুগলি ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজসাহীর মাদ্রাসাগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আমির হোসেন মুসলমানদের পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আবেদন করেছেন তা বিশেষভাবে বিবেচ্য বলে মনে হয়।

—স্টেট্‌সম্যান, ১৪ আগস্ট, ১৮৮০

গবর্নমেণ্ট সত্যই যদি মুসলমানসমাজের মঙ্গল কামনা করেন এবং বর্তমানের নিম্নতম সামাজিক স্তর থেকে তাদের উদ্ধার করে উন্নত করতে চান, তাহলে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ যাঁদের আছে তাঁদের এখনই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া তাঁদের কর্তব্য। প্রাচ্যশিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক না পেলে মুসলমানদের সামাজিক প্রগতির কোন সম্ভাবনা নেই।

—হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ১৬ আগস্ট, ১৮৮০

হোসেন সাহেবের প্রস্তাব সহৃদয় দেশবাসী সকলেই সমর্থন করবেন। আমরা আশা করি, সার এশ্‌লি ইডেন মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন।

—দি বেঙ্গলি, ২১ আগস্ট, ১৮৮০

জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এবং শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থার দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এদেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন। একসময় যাঁরা এত বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন আজ তাঁদের বংশধররা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন।...বাংলাদেশের কোন গবর্নমেণ্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু মুসলমান দফ্‌তরী আর পিওনে সব অফিস ভরে গেছে।...

সংস্কৃত চর্চার জন্য ইয়োরোপ থেকে বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিত এদেশে আমদানি করা হয়েছে। বেনারসের জন্য গ্রিফিথ্‌স, ব্যালান্টাইন ও হল সাহেবকে আনা হয়েছে, কলিকাতার জন্য উইল্‌সন, কাউয়েল ও মার্শালকেও আমরা এনেছি। সংস্কৃত চর্চায় আমাদের অসীম উৎসাহ দেখা যায়। ইংরেজি শিক্ষার জন্য ইয়োরোপীয় অধ্যাপকদেরও আমরা এদেশে আমদানি করেছি। কিন্তু আরবী ফারসীর জন্য আমরা কিছুই করিনি, যদিও ভাষাবিদ্যা এবং এদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য আমাদের উচিত ছিল আরবী ফারসী চর্চার ব্যবস্থা করা।[৪৭]

—রেভারেণ্ড জে. লঙ, ২১ জানুয়ারি, ১৮৬৯

সমসাময়িককালের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত এবং বিখ্যাত মুখপত্রগুলির মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি উচ্চশিক্ষার আগ্রহ হিন্দুদের মতন না থাকলেও, একেবারেই যে ছিল না একথা মিথ্যা। রেভারেণ্ড লঙের আলোচনা এবং 'স্টেট্‌সম্যানের' মন্তব্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথম যুগে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু-পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু-কিছু মোটা বেতনের সরকারী চাকরিও পেয়েছেন। মুসলমানরা সেরকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি, নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা অহঙ্কার তাঁদের ছিল। ইংরেজরা সেই গোঁড়ামি ও অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিয়েছে। তার প্রধান কারণ আগেই বলেছি, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অধিকার ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জমিদারী-ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার-জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়। বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হল তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্যুবৃত্তি ও কৃষকবিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সময় এল ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ। ধর্মান্দোলনের ঢেউ, কৃষকবিদ্রোহ, মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি ও ইংরেজবিদ্বেষের এই সম্মিলিত প্রকাশকে ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটিশবিরোধী 'জিহাদ' বলে প্রচার করলেন।[৪৮] লর্ড এলেনবুরো পরিষ্কার বললেন: "ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটা জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"[৪৯] এই 'দৃঢ় বিশ্বাস' থেকেই যে ব্রিটিশ শাসকরা প্রথম যুগে যৎসামান্য হিন্দু-

প্রীতি এবং গভীর মুসলমান-বিদ্বেষ দেখিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের সনাতন 'বিভেদ নীতির' এ হল একটা সাময়িক কৌশল মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রধানত ব্রিটিশ কূটকৌশলের জন্য এবং আংশিকভাবে মুসলমানসমাজের আত্মাভিমান অসহযোগিতা ও গোঁড়ামির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী আজও তাই হিন্দুপ্রধান। তাই হিন্দুপ্রধান বাঙালী বুর্জোয়া-শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীই বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন এবং জাতীয়-আন্দোলনের অগ্রদূত, এবং তা প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত।

> অতএব যেহেতু লোকেরদিগের যখন, এ-প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক।
>
> —বঙ্গদূত, ১৩ জুন, ১৮২৯

ব্রাহ্মসমাজ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ভিতর দিয়ে ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল এবং বোঝা গেল, 'বঙ্গদূতের' ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হবে একদিন। ব্রিটিশ শাসকদের নীতিরও পরিবর্তন হল। বাংলার হিন্দুপ্রধান শিক্ষিত ধনিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষভাবে সজাগ হলেন। ১৯০৫ সালের 'বঙ্গবিভাগের' সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁদের হিন্দুবিদ্বেষ ও মুসলমানপ্রীতি প্রকাশ পেল। সাময়িক কৌশলের পরিবর্তন হল। 'স্টেট্‌সম্যান' পরিষ্কার লিখলেন: "পূর্ব-বাংলায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য না করলে, জাগ্রত ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজের ক্রমবর্ধমান প্রভাবপ্রতিপত্তি খর্ব করা সম্ভব নয়।"[৫০] সুতরাং ব্রিটিশ বিভেদনীতির মুসলমান-বিদ্বেষ ও হিন্দুপ্রীতির যুগে সমাজের সর্বক্ষেত্র যে হিন্দুদের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

বাংলার নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দুপ্রাধান্য এবং জাতীয় নবজাগৃতি আন্দোলনে হিন্দুদের নেতৃত্বের দ্বিতীয় কারণ হল: মুসলমানরা রাজ্য হারিয়েছিলেন, হিন্দুরা হারিয়েছিলেন সর্বস্ব। মুসলমানরা সবেমাত্র ক্ষমতাচ্যুত, অর্ধশতাব্দীর বেশি নয়, আর হিন্দুরা ক্ষমতাচ্যুত কয়েক-শত বৎসর। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান শাসকশ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীভাব থাকা তাই ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে অস্বাভাবিক নয়।

ইংরেজদের সহায়তায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সেই কারণেও হিন্দুরা তৎপর হতে পারেন। তাছাড়া হিন্দু-সংস্কৃতির বিরাট ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দীব্যাপী যুগ-সংকটের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পসাহিত্যে হিন্দুর মনীষা ও প্রতিভার যে আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল একদিন, তারই শোচনীয় অবনতির দুর্দিনে মুসলমানরা এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলমানযুগে হিন্দুদের হারানো প্রতিভা ও মনীষা, সেই লুপ্ত শক্তি ও ক্ষুরধার বুদ্ধির পুনর্বিকাশ ও পুনরুজ্জীবন হয়নি। মুসলমানযুগে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল তা হল মানসলোকের ভাবসমন্বয় মাত্র।* এই ভাবসমন্বয় ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে সত্য, কিন্তু তার ফলে কোনো সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। মধ্যে মধ্যে ভাব-জাগৃতির এক-একটা ঢেউ এসেছে মাত্র (যেমন বাংলার শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম ও আদর্শের ঐতিহাসিক আন্দোলন), কিন্তু সেই ঢেউয়ের আঘাতে সমাজের ভিত কেঁপে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ হল, সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্থানিক (Institutional Structure) ভিত্তির কোন পরিবর্তন হয়নি মুসলমানযুগে। মূলের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন মুসলমানযুগে হয়নি বলে মানসলোকের ভাবজাগৃতির ধারা মধ্যে মধ্যে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতন উত্তাল হয়ে উঠে, ঘূর্ণি ও বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করে আবার মিলিয়ে গেছে। জরাগ্রস্ত সমাজ ধীরে ধীরে স্থিতি অবনতির পথে এগিয়ে গেছে। ইংরেজের আমলে অর্থনৈতিক আলোড়নের জন্যই সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন কিছুটা সম্ভব হয়েছে। নতুন যুগের নতুন অর্থনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলেই জাতীয় নবজাগৃতির সূচনা হয়েছে এদেশে। সেইজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোগামী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বাংলার উদীয়মান হিন্দুপ্রধান বুর্জোয়াশ্রেণী। একটা হিন্দুপ্রধান ভাবধারা সেই কারণেই কখন ক্ষীণ কখন প্রবলবেগে, বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অন্তঃ-সলিলার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও সেই জাগৃতিজোয়ারের তরঙ্গশীর্ষ যে গতানুগতিক সংকীর্ণতা দীনতা ও সাম্প্রদায়িকতাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন যুগাদর্শের মধ্যে, নবরূপান্তরিত জাতীয় ভাবধারার মধ্যে খানিকটা পরিব্যাপ্ত হতে চেয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাঙালীর নবজাগৃতি তাই সমগ্র ভারতের নবজাগৃতির প্রেরণা সঞ্চার করেছে, যদিও প্রকৃত নবজাগৃতির উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি।

* পরবর্তী অধ্যায়ে ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (১৯৪৮)

ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয়

হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।
—মুসলমান পল্লীকবি
সব ঘটে একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান
—দাদূ

বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোধা হিন্দুপ্রধান উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী, নবাশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই নবজাগৃতি আন্দোলন সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারাবাহিক আন্দোলন। নতুন যুগের পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাতে বাংলায় তথা সারা ভারতে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির সূচনা হয়। কিন্তু নবজাগৃতির পথপ্রদর্শক যাঁরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই নতুন যুগের হিন্দু ধনিক, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী বলে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ অলিগলিতে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়নি, সংস্কৃতিসমন্বয়ের প্রশস্ত পথেই পরিচালিত হয়েছে। বাংলার সেই সংস্কৃতিসমন্বয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই নবযুগে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছিল। ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারার সঙ্গে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও সেই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাংলার একটা ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা আছে। বাংলার নবজাগৃতির নায়ক যাঁরা তাঁরা নতুন যুগের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে ভারতের তমসাবৃত প্রাচীনযুগের সংস্কৃতি-সম্পদের ভিতর থেকে সমন্বয়ের একটা 'আদর্শ' বা 'মডেল' খুঁজে বার করেছিলেন মাত্র। ইয়োরোপের নবজাগৃতির ইতিহাসেও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ঐশ্বর্যের মধ্যে এই 'মডেল' সন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনযুগ বা মধ্যযুগের ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের প্রচেষ্টা যুগে যুগে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। মানসলোকের

ভাবসমন্বয় বিশাল জনসমুদ্রের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, কারণ ঊর্ধ্বলোকের সেই ভাবসমন্বয়ের তলায় কোনো সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল না। বৌদ্ধযুগ থেকে মুসলমানযুগ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। তাই সংস্কৃতিসমন্বয়ের ফলে উপরতলার ভাষা শিল্পকলা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়েছে, নতুন দর্শনের বিকাশ হয়েছে, নীতি আচারব্যবহার আইনকানুনেরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এ সবই হল 'সুপার-স্ট্রাকচার' বা উপরের তলার সময়োপযোগী পরিবর্তন, নিচের তলার বা বনিয়াদের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়। জনমনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কামনা বেদনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে এই অবাস্তব আধ্যাত্মিক ভাব-সমন্বয়ের মধ্যে। বুদ্ধ রামানন্দ কবীর দাদু চৈতন্য সকলে গণচেতনাকেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি, সমাজের স্তরে স্তরে তার নৈতিকশক্তি সঞ্চারিত হয়নি, চেতনার নতুন আবর্ত বা আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি। সেই ভাব-সমন্বয়ের মর্মান্তিক বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছে, প্রকৃতির মতন অর্থনীতির নির্মম প্রতিশোধের আগুনে সমস্ত সংস্কৃতি-সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জরাগ্রস্ত জীর্ণ সমাজ সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পিশাচবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। 'মহাপাতক' জনগণ সাধকদের আদর্শ উপলব্ধি করেনি, সমাজ ঘুমিয়েছে, তলার মাটির শীতল নিষ্ক্রিয়তায় সাধারণ মানুষও ঘুমিয়েছে।

ঘুমভাঙা ও ভাঙানোর পালা শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতিসমন্বয়ের ফলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পর ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সমন্বয় হল হিন্দু-মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতির। এই হিন্দু-মুসলমানের নতুন ভারতসংস্কৃতিকে আঘাত করল ব্রিটিশযুগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সমন্বয়ের বিশিষ্টতা থাকলেও বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তিনটি ঐতিহাসিক সমন্বয়ই দেখা যায়। প্রায় দশ শতাব্দী ধরে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের যে-ধারা চলে আসছিল তার সঙ্গে এসে মিশল নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা। এদেশে ইসলামধর্ম ও সভ্যতা বাস্তবিকই "মুজর্মুঅ অল্-বহ্‌রৈন" অর্থাৎ "দুইটি সাগরের সম্মিলনে" পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা এসে তার সঙ্গে মিলিত হবার পর হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণি ত্রিবেণিসঙ্গমে পরিণত হল। বাংলার তথা সারা ভারতের নবজাগৃতির জনকতুল্য রামমোহন তাই উপনিষদ, কোরআন শরীফ্ ও বাইবেল হাতে করে এই ত্রিবেণিতে অবতীর্ণ হলেন, হিন্দু পণ্ডিত, জবরদস্ত মৌলবী ও পাদ্রি সাহেব বলে তিনি পরিচিত হলেন।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতিসমন্বয়ের পর বিশুদ্ধ আর্যসংস্কৃতি বা অনার্যসংস্কৃতির সমস্যা কোনোদিন ভারতে বা বাংলায় দেখা দেয়নি, আর্য ও অনার্য দুইজাতি কি-না সে-প্রশ্নও কোনোদিন ওঠেনি। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সার্থক সংস্কৃতি-সমন্বয় সত্ত্বেও দুইজাতির ও দুইসংস্কৃতির সমস্যা ভারতের যুক্তবেণি তোলপাড় করেছে, আজও করছে। বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সমস্যার গুরুত্ব আজ অত্যন্ত বেশি। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে আজ জানা প্রয়োজন ভারতের মুসলমান কারা, বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের, স্বতন্ত্র কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে কি না এবং থাকলেও কতটুক আছে। সংস্কৃতির দিক থেকেও হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ইতিহাস জানা দরকার, বিশেষ করে বাংলায় যে-সমন্বয়কে 'মুজ্‌মু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন্' বলা হয়। ভারতের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেও বাংলার বিশিষ্টতা কোথায় তা না জানলে এই সমস্যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নতুন যুগের সামাজিক নবজাগৃতি ও সাংস্কৃতিক ত্রিবেণিসঙ্গমের এই পশ্চাদ্‌ভূমির গুরুত্ব অস্বীকার করার অর্থ হল বাস্তব ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং কোনো সমাজবিজ্ঞানীর তা করা উচিত নয়।

মানবপন্থী বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয়

কবি রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যে নানাবিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একবার "ভারতের বৈশিষ্ট্যের" কথা ওঠে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন: "আপনার মতে ভারতের বৈশিষ্ট্য কি?" রবীন্দ্রনাথ বলেন: "বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগসৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারাতে' আমি একথা ভাল করেই বলেছি। ভারতের উঁচু নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি। এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু সেটি কখনই ঘটেনি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসঙ্গতির (harmonyর) সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই ভারতের ব্রত। যে-সব সাধক এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ। তাঁদের নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।" ভারতের পরই বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা উঠল। কবি বললেন: "নদীর পলিমাটিতে তৈরী এই

বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজ মাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম···পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবি দাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।···প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে। কিন্তু তাই বলে এদেশের সাধনাকে পুরাকালের পাথরের জগদ্দল চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্ত করে রাখলে তো চলবে না। মন্দিরের প্রাসাদের পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বিস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধর্মভ্রষ্ট।"[১]

ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারার সঙ্গে বাংলার অবিচ্ছিন্নতা ও বিশিষ্টতা এইখানে। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম ঘটেছে এই দেশে, গঙ্গাসাগর বাংলাদেশেই। গঙ্গা এখানে সারা উত্তরভারতের আশিস বহন করে আসছে। বাংলার তলায় সমুদ্র। সারা দক্ষিণভারতের সম্পদ বহন করে আনছে সমুদ্র। উত্তরের আর্য আর দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলন হয়েছে বাংলার মাটিতে। বাংলাদেশে কত বিভিন্ন জাতির মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে অনার্য আর্য ভোট কিরাত প্রভৃতি মঙ্গোলিয়ান জাতি মিলেছে। মণিপুর দিয়ে শানবাসী চীনেরা এসেছে। গারো খাসিয়া কাছাড়ী কোচ সাঁওতাল ভীল কোল প্রভৃতি জাতি উপজাতি এখানে রয়েছে। দ্রাবিড়দের তো এদেশ একটা প্রধান বাসস্থান। সমুদ্রপথে আরবরা এসেছে, পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী ইংরেজরা এসেছে। বহু মানবজাতির মিলনভূমি হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলার মাটি উর্বর পলিমাটি। মিলনের ফলে তাই সোনার ফসল ফলেছে এখানে। বহু বিচিত্র মানবজাতির মিলনতীর্থ বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রের সোনার ফসল হল মানবতাধর্ম। এই মানবতাবোধেই বাংলার বিশিষ্টতা। বাংলাদেশ তাই দেবভূমি নয়, মানবভূমি। বাংলা জানে মানুষকে, দেবতাকেও সে চেনে মানুষের আলোকে, মানুষের মতন আপনার জন করে। মানবপন্থী বাংলার চিরদিনের পুরস্কার তাই শাস্ত্রপন্থী ভারতের শাসানি। তীর্থযাত্রা ছাড়া এদেশে এলে তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বাংলাদেশ মগধাদি প্রদেশের সঙ্গে যখন একান্নপরিবারভুক্ত ছিল তখনই তার কাছাকাছি জৈনবৌদ্ধাদি যাগযজ্ঞবিরোধী মতের প্রবর্তন হয়। বৌদ্ধ জৈন

প্রভৃতি মত এদেশে ও তার আশেপাশে চিরদিনই প্রবল ছিল। বাংলা ও মগধ যাগযজ্ঞ শাস্ত্রশাসন বা ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিল না বলেই বোধ হয় ঐতরেয় আরণ্যকে বাঙালী ও মগধবাসীকে 'পাখি' বলে নিন্দা করা হয়েছে।

মানবতা এবং উর্বর সমতলভূমির বিস্তারের মতন উদারতাই শুধু বাংলার বিশিষ্টতা নয়। ভারতের এক সীমায় বাংলার স্থান। উত্তরভারতের শাস্ত্রের কচ্‌কচানিতে বাংলা যেমন অতিরিক্ত উৎসাহ বোধ করেনি, দক্ষিণভারতের প্রেমভক্তির আবেগবন্যায়ও গা-ভাসিয়ে দেয়নি। উত্তরভারতের সংযম শৃঙ্খলা ও সংহতি এবং দক্ষিণভারতের ভাবাবেগ সমীকৃত করে বাংলা গ্রহণ করেছে। একপ্রান্তে থাকার জন্য তার বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তিরও আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। বেদ-বেদাঙ্গ সাংখ্যদর্শন হেতুশাস্ত্র ও ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদে বাংলার দান সামান্য তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রে বাংলাই ভারতের পথপ্রদর্শক। কিন্তু বাংলার প্রকৃতির মতন, বাংলার নদনদীর নিত্য ভাঙাগড়ার মতন, বাংলার কালবৈশাখী আর বর্ষার মতন ভাঙনের ও ধ্বংসের বিশিষ্টতাও বাংলার আছে। গ্রহণের আবেগ ও আগ্রহ যেমন তার প্রবল, সমীকৃত করার বিচারবুদ্ধি যেমন তার অসাধারণ, তেমনি চূড়ান্ত ভাবাতিশয্যে অথবা অর্থহীন যুক্তিবাদের চোরাগলিতে তাকে বর্জন ও বিকৃত করার প্রবৃত্তিও তার কম নয়। মহাযানী বৌদ্ধ, বজ্রযানী শৈব এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত মানবীয় বৈষ্ণবধর্মের শোচনীয় বিকৃতি ও পরিণতি তার প্রমাণ। সতেজ ও সজীব করে তোলা যেমন বাংলার প্রাণধর্ম, তেমনি পচিয়ে-খসিয়ে-গলিয়ে নিস্তেজ নির্জীব করে ফেলাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আত্মহত্যা ও অপমৃত্যুর ঝোঁক তার যেমন প্রবল, আত্মচেতনা ও পুনরুজ্জীবনের আগ্রহও তেমনি তার উদ্দাম। এই হল বাংলার বিশিষ্টতা—বাংলার মানুষের, বাংলার সমাজের, বাংলার সংস্কৃতির।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি ?

বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয়ের এই বিশিষ্টতার দৃষ্টি দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির 'মুজ্‌মু'অ অল্‌-বহ্‌রৈন'-এর বা যুক্তবেণির বিচার করা উচিত। কিন্তু সংস্কৃতির মিলনের কথা বলার আগে হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত মিলনের কথা বলা প্রয়োজন। এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলমান, অর্থাৎ আরবী পারসীক তুর্কী ইরানী আফগান মুসলমানদের বংশধর যে নেই তা

নয়, আছেন, কিন্তু তাঁদের প্রাধান্য বা কৌলীন্য সর্বত্র বজায় আছে কি-না সন্দেহ। আরব তুরস্ক পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বাণিজ্য করার জন্য এদেশে মুসলমান বণিকরা এসেছিলেন, ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য মুসলমান সাধকরাও এসেছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারে আরব ইরান তুর্কিস্তান খোরাসান ইরাক আজারবৈজান খারেজম রুম প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক মুসলমান ভারতে পালিয়ে আসেন, খোঁড়া তৈমুরের সঙ্গে লুঠতরাজ করতেও আসেন অনেকে। দিল্লীতে সেইসময় তাঁদেরই বাসস্থানের জন্য অনেক স্বতন্ত্র মহল্লা তৈরি করা হয়, যেমন আব্বাছী মহল্লা, খারজমী মহল্লা, দেলেমী মহল্লা, গোরী মহল্লা, চঙ্গেজী মহল্লা, রুমী মহল্লা, সমরকন্দী মহল্লা, কাশগরী মহল্লা ইত্যাদি।[২] নবাব বাদ্‌শাহদের আমলাঅমাত্যদের মধ্যেও অধিকাংশই বিদেশী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানরা আরবী পারসীক ইরানী তুর্কী আফগানদের বংশধর নন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে যেসব আক্রমণকারী বা আশ্রয়প্রার্থী বিদেশী মুসলমান উত্তরভারতে এসেছিলেন, সমুদ্রপথে যেসব বিদেশী মুসলমান বণিক ও সাধকরা মুসলমান অভিযানের বহু পূর্বে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন, হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রক্তের সংমিশ্রণের জন্য তাঁদের পক্ষে কুলমর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের বংশধরদের দেহে হিন্দুর রক্ত মিলেমিশে রয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যাও ভারতে নগণ্য বলা চলে। ভারতের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ অধিকাংশই ভারতের হিন্দু ও নানা জাতি-উপজাতি। অধিকাংশের মধ্যে কোনো বিদেশী মুসলমানের রক্তের সংমিশ্রণ পর্যন্ত হয়নি। তাই দিল্লী আগ্রার মতন মুসলমানযুগের রাজধানী ও প্রধান নগরগুলিতে অথবা তার আশেপাশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ সেখানে জাঠ ও রাজপুতদের মতন শক্তিশালী হিন্দুজাতির প্রবল প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াতে হয়েছিল মুসলমান যোদ্ধাদের। সেখানকার হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে যে কঠোরতা ও দৃঢ়তা তখনও ছিল তাকে উপেক্ষা করে বা পরাজিত করে হিন্দু সাধারণকে ধর্মান্তরিত করাও সম্ভব হয়নি ইসলামের পক্ষে। বাংলায় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অন্তঃসারশূন্য ছিল বলে উত্তরবিহারে মুসলমানপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুরাতন মুসলিম শাসনকেন্দ্র দক্ষিণবিহার পাটনা বা মুঙ্গেরে হয়নি। দক্ষিণভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত আদিম অসভ্য অনুন্নত জাতির লোক। অর্থাৎ সারা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলমানদের বংশধরদের অস্তিত্ব বিশেষ নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে খাঁটিত্ব হারিয়েছেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান, বিশেষ করে

বাংলার ও দক্ষিণভারতের মুসলমানরা, জাতির দিক থেকে বিচার করলে, মূলত হিন্দুজাতি বললেও ভুল হয় না।[৩]

বাংলার মুসলমানদের কুলমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে এ উক্তি প্রযোজ্য। কারণ দুই জাতিতত্ত্ব এবং দুই সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য যাঁরা দাবি করেন তাঁরা এই মুসলমানী কৌলীন্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন। তাছাড়া ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রায় তিনভাগের একভাগ মুসলামানই বাংলা দেশের। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, সারা বাংলার মুসলমানসংখ্যা ২৩,৬৫৮,৩৪৭, তার মধ্যে খাস বাংলায় ১৯,৫৭৭,৪৮১, বিহারে ৩,৫০৪,৪৮৭, উড়িষ্যার ৯২,৪৬৮ এবং ছোটনাগপুরে ২,৫৭,৮০৯। ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা তখন ছিল ৫ কোটি, তার মধ্যে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও ছোট-নাগপুরেই প্রায় অর্ধেক এবং খাস বাংলায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।[৪] সারা ভারতের মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বাংলার মুসলমানেরও সংখ্যা বেড়েছে। তাই বাংলার মুসলমানদের তথাকথিত স্বতন্ত্র কুলমর্যাদা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ তার উপর বাংলার অর্থনীতি রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

'তারিখে ফেরেশ্‌তার' মতে হিঃ ৬০০ বা ইং ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের তৎকালের শাসনকর্তা কুতবুদ্দিন আইবেকের আদেশে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী বাংলা দেশ জয় করেন। এইসময় থেকে শুরু করে ইংরেজদের বাংলায় দেওয়ানী গ্রহণের সময় পর্যন্ত, প্রায় ৫৬২ বছর, এদেশ মুসলমানদের অধীন ছিল। এর মধ্যে দিল্লীতে নানাবংশের উত্থানপতন হয়েছে। বখ্‌তিয়ার যখন বাংলা জয় করেন তখন দিল্লীতে গোরীবংশের আধিপত্য। ১২৮৮ সালে খিল্‌জীবংশ সিংহাসন পান। তোগ্‌লকবংশ পরে তাঁদের সিংহাসনচ্যুত করেন। তারপর সৈয়দবংশ ও মোগলবংশ ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করেন। এইসময়ের মধ্যে ৭৬ জন শাসনকর্তা, স্বাধীন বাদশাহ বা নাজেম ক্রমান্বয়ে বাংলা শাসন করেন। এঁদের মধ্যে ১৬ জন গোরী ও খিল্‌জী সম্রাটদের নিযুক্ত। শের সাহের সময় যাঁরা বাংলা শাসন করেছিলেন তাঁদের নিয়ে ২৬ জন স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন। বাকি ৩৪ জন মোগল বাদ্‌শাহের নিযুক্ত নাজেম। এই ৭৬ জনের মধ্যে রাজা গণেশ, জালালুদ্দিন, আহম্মদ শাহ, রাজা তোড়রমল্ল ও মানসিংহ ছাড়া আর সকলেই আফগান মোগল ইরানী ছিলেন। নবাব নাজেমরা বিদেশী মুসলমান ছিলেন বলে অভিজাতবংশের অনেক মুসলমান আফগানিস্তান তুর্কীস্তান ইরান আরব প্রভৃতি দেশ থেকে, এমনকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও এখানে আসেন। এঁদের অনেককেই

জায়গীর, আল্‌তামগা, মদ্‌দেমাশ (কেবল ধর্মগুরু, সৈয়দ বা উচ্চবংশের মুসলমানদের দেওয়া হত), আয়মা (মোল্লা, মুফ্‌তি ও সৈয়দদের দেওয়া হত), মাশ্‌কান (ঘর বাড়ি তৈরির জন্য দেওয়া হত), খান্‌কা, ফকিরাণ, নজরে দরগাহ, তাজিয়াদারি, মিল্‌ক (সম্মানিত পদস্থ মুসলমানদের দেওয়া হত), খয়রাতি ইত্যাদি নিষ্কর জমি দিয়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতেন নবাবরা।[৫] কিন্তু এসব ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেও বলতে হয়, বাংলার মুসলমানরা বিদেশী মুসলমানদের বংশধর নন। বিদেশী মুসলমানরা বাংলা দেশে এসে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি করেননি। বিভার্লি সাহেব ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে লিখেছেন: 'মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন এদেশের হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিশ্রদ্ধার বিশেষ কোনো আধিক্য ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত। নিম্নবর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হয়েছিল বলা চলে। এইসময় মুসলমানরা কোরআন আর তরবারি নিয়ে বাংলায় অভিযান করেন এবং বেশ বোঝা যায়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে তাঁদের বিশেষ নির্যাতন পর্যন্ত করতে হয়নি। বিহারে মুসলমানধর্মের প্রসার বন্ধ হয়েছিল হিন্দুধর্মের প্রতিরোধের জোরে, কিন্তু বাংলায় সে-প্রতিরোধের শক্তি ছিল না। একথা প্রমাণের জন্য বেশি যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের চেহারার সাদৃশ্য দেখলেই তা বোঝা যায়। শুধু গঠনসাদৃশ্য নয়, আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্যের মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন চণ্ডাল, রাজবংশী ও বাঙালী মুসলমান পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখলে তাদের পার্থক্য বোঝা রীতিমত কঠিন হয়ে ওঠে।'[৬] হাণ্টার সাহেব (১৮৭০-৭১ সাল) ঢাকার মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেন, অধিকাংশ মুসলমানই শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত, সৈয়দ পাঠান ও মোগলদের বংশধর নেই বললেই হয়।[৭] মুর্শিদাবাদের বিদেশী বনেদী মুসলমানের বংশধররা অনেকেই ইংরেজ অধিকারের পরে বাংলা দেশ ছেড়ে দিল্লীতে, কেউ কেউ পারস্যেও চলে যান।[৮] ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ে ৫৭% আর হিন্দুদের ২৪% এবং তার প্রধান কারণ হল মুসলমানদের সামাজিক বিধিনিষেধের শিথিলতা ও প্রজননশক্তির সদ্ব্যবহার (যেমন বিধবাদের পুনর্বিবাহ ইত্যাদি)।[৯] ১৯০১ সালে নোয়াখালির ৮৬৬,২৯০ মুসলমানের মধ্যে ৮৬০৫৮০ জন 'শেখ' বলে পরিচয় দেন, আর বাকি সংখ্যার মধ্যে ১০০০ জন পাঠান এবং ১৩০০ জন সৈয়দ বলেন। সৈয়দ ও পাঠান

বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদের চেহারায় বিদেশী ছাপ কিছু আছে অবশ্য, কিন্তু অধিকাংশ শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমান নোয়াখালি জেলার অনুন্নত হিন্দুজাতি থেকে ধর্মান্তরিত, এমন কি কায়স্থদের মধ্যেও মুসলমানধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এরকম অনেককে দেখা যায়। নোয়াখালি জেলার মুসলমানদের মধ্যে আজও চন্দ পাল দত্ত ইত্যাদি উপাধির চলন আছে।[১০] মল্লিক পাঠান ও সৈয়দবংশের মুসলমান হাওড়া জেলায় বেশি নেই, অধিকাংশ মুসলমানই শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শেখরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকেই ধর্মান্তরিত এবং এত গরিব যে অভিজাত আশ্‌রাফদের সমপর্যায়ে ওঠার সাধ্য নেই তাদের।[১১] হুগলি একসময় মুসলমান বাদ্‌শাহদের শাসনকেন্দ্র ছিল এবং অনেক বিদেশী মুসলমান তাঁদের সঙ্গে এই জেলায় এসেছিলেন। হুগলি পাণ্ডুয়া বলাগড় ধনেখালি চণ্ডীতলা প্রভৃতি থানার মধ্যে আজও এইসব মুসলমান আয়মাদার-দের বংশধর দু'চার ঘর আছেন। কিন্তু হুগলি জেলায় অধিকাংশ মুসলমানই শেখ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরাই শতকরা ৮৮ জন। এই শেখরা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন সমাজের (মুসলমান) কাছে মর্যাদালাভের আশায়।[১২]

এইভাবে বাংলার প্রত্যেক জেলার মুসলমানদের পরিচয় নিলে দেখা যাবে, নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ব কোনোকিছুর বিচারে তাঁদের আরবী ইরানী তুর্কী আফগানদের বংশধর বলা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত অস্পৃশ্য ও অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরই বংশধর। বাংলার মুসলমানরা মনেপ্রাণে তো নিশ্চয়ই, রক্তসম্পর্কেও খাঁটি বাঙালী। বাঙালী হিন্দুদের যেমন বিশুদ্ধ আর্যদের বংশধর মনে ভাবা ভুল, তেমনি বাঙালী মুসলমানদেরও বিশুদ্ধ আরবী তুর্কী ইরানীদের বংশধর মনে ভাবা ভুল। বহু প্রাগার্য জাতি-উপজাতির সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে যেমন ভারতের হিন্দুদের মতন বাঙালী হিন্দুদেরও উৎপত্তি, তেমনি নানাবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বিদেশী মুসলমানদের মিশ্রণের ফলে ভারতের ও বাংলার 'আশ্‌রাফ' বা অভিজাত মুসলমানদের উৎপত্তি। কিন্তু অভিজাত মুসলমানদের সংখ্যা এত অল্প যে বাংলার বা ভারতের মুসলমানদের মিশ্রিত জাতি বলাও ঠিক নয়। 'আত্‌রাফ' বা অনভিজাত মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরই বংশধর। একথা আজ নৃতত্ত্ববিদ্ জাতিতত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সকলেই স্বীকার করেন।

সৈয়দ কাজি মুফ্‌তি খোন্‌কার মির চৌধুরী তালুকদার ইত্যাদি উপাধি-ধারী মুসলমান যাঁরা আছেন তাঁদের বনেদী বিদেশী মুসলমানদের বংশধর

মনে করার কোনো কারণ নেই। এইসব উপাধির মধ্যে তাঁদের কুলমর্যাদা যত নেই তার চাইতে অনেক বেশি আছে তাঁদের বংশগত পেশার পরিচয়। কুলমর্যাদা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণের ফলে বহুদিন নষ্ট হয়ে গেছে, পেশাগত পরিচয়টুকু আজও রয়েছে। নবাব-বাদ্‌শাহদের রাজত্বকালে যাঁরা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা 'মির', যাঁরা দিগ্বিজয় করতে বেরুতেন তাঁরা 'পাশা' ও 'বে', যাঁরা বিচারক তাঁরা 'কাজি', যাঁরা লোককে ইসলামধর্মে দীক্ষা দিতেন তাঁরা 'খোন্‌কার', যাঁরা শাস্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত থেকে ফত্‌ওয়া দিতেন তাঁরা 'মুফ্‌তী', আর 'চৌধুরী' 'তালুকদারেরা' হলেন বাদ্‌শাহদের নিযুক্ত রাজস্বআদায়কারী। উপাধিগুলি বৃত্তিপরিচয়, বংশপরিচয় নয়। বংশগৌরব একদিন যেটুকু ছিল আজ তাও নেই, আজ সেই পুরাতন যুগের বৃত্তিগৌরবটুকুই সম্বল আছে মাত্র। যাঁরা 'আত্‌রাফ' বা অনভিজাত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুসলমান তাঁদের মধ্যে সর্দার শেখ মণ্ডল খাঁ পাড় ধাবক দফাদার মালী শিকদার বিশ্বাস প্রভৃতি যেসব পদবি দেখা যায় তাও আসলে বৃত্তিপরিচায়ক, এখন অবশ্য বংশের পরিচয়ও দিচ্ছে। মুটেমজুর লোকজন খাটিয়ে যারা খেত তারা 'সর্দার', ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকত যারা তারা 'শেখ', ডাক বহন করত যারা তারা 'ধাবক', নদনদীর কূলে বাস করে চাষ করত যারা তারা 'পাড়', যারা ভূস্বামীদের অধীন জোতজমা রাখত তারা 'জোত্‌দার', যারা বাগান রক্ষা করত তারা 'মালী', 'বিশ্বাস'দের কোথাও 'মোমিন' কোথাও 'জোলা' বলত, কাপড় বোনাই ছিল তাদের পেশা, মৎসজীবীদের বলত 'নিকারী' বা 'মহালদার', বাদ্য-বাদকদের বলত 'বাজাদার', পাল্কি বইত যারা তাদের বলত 'কাহার', কাপড় ধুত যারা তারা 'ধুবী', যারা খেউরি করত তারা 'হাজম' ইত্যাদি। এসব পদবি শুধু মুসলমানদেরই একচেটে নয়, হিন্দুদেরও আছে। বাংলা দেশের গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান মেয়েরা আজও বোর্‌কা পরেন না। তাছাড়া, গ্রামের মুসলমানদের নাম দেখে বোঝা যায়, আরব পারস্য তুরস্ক থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের এদেশে আমদানি হয়নি। যেমন ধোনা মোনা সোনা ফটিক ঝড়ু মাদার সদো মধো শশী গগন হারান পরাণ পচু প্রভৃতি নাম হিন্দুর কি মুসলমানের বোঝার উপায় নেই।[১৩] এর পর বাংলার মুসলমানদের ইসলামধর্মের ভিত্তিতে জাতিস্বাতন্ত্র্যের দাবি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত মনে হয় কি? হিন্দু-মুসলমানের আদবকায়দা আচারব্যবহার থেকেও বোঝা যায়, এদেশের সাধারণ প্রাকৃত লোকেরাই মুসলমানধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। তাদের মধ্যে বহু পুরাতন সব সংস্কার আজ পর্যন্ত রয়ে

গেছে। হুসেনী ব্রাহ্মণ, মালকানা রাজপুত, গুজরাতের পীরাণাপন্থী বা কাকাপন্থী, মধ্যপ্রদেশের পীরজাদা, বাংলাদেশের নট পটুয়া প্রভৃতি দল ঠিক হিন্দু কি মুসলমান সহজে বলা যায় না।[১৪] দক্ষিণভারতের মুসলমানদের আচারব্যবহার রীতিনীতির সঙ্গে আরব পারস্যের মুসলমানী আচারের কোনো সাদৃশ্য নেই। দক্ষিণভারতের মুসলমানদের উৎসব বিবাহাচার মৃতাচার ইত্যাদির মধ্যে সেখানকার আদিম অনুন্নত জাতি-উপজাতির আচার সংস্কার আজও মিলেমিশে রয়েছে। উত্তরভারতেও দেখা যায়, রাজপুত জাঠ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যারা ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছে তাদের বিবাহ উৎসবাদির অনুষ্ঠান, উত্তরাধিকারের আইনকানুন আজও হিন্দুদের মতনই রয়েছে, তার উপর ইসলামের বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি।[১৫] এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও বেলুচিস্তানে, যেখানে হিন্দুদের প্রভাব একেবারেই নেই বললেই হয়, সেখানেও ইসলামের পক্ষে আদিম সংস্কার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি।[১৬] বিহারের হিন্দু কুর্মী চাষীরা মুসলমানদের মহরম উৎসবে যোগ দেয়, রমজানের উপবাস করে।[১৭] বাংলার মুসলমানরা গ্রামে হিন্দুদের দুর্গোৎসবে যোগ দেয়, হিন্দুরাও মুসলমানদের ঈদ মহরমে আনন্দ করে। ওলাওঠা বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধির মড়কের সময় হিন্দুদের মতন বাংলার মুসলমানরাও শীতলা ও রক্ষাকালী পূজা করে।[১৮] বাংলার 'সত্যপীর' হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রদেবতা। 'সত্যপীরের' মতন 'মাণিকপীর' ও 'কালুগাজি'ও হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্রদেবতা।[১৯]এক মাদ্রাজ অঞ্চল ছাড়া, ভারতের সর্বত্র সত্যনারায়ণের পূজা ও কথা হয়। সত্যনারায়ণ ব্রতের বিবরণ স্কন্দপুরাণে আছে। নারদঋষি মর্তলোকের দুঃখকষ্ট দেখে বিষ্ণুলোকে গিয়ে নারায়ণকে দুঃখ নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে নারায়ণ বললেন, সত্যনারায়ণের পূজা ও ব্রত ভিন্ন দুঃখ মোচনের কোনো উপায় নেই। তারপর তিনি নারদকে কয়েকটি আখ্যায়িকা শোনালেন। যেখানে সত্যনারায়ণের কথা হয় সেখানেই স্কন্দপুরাণের এই কয়টি অধ্যায় পড়ে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে সত্যনারায়ণের পুঁথি অনেকে লিখেছেন, পুরাণের মূল বর্ণনাও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পুরাণে দরিদ্র দুঃখী ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দেন, আর বাঙলার সত্যপীরের পুঁথিতে ভগবান মুসলমান ফকিরের বেশে ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগোচর হন।[২০] পুরাণের হিন্দুদেবতা সত্যনারায়ণ বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রদেবতা সত্যপীর হয়ে এলেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন :

অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ
... ...
রাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ
... ...
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম

ধর্মসমন্বয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। জাতিগত মিলন, আচারব্যবহার রীতিনীতি সংস্কার উৎসব অনুষ্ঠানের মেলামেশার ভিতর দিয়ে বাঙলার গ্রামে গ্রামে মুসলমান পীর ও ফকিররা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসমন্বয়ের জন্য মিশ্রদেবতার কল্পনা করলেন, কল্পনাকে কাব্যে রূপ দিলেন, সত্যপীর মানিকপীর কালু-গাজির সৃষ্টি হল।* ধর্মসমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতিসমন্বয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণি সমন্বয়ের সাগরে মিলিত হল।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণির মিলন

আগে বলেছি, আর্য-অনার্য সংস্কৃতিসমন্বয়ের পর, অর্থাৎ হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পর, হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত এবং হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয় হল ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগান্তকারী ঘটনা। শক হূন যবচী প্রভৃতি জাতির সংঘাতে ভারত-সংস্কৃতির মহাসাগর উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। উৎকট 'কেড্‌ফাইসের পরমমাহেশ্বরপ্রাপ্তির' মতন সব সভ্যতার উদ্ভটত্ব ও বিশেষত্ব ভারত মহাসাগরের বুকে মিলিয়ে গেছে। বহু জাতি-উপজাতির বিচিত্র ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে হিন্দুসভ্যতার চরম বিকাশ হয় গুপ্তযুগে, সুসংহত ব্রাহ্মণ্যবাদ 'ত্রিমূর্তি' ও 'মহাভারতের' মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।[২১] তারপরই শুরু হয় ক্রমাবনতির যুগ, ভাঙন ও বিরোধের যুগ। ব্রাহ্মণ্যবাদের হিমালয়শৃঙ্গ থেকে হিন্দুসভ্যতার ধারা প্রচণ্ড বেগে নেমে এসে প্রাণের বার্তা নিয়ে চারিদিকে আর ছুটে গেল না, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কুসংস্কার বর্ণবিদ্বেষ অনাচার আর ব্যভিচারের খানাডোবা জলাজঙ্গলে তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল, জাতি ও সভ্যতার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। এই সময় ইসলাম তার নবীন উদ্যম, নবীন আদর্শ ও বিজয়ী ধর্মের প্রেরণা নিয়ে এদেশে এল।

* গ্রন্থকারের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭ এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৭-৭৯) গ্রন্থে লোকায়ত স্তরে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের গ্রামভিত্তিক বিবরণ অনেক দেওয়া হয়েছে। (১৯৭৮)

সপ্তম শতাব্দীর শেষদিক থেকেই আরবরা মালাবার উপকূলে বাণিজ্যের জন্য আনাগোনা শুরু করে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এইসময় থেকে আরবী পারসী বণিকেরা বসবাসও আরম্ভ করেন। শুধু বাণিজ্য করেই তাঁরা স্বদেশে ফিরে যেতেন না। এদেশের মেয়েদের বিবাহ করে এখানেই তাঁরা ঘরসংসার স্থাপন করতেন।[২২] এদেশের রাজারাজড়ারা তাঁদের বাধা দিতেন না, ভূমিদান করে, মসজিদ তৈরি করে দিয়ে তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য উৎসাহ দিতেন। মুসলমান বণিকদের সঙ্গে আসতেন মুসলমান সাধকরা ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধগ্রন্থে[২৩] দেখা যায়, দেবী অনুপমা চুরাশিটি মস্‌জিদ মুসলমান ভক্তদের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, মুসলমান বণিক ও সাধকদের জন্য হিন্দু রাজাদের ভূমিদানের কথা যে সত্য তার প্রমাণ প্রাচীন সব শিলালেখে পাওয়া গেছে। নবম শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান বণিক ও সাধকরা সারা পশ্চিম উপকূলে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়ে। হিন্দুসমাজের উপর তাঁরা তখন থেকেই প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে উত্তর-পশ্চিমের পথে ভারতে অভিযান করার অনেক আগে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতের খিড়্‌কি দরজা দিয়ে একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল 'ইসলাম'। তখন 'ইসলাম' দিগ্বিজয়ী, প্রচণ্ড তার শক্তি, তার উদ্দামতা, তার আবেগ, তার আত্মবিশ্বাস। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকেই ভারতে ইসলামের যোগাযোগ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। সিরিয়ার লাঞ্ছিত বিতাড়িত খ্রীস্টানদের মতন পলাতক হয়ে মুসলমানরা এদেশে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন বিজয়ীবীরের মতন, বিশ্বমানবকে নবীন 'ইসলাম' উদাত্ত কণ্ঠে জীবনের বাণী শোনাতে পারে এই দৃঢ়বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে। হতাশ উদাসীন কাপুরুষের মতন তাঁরা আসেননি, তাঁরা এসেছিলেন সদ্যোজাত 'ইসলামের' বিশ্বমানবতার কাকলি শোনাতে, নবীন আদর্শে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে দক্ষিণভারত তখন বিক্ষুব্ধ। নব্য হিন্দুধর্ম তখন বিলীয়মান জৈনধর্মের ধ্বংসাবশেষ ও আবর্জনাস্তূপ থেকে মানুষ ও সমাজকে মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্‌যোগী। এইসময় ইসলামী আদর্শের ঢেউ এসে লাগল সমাজের বুকে, মানুষের মনে। বিক্ষুব্ধ সমাজ, বিভ্রান্ত মানুষ তখন নতুন জীবনমন্ত্র উচ্চারণের জন্য উদ্‌গ্রীব, নতুন প্রাণবন্ত ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য তারা চারিদিকে সকাতরে চেয়ে আছে। ইসলামের বাণী 'কানান্না সো উম্মাতান্ ওয়াহেদাতান্' (কোরআন), 'সমগ্র

মানবমণ্ডলী একজাতি'. মুসলমান সাধকদের কণ্ঠ থেকে তাদের কানে পৌঁছল। কানে কেন, মর্মে পর্যন্ত গিয়ে বিঁধল সেই বাণী, সমগ্র অন্তরাত্মাকে নাড়া দিল। নাড়া তো দেবেই। বুদ্ধের বাণী কি একদিন সারা ভারত তথা সারা এসিয়ার মনকে নাড়া দেয়নি? শুধু ভারত নয়, এসিয়া একদিন সাড়া দিয়েছিল বুদ্ধের বাণী শুনে। জেরুজালেমের যিশুর বাণী কি একদিন সারা ইয়োরোপের, বিশ্বমানবের অন্তরে ধ্বনিত হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছিল। বুদ্ধ ও যিশুর শিষ্যরা যখন ধর্মভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট দিগ্‌ভ্রষ্ট, তখন মহম্মদ এলেন 'ইসলামের' বাণী নিয়ে। বুদ্ধ আর যিশুর মর্মবাণী আত্মসাৎ করে মহম্মদ 'ইসলামের' বাণী নতুন করে শোনালেন মানুষকে। তাই বিশ্বমানব আবার নতুন করে ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল। নীতিভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট ভারতের নিস্তেজ মানুষও যে সাড়া দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? দক্ষিণভারত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ইসলামের বাণী, ইসলামের আদর্শ সমুদ্রপথে প্রথমে পৌঁছল দক্ষিণভারতে। তাই বোধ হয়, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়। হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসৌধ যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী হানাহানির এক প্রায়ান্ধকার যুগে উত্তরভারতের সমন্বয়ের সাধনা, তার পুরাতন ঐতিহ্য গৌরব সব ডুবে গেল। দেখা গেল, দক্ষিণভারত নতুন যুগের ভারতসংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের বিশিষ্টতার ইতিহাসে এটা একটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এতদিন পর্যন্ত ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের পুরোভাগে ছিল উত্তরভারত, আর্যাবর্ত, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর থেকেই ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণভারত, দাক্ষিণাত্য। শংকরাচার্য রামানুজ বল্লভাচার্য নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ-ভারতের। একেশ্বরবাদ ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে। নবীন ইসলামধর্মের সঙ্গে নব্যহিন্দুধর্মের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ইতিহাসে দক্ষিণভারত তখন পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।[২৪]

শাংকরদর্শনে ইসলামের প্রভাব কতখানি আছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শংকরাচার্য যখন জন্মেছিলেন তখন দক্ষিণভারতে নব্যহিন্দুধর্ম আর ইসলামধর্মের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাত চলছিল। আরব পারস্য থেকে মুসলমান বণিকদের জাহাজ সমুদ্রপথে তখন দক্ষিণভারতের উপকূলে বন্দরে নিয়মিত-ভাবে ভিড়ছে এবং মুসলমান সাধকরাও তখন নতুন উদ্যমে ইসলামের বাণী

প্রচার করতে শুরু করেছেন। দক্ষিণভারতের দু'একজন রাজা পর্যন্ত যে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম তখন হিন্দু-সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের শংকরাচার্য এইসময় জন্মালেন এবং দেখলেন, জীর্ণ জরাগ্রস্ত হিন্দুধর্ম ও মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজকে যদি রক্ষা করতে হয়, যদি তার অসাড় নিস্পন্দ বুকে আবার প্রাণের স্পন্দন জাগাতে হয়, তাহলে দেবতাবহুল সম্প্রদায়বহুল জাতি-উপজাতিবহুল এই দেশকে একধর্ম একদেবতাপাশে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে, মানবদেবতার মিথ্যা পূজা বন্ধ করতে হবে। শংকর কোনো সংস্কার, কোনো শাস্ত্রের সঙ্গে আপস করেননি। ইসলামের একদেবতা একধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শংকর আপসহীন 'অদ্বৈতবাদ' প্রচার করেছেন।[২৫] ইসলামের সাধক ঘোষণা করলেন: 'লা হু মা ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়া মা ফিল্ আরদে', 'আকাশ পৃথিবী যা কিছু সবই আল্লার'—'অমা-হা-জেহিল্ হায়্যাতোদ্ দুনয়্যা—ইল্লা লাহ্ বোঙ অ লায়েব', 'এই পার্থিব জীবন অর্থহীন ক্রীড়াকৌতুক ভিন্ন আর কিছু নয়'।[২৬] শংকরাচার্য বললেন, এক ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই। জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই সত্য নয়, সব মিথ্যা।[২৭] বেদ উপনিষদাদি থেকে শংকরাচার্য এই সত্যই প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। শাস্ত্রপন্থী বিধি-নিষেধ-আচারসর্বস্ব দেবতাবহুল পৌরোহিত্য-প্রধান যাগযজ্ঞভারাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন বিদ্রোহ। ঠিক বুদ্ধের বিদ্রোহও নয়, কারণ বুদ্ধকে তাঁর শিষ্যরাই একমাত্র উপাস্য দেবতা বানিয়েছিলেন। শংকরাচার্যের আপসহীন 'অদ্বৈতবাদ' মনেহয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস-সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং সেই 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

শংকরাচার্যের পরে রামানুজ বিষ্ণুস্বামী মাধবাচার্য ও নিম্বার্কের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায়। রামানুজদর্শনে দেবতা ও মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের জন্য দেবতা ও ধর্মের বাণীও শোনা যায়।[২৮] দেবতা আর মানুষের সম্পর্ক নিয়ে বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কের আধ্যাত্মিক আলোচনা পড়লে নাজ্‌জাম আশ্‌আরী গিজালী প্রমুখ মুসলমান সাধকদের বিতর্কের কথা মনে পড়ে।[২৯] ইসলামধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শংকরাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ' থেকে রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদের' প্রগতির ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। শংকরের

মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', রামানুজ ও নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম তো সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু জীব ও জগৎ ব্রহ্মের মতনই সমান সত্য। বৈষ্ণব বৈদান্তিক রামানুজ ও নিম্বার্কের সঙ্গে শংকরের মূলগত প্রভেদ আছে, কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কের মধ্যে ব্রহ্ম জীব জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বিশেষ প্রভেদ নেই। রামানুজের মতে বিষ্ণু, নিম্বার্কের মতে কৃষ্ণই ব্রহ্ম। এঁদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক নিয়ে শংকর বলেন ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন, রামানুজ বলেন স্বরূপত অভিন্ন হলেও ধর্মত ভিন্ন, নিম্বার্ক বলেন স্বরূপত ও ধর্মত উভয়তই ভিন্ন ভিন্ন।[৩০] শংকর থেকে নিম্বার্ক পর্যন্ত প্রগতির ধারা হল শুদ্ধ 'জ্ঞানবাদ' থেকে 'ভক্তিবাদের' ক্রমপরিণতির ধারা। শংকরের জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নৈরাশ্যবাদ বা নিষ্ক্রিয়তাবাদের নামান্তর নয়। শংকরের মতে ব্যবহারিক স্তর অপারমার্থিক হলেও অপ্রয়োজনীয় নয়। ব্যবহারিক স্তর কর্ম ও ভক্তির ভিতর দিয়েই জীব সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে। শংকরের শুদ্ধ জ্ঞানবাদ ও কঠোর কেবলাদ্বৈতবাদকে একেশ্বরবাদী ইসলামের সঙ্গে ভারতের হিন্দুধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মম সমন্বয় বললে বোধহয় খুব ভুল হয় না। হিন্দুধর্মের হিন্দুসংস্কৃতির অতীতের সমন্বয়-গৌরবের উত্তরাধিকার শংকর বহন করছেন। দক্ষিণভারতে তখন নব্যহিন্দুধর্ম জৈনবৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সুতরাং শংকরের 'কেবলাদ্বৈতবাদ' হল ইসলামের সাধকদের প্রথম আদর্শ-অভিযানের বিরুদ্ধে বেদ-উপনিষদের মূল থেকে গেঁথে তোলা ইস্পাতের তৈরি প্রতিরোধ-প্রাচীর। তাই শংকর নির্মম নিষ্ঠুর নীরস বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী, তাই তাঁর দুর্ভেদ্য 'কেবলাদ্বৈতবাদ'। কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কের সময় ইসলামের সাধকরা খিড়কি দরজা দিয়ে শুধু যে হিন্দুসমাজের ভিতরের উঠোনে পা দিয়েছেন তা নয়, একেবারে অন্দরমহলে পর্যন্ত প্রবেশ করে সেখানে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছেন। তাই কঠোর 'কৈবলাদ্বৈতবাদ' থেকে ধীরে ধীরে কঠোর-মধুর 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হল। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের সঙ্গে ভক্তিবাদ মিশিয়ে নীরসকে একটু সরস করতে হল। জনমনকে স্পর্শ করার প্রয়োজন। যাঁরা অনুভব করলেন, স্পর্শ না করে যাঁদের উপায় ছিল না, তাঁরা ক্রমে ভক্তি ও প্রেমের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'একমাত্র ব্রহ্মই সত্য'—দৃপ্তকণ্ঠে শংকরের মতন এই বাণী ঘোষণা করে ধর্মভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট কুসংস্কারগ্রস্ত শাস্ত্রসর্বস্ব ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের। সে-কর্তব্য শংকরই অনেকটা পালন করে গেছেন। তাঁদের কর্তব্য হল সুপ্ত গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভ্রান্ত জনমনকে সচেতন

করা, নিস্পন্দ সমাজের বুকে স্পন্দন জাগিয়ে তোলা। তাই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলে শুধু তিরস্কার করলেই চলবে না, বলতে হবে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের মতনই সমান সত্য। বলতে হবে, জ্ঞান ও দর্শনবিচার নয় কেবল, ভক্তি ও প্রেম হল সাধনার পথ। তবেই জনমন সহজে সাড়া দেবে। সুপ্ত গণচেতনা জেগে উঠবে। ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শংকরের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতির স্তরে নেমে এলেন। দু'জনেই ভক্তির পথের পথিক, কিন্তু রামানুজের ভক্তি শ্রদ্ধাপ্রধান, সেখানে উপাস্য-উপাসকের মধ্যে গুরুশিষ্য রাজাপ্রজার সম্পর্ক থাকে, আর নিম্বার্কের ভক্তি মাধুর্যপ্রধান প্রেমপ্রধান, সেখানে উপাস্য-উপাসকের মিলনের পথ স্বামী-স্ত্রীর পথ, প্রেমিক-প্রেমিকার পথ, সখা-সখির পথ। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যেন দর্শনজ্ঞানের শিখর থেকে নেমে শ্রদ্ধাভক্তির গিরিগহ্বর ভেদ করে প্রেম-প্রীতি-ভাবাবেগের প্রচণ্ড ঝরণাধারা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিসমন্বয়ের মহাসমুদ্রে মিলিত হতে চলেছে।*

এতদিন যা মুসলমান সাধকদের ধর্মপ্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে বিজয়ী রাজশক্তির ছায়াতলে তা আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। পাঞ্জাব থেকে আসাম, কাশ্মীর থেকে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনাবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল। মনে হল যেন হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহিতদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে তো যাবেই, হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসংস্কৃতির বনিয়াদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ কাঁচা নয়, বহু শতাব্দী ধরে বহু জাতি-উপজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে তার বনিয়াদ তৈরি হয়েছে। আরবী

* তারাচাঁদ বলেন নবম শতাব্দীর পর থেকে দক্ষিণভারতের ভাবধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমন একেশ্বরবাদ, 'প্রপত্তি' বা দেবতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, গুরুভক্তি জাতিসাম্য এবং পূজাচারবিরোধিতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ইসলামের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিণভারতের 'লিঙ্গায়েত' সম্প্রদায় সম্বন্ধে তারাচাঁদ বলেছেন, ইসলামের প্রচণ্ড প্রভাব ভিন্ন 'লিঙ্গায়েত' বা বীরশৈবদের উদ্ভব হতে পারে না। কানাড়ী ও তেলুগুদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ জন (বেলগাঁও বিজাপুর ও ধারওয়াড় জেলার) মহীশূর ও কোলচ্ছব রাজ্যে শতকরা প্রায় ১০ জন এই বীরশৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। 'লিঙ্গায়েত' বা বীরশৈবদের উগ্র ও উদার জীবনদর্শনের মধ্যে ইসলামের প্রভাব এত প্রবল যে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। (Tarachand: *Influence of Islam on Indian Culture*: 110-128) (১৯৪৮)

ঘোড়া ও তলোয়ারের এমন শক্তি নিশ্চয়ই নেই যে সেই বনিয়াদ ও ঐতিহ্য ধ্বংস করে। ধ্বংস যে কিছুই হয়নি তা নয়। অনেক মন্দির, অনেক শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তার চাইতেও বেশি ধ্বংস হয়েছে হিন্দুসভ্যতার আগাছা, হিন্দুসংস্কৃতির আবর্জনা। তাতে হিন্দুসংস্কৃতির বনিয়াদ ধ্বংস হয়নি। তার দ্বিতীয় কারণ হল কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই তার দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে উঠেছিল দক্ষিণভারতে। শংকর রামানুজ নিম্বার্ক প্রমুখ হিন্দু সাধক-দার্শনিকরা মুসলমান সাধকদের বাণী সমীকৃত করে হিন্দুসংস্কৃতির নতুন সমন্বয়ের বনিয়াদ পাকা করে তৈরি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের কাজ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, এখন তার বিস্তার প্রয়োজন, অর্থাৎ আরও ব্যাপক ও গভীর আত্তীকরণ প্রয়োজন।

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের কাজ আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে শুরু হল মুসলিম অভিযানের পর থেকে। মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পরে শুধু যে অত্যাচার আর লুঠতরাজই চলল তা নয়। মুসলমান শাসনকর্তারা এদেশে বসবাস ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। আর্যরাই একদিন এদেশের অসুর-দানব-যক্ষ-রক্ষ-পিশাচের উপর, অর্থাৎ এদেশের প্রাগার্য জনসাধারণের উপর কম অত্যাচার করেছিলেন না-কি? তপঃক্লিষ্ট আর্য মুনিদের আশ্রমে ভারতের গণদেবতা শিব বারবার হানা দিয়েছেন। মুনিপত্নীরা সর্বাঙ্গসুন্দর যুবক শিবকে নগ্নবেশে দেখে সভ্যতার সব সীমা লঙ্ঘন করেছেন। মুনিরা ক্রোধে ও ক্ষোভে 'কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ', অর্থাৎ কাঠ পাথর নিয়ে মার-মার করে তাড়া করেছেন শিবকে। সকলে মিলে শিবের অঙ্গচ্ছেদ করে দিতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাতে কি হবে? শিব যে এদেশের গণদেবতা। নারীবেশধারী বিষ্ণুকে নিয়ে মনোরম বেশে পরম সুন্দর দিগম্বর শিব নিশ্চিন্তে মুনিদের দেবদারু বনে বিচরণ করতে থাকেন। মুনিকুমার ও মুনিপত্নীরা তাই দেখে কামার্ত হয়ে নির্লজ্জ আচরণ করেন। মুনিরা কত শাপ দেন, লাঠিসোটা নিয়ে কতবার তাড়া করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় না।[৩১] মুনিকুমার ও মুনিপত্নীদের দাবিই মেনে নিতে হয়। কারা এই মুনিকুমার ও মুনিপত্নী? মুনিপত্নীরা এদেশের মেয়ে, অনার্য পিশাচ দানব রাক্ষসদেরই মেয়ে। আর্য মুনিরা এদেশে এসে তাদেরই বিবাহ করে ঘরসংসার পেতেছিলেন। মুনিকুমাররা এদেশের মেয়েদেরই গর্ভজাত সন্তান, আর্য-অনার্যের নতুন সমন্বয়ের ফল তারা। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাদের দাবিও মেনে নিতে হল। গণদেবতাকে গ্রহণ করতেই হল। শিবলিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হল। বিঘ্ননাশন গণদেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত হল। হোমাগ্নির পাশে শালগ্রাম শিলা

স্থান পেল। আর্য-অনার্যের সংস্কৃতিসমন্বয়ে হিন্দুসংস্কৃতির বিকাশ হল। ঠিক তেমনি, মুসলমান শাসকরা এদেশে এসে অত্যাচার ও লুঠতরাজ কম করেননি, জনসাধারণের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের আগুনও তাঁদের বিরুদ্ধে বহুবার জ্বলে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের এদেশেই বসবাস করতে হয়েছে, এদেশের আপনার জন হতে হয়েছে। এদেশের হিন্দু মেয়েদের তাঁরা বিবাহ করেছেন, তাঁদের আরবী আফগান পারসী রক্তের সঙ্গে হিন্দুর রক্ত মিশে গেছে। অসংখ্য অনুন্নত নিম্নবর্ণের লোক যারা এদেশে ইসলামধর্মের দীক্ষা নিয়েছে তারাও আরব পারস্যের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আনেনি, এদেশের সংস্কৃতিকেই বহন করে নিয়ে গিয়ে ইসলামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলমান সাধকরাও আগে থেকে এই মেলানো-মেশানোর কাজ শুরু করেছিলেন। সুতরাং সংঘর্ষের পথে নয়, বিভেদবিরোধের পথে নয়, সমন্বয়ের মহাসাগর অভিমুখে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছে।

মহাসাগরের বুকে মিলিত করা পণ্ডিত বা দার্শনিকদের দ্বারা সম্ভব হল না। তাঁরা শুধু দূর থেকে মিলনের পথটি দেখিয়ে দিলেন। নিজেদের শাস্ত্র ও ধর্মের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তাঁরা কেউ উদ্দাম বেগে এগিয়ে যেতে পারলেন না। দুই কূল ভাসিয়ে উদ্দাম জোয়ার এল তখন যখন বাদশাহের বেশে বিজয়ী ইসলাম এসে বসল ভারতের সিংহাসনে। সেতু রচনা করার কাজে এগিয়ে এলেন যাঁরা তাঁরা অধিকাংশই নিরক্ষর দীন দরিদ্র নীচকুল-জাত। দু'একজন ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত যে তাঁদের মধ্যে ছিলেন না তা নয়। রামানন্দ নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভারমুক্ত হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। রামানন্দ বাহ্য আচার ছাড়লেন, সংস্কৃত ছেড়ে চলতি ভাষায় উপদেশ দিলেন। যে-ভক্তিবাদের জন্ম দ্রাবিড়ে রামানন্দ তাকে উত্তরভারতে নিয়ে এলেন।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌ খণ্ড।

রামানন্দের প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে রবিদাস মুচি, কবীর জোলা, সোনা নাপিত, ধন্না জাঠ, পীপা রাজপুত। তা ছাড়া নামদেব দরজী, সদনা কসাই। সুন্দরদাস বৈশ্য, দাদূ ও রজ্জবের জন্ম মুসলমান ধুনুরির বংশে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাস্ত্রের সীমানা ছাড়িয়ে এই মুচি জোলা নাপিত দরজী কসাই ধুনুরিরা এগিয়ে এলেন ভক্তির পথে মহামিলনের উদ্দেশ্যে। কবীর বললেন,

জৌর খুদাই মসীত বসত হৈঁ ঔর মুলিক কিস কেরা।
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁ মৈ কিনহুঁ ন হেরা॥

পূরিব নিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইঁহা রাম রহিমানা॥

'খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কার? তীর্থের মূর্তিতেই যদি রামের বাস হয় তাহলে এই দ্বৈতভাবের মধ্যে সত্য কোথায়? হায়! পুবে হরির বাস আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম! আরে খুঁজে দেখ নিজের হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান।'

হিন্দু মুয়ে রাঁম কহি মুসলমান খুদাই।
কহৈ কবীর সো জীবতা দুহ মৈঁ কদে ন জাই॥

'হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, কিন্তু কবীর বলেন, এসব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই তো বাঁচল।' মিলন কি সহজে হয়? কবীর বলছেন

কিতনো মনাউঁ পাঁব্ পড়ি, কিতনোউঁ রোয়,
হিন্দু পূজৈ দেবতা,তুর্ক ন কাহূ হোয়।

"কত মিনতি করলাম পায়ে ধরে কত মিনতি করলাম কেঁদে, কিন্তু হিন্দু তার দেবদেবীকেই পূজা করে চলল, আর মুসলমানও কারও আপন হল না।' তাই কবীর বারবার মিনতি করে বলছেন

হিন্দু তুর্কহি মিলিকে মানহুঁ বচন হমার।

'হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে আমার কথা শোন।' দক্ষিণভারত থেকে রামানন্দ উত্তরভারতে ভক্তির যে ভাবধারা নিয়ে এলেন, কবীর তাকে ছড়িয়ে দিলেন চারিদিকে। দাদূ রজ্জব সকলে সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললেন। দাদূ বললেন

অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি।

'আল্লা আর রামের ভুল আমার ভেঙেছে, হিন্দু আর মুসলমানে কোন ভেদ নেই।'

হিংদু লাগৈ দেহুরৈ, মুসলমান মসীতি।

'হিন্দু লেগে রইল তার দেবালয়ে, আর মুসলমান লেগে রইল তার মসজিদে'। দাদূ তাই বললেন

না হম হিংদু হৌহিংগে, না হম মুসলমান।

'না হব আমি হিন্দু, না হব মুসলমান।'

কবীর দাদূর এরকম অজস্র বাণী উধৃত করা যায়।[৩২] সব বাণীরই মূল সুর হল জাতিসাম্য, সাম্প্রদায়িক একতা আর অদ্বৈতবাদ। কবীর কোনো জাত-

বিচার মানতেন না। তিনি বলতেন, 'ওহে পাঁড়ে (ব্রাহ্মণ), কি মিথ্যা ছোত্ বিচার করো! ছোঁয়াছুঁয়ি থেকেই তো এ-সংসারের সবকিছুর উৎপত্তি। তোমাতে-আমাতে রক্তে আর দুধে কোনো ভেদ আছে কি? তবে তুমিই বা কিসে ব্রাহ্মণ হল, আর আমিই বা কিসে শূদ্র হলাম? ছুত ছুত করেই যদি জন্মালে তাহলে অশুচি গর্ভবাসের পথে কেনই বা এলে তুমি ব্রাহ্মণ?' দাদূও বললেন, 'হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নেই। সেই একই প্রাণ, একই দেহ, একই রক্তমাংস, একই চোখ নাক, সেই একই কানে শব্দ বাজে, একই জিবে মিষ্টি রস লাগে, সেই একই ক্ষুধায় সবাই ব্যাকুল হয়, একই ভাবে সবাই জাগে...অথচ কি যে তামাশা, তাতেও এত ভেদাভেদ।'

কবীর দাদূ রজ্জবের ধারায় আরও অনেক হিন্দু মুসলমান সাধক ও সূফী এই ধর্মসমন্বয়ের বাণী, জাতিসাম্য ও সাম্প্রদায়িক একতার বাণী প্রচার করেছেন। একদেবতার কাছে আবেগময় আত্মসমর্পণের ভাব তাঁদের ধর্মের মধ্যেও ফুটে উঠেছে। সূফীরা তো সমাজধর্মত্যাগী, তাঁদের পথ প্রেমের পথ। প্রেমসমাধিকেই সূফীরা বলেন 'ফানা'। এই 'ফানার' ভিতর দিয়েই জীবসত্তা ডুবে গিয়ে দেবতার প্রেমসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে যায়। সিন্ধুদেশের সূফী শাহ ইনায়ৎ ও শাহ লতীফ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভ্রাতৃত্বের উপদেশ দিয়ে গেলেন। শাহ লতীফ পীঠস্থান 'ভীটে' আজও সকলে তীর্থযাত্রায় যান। দিল্লীর বাবরী সূফী, তাঁর শিষ্য বীরু হিন্দু, তাঁর শিষ্য য়ারী শাহ সূফী। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। এঁদের ধারাতে কেশবদাস, বুল্লা, গুলাল সাহেব প্রভৃতির পরে জগজীবন 'সৎনামী' সাধনা প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ নেই। মুসলমান গুরুর শিষ্য ব্রাহ্মণ ভীখা, ভীখার শিষ্য গোবিন্দ এবং তাঁর শিষ্য পল্টু সাহেব। পল্টু সাহেব বলেন, 'ভগবান কোন জাতের, কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নন। জাত পংক্তির ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়ো।'

এদেশের মুসলমান সাধক ও সূফীরাই যে শুধু হিন্দু সাধকদের সঙ্গে একসুরে সাম্প্রদায়িক একতা ভ্রাতৃত্ব প্রেম ও একদেবতার বাণী প্রচার করেছেন তা নয়। আগেই বলেছি, প্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকেই মুসলমান সাধকরা আরব ও পারস্য থেকে দক্ষিণভারতে এসে ইসলামধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁদের ধর্মপ্রচারের মধ্যেও সেদিন সমন্বয়ের সুর ফুটে উঠেছিল। শুধু দক্ষিণ-ভারতে নয়, উত্তরভারতেও আরব পারস্য থেকে মুসলমান সাধকরা ধর্ম-প্রচারের জন্য এসেছিলেন। মুসলিম অভিযানের আগেই তাঁরা এসেছিলেন, কেউ কেউ অভিযানে পরোক্ষে সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু সকলেই তো

করেননি। উত্তরভারতে মুসলমান সাধকদের বাদ্‌শা হলেন খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তী। পারস্যের কাছে শিস্‌স্থান বা চিশ্‌স্থান অনেক পুরানো শহর। অনেক মুসলমান সাধক এখানে জন্মেছেন। তাঁরা সকলে চিশ্‌ত দরবেশ নামে পরিচিত। মঈনউদ্দীন জন্মেছিলেন ১১৪২ সালের কাছাকাছি। প্রায় চল্লিশজন শিষ্যসহ তিনি দিল্লীতে আসেন। দিল্লীর যে অশ্বত্থ গাছের তলায় খাজা সাহেব তাঁর শিষ্যদের নিয়ে দ্বিপ্রহরের নামাজ পড়েছিলেন আজও নাকি সেখানে সেই গাছের তলায় কালো পাথরের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন আঁকা আছে। তারপর মঈন উদ্দীন সাহেব আজমীরে যান। সেখানেই তিনি সারাজীবন সাধনা করে দেহত্যাগ করেন। আজও আজমীর শরীফে মঈন উদ্দীনের সমাধিসৌধ দেশবিদেশের সকল মানুষের, হিন্দু-মুসলমানের তীর্থস্থান। খাজা সাহেবের অসংখ্য শিষ্য বা 'মুরিদ' ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শোনা যায় ১২০ জন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন আর ৬৫ জন আল্লার প্রিয় সাধক হন। এই সাধকদের মধ্যে খাজা কুতুবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকী অন্যতম। শাহ্‌ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া চিশ্‌তী ও হজরত শেলিম শাহ চিশ্‌তী তাঁর শিষ্য। শাহ্‌ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া ও কুতুবউদ্দীন বক্তিয়ারের সমাধি দিল্লীতে এবং হজরত শেলিম শাহ্‌ চিশ্‌তীর সমাধি ফতেপুরসিক্রিতে আজও হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের সমাগম হয়।[৩৩] ভারতের আদি সূফী সাধক মখদুম সৈয়দ আলি অল হুজবেরীর সমাধিস্থান লাহোরের ভাটি দরবাজারের কাছে। এঁদের সকলের সাধনার ধারা একরকম এবং এঁরা অনেকেই কবীরের আগেই এই ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। খাজা মঈন উদ্দীন চিশ্‌তীর কোন শিষ্যের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করছি :

খাজা নাম মধুর—পিয়রে মনুয়া দুনিয়াদারী সব ঝুটা,
এহ দুনিয়াদারী সব ঝুটারে মনুয়া—দুনিয়াদারী সব ঝুটা।
খোদা নাম্‌ছে ধনু বনা'য়ে মহাম্মদ নাম্‌ছে বাঁশী,
ফাতেমা নাম্‌ছে অসি বনা'য়ে কাট মায়ার ফাঁসী।
রে মনুয়া! দুনিয়াদারী সব ঝুটা
রে মনুয়া! দুনিয়াদারী সব ঝুটা।
আলী নাম্‌ছে কিস্তী বনা'য়ে, হাছান নাম্‌ছে পাল,
হোছেন নাম্‌ছে হাল বনা'য়ে দরিয়া পার্‌হো চ'ল।
রে মনুয়া! দুনিয়াদারী সব ঝুটা
লোহা কাঁসাকো সোনা বনাদে সাফাকর দেতা হায় জঙ্ক
গরীব নেওয়াজে জান সঁফিয়ে মিটা দেল্‌কো রঞ্জ।

রে মনুয়া ! দুনিয়াদারী সব ঝুটা
রে মনুয়া ! দুনিয়াদারী সব ঝুটা।

উত্তরভারতের মুসলমান সাধকদের ভাবধারা কবীর দাদূকে কম অনুপ্রাণিত করেনি। দ্রাবিড়দেশ থেকে রামানন্দ যে ভক্তি ও প্রেমের ভাবধারা উত্তর-ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কবীর তাকেই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের চিশ্‌তী দরবেশদের ভাবধারাও তাঁর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমানের ভাবসমন্বয়ে তাঁদের দানও কম নয়।

মানসলোকের এই হিন্দু-মুসলমান ভাবসমন্বয় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় ফুটে উঠল। মুসলমান শিল্পীরা পারস্যের 'শৈলী' এদেশে যে নিয়ে আসেননি তা নয়। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পীদের প্রতিভার কথা আবুল ফজলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।[৩৪] বিজাপুর দিল্লী ফতেপুরসিক্রী আহ্‌মেদাবাদে যেসব মসজিদ গড়ে উঠল তার মধ্যে হিন্দু শিল্পীদের হাতের ও মনের স্পর্শ এত স্পষ্ট যে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা আর আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত এই সব মসজিদের কাছে আরব তুরস্ক মিশর স্পেনের মসজিদ ম্লান হয়ে যায়।[৩৫] মোগল ও রাজপুত চিত্রকলাও ঠিক সেযুগের স্থাপত্যের মতন হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। মধ্যএসিয়া ও পারস্যের চিত্রকলার প্রভাব এর মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠলেও, মোগল বাদ্‌শাহ ও নবাবদের রাজদরবারে, অথবা রাজপুতানা তাঞ্জোরের হিন্দু রাজাদের প্রাসাদে যে নতুন চিত্রকলার বিকাশ হল তা কোন বিদেশী শিল্প বা শিল্পীর হুবহু নকল নয়। তার মধ্যে এদেশের হিন্দু-মুসলমান শিল্পীর হাতের ও মনের ছাপ রইল, নিজের বিশিষ্টতায় সে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই চিত্রকলাকে আমরা "হিন্দু-মুসলিম চিত্রকলা" বলতে পারি।[৩৬] ভাবরাজ্যে জোলা নাপিত কসাই ধুনুরিদের প্রাধান্যের যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষার সমাদর যে কমে যাবে, তার গোঁড়ামি যে ভেঙে যাবে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রাকৃত মনের ভাবপ্রকাশের জন্য সকলের বোধগম্য সহজ প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োজন। সংস্কৃত অথবা আরবী ফারসীর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে ভাষাকে আর বন্দী করে রাখা চলল না। যুগের তাগিদে, জনমনের ব্যাকুলতায় সংস্কৃত আরবী ফারসীর আভিজাত্য ভেঙে গেল, হিন্দী উর্দু বাংলা ভাষার জন্ম হল। বাদশাহদের মনোরঞ্জন করার জন্য দরবারকবি ও পণ্ডিতরা এসব ভাষা সৃষ্টি করেননি।[৩৭] যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ শাসক হন না কেন, ভাষা কখনও কোনো দেশের শাসকের ফরমায়েশমতন সৃষ্টি হয় না। ভাষা বহতা নদীর মতন। জোর করে দুর্বোধ্যতার গিরিকন্দরে ব্যাকরণবিধির শিলা-উপশিলা বুকে

চেপে রেখে তার গতি চিরদিন রোধ করে রাখা যায় না। সুপ্ত গণচেতনা যখন জাগে, যুগের দাবি যখন আসে, জনমন যখন জাতির ভাবধারা সংস্কৃতি-সম্পদ গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখনই ভাষা সেই সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির অবরোধ ভেঙে কুলকুল করে বইতে থাকে। ভাষা হয় প্রাকৃত জনের, প্রাকৃত মনের ভাষা। বাদ্‌শাহরা হয়ত শাস্ত্র পুরাণ অনুবাদে কেউ কেউ উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হন আর আরবী ফারসীর মৌলবীই হন, হিন্দী উর্দু বাংলা ভাষা সৃষ্টি করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা বাদ্‌শাহ রাজারাজড়ার ইচ্ছায় করেননি, জনমনের তাগিদে, যুগের দাবিতে আবেগে করেছেন। হিন্দু-মুসলমান প্রাকৃত জনের ভাবসমন্বয় ভাষার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

এইভাবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণির মিলন হল সমন্বয়ের মহাসাগরে। ব্রাহ্মণ্যবাদের জড়তা গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকবৃত্তিতে আঘাত লাগল। ভারতের সাধনা উত্তুঙ্গ জ্ঞানমার্গ থেকে, বহুদেবতার কোলাহলমুখর স্বর্গলোক থেকে নানাসুরে অদ্বৈতবাদের একতারা বাজিয়ে নেমে এল নিচে, ভক্তির ও প্রেমের, সাম্যের ও ঐক্যের গণমানসসমুদ্রে মিশে গেল। সাধনায় একমাত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশানুক্রমিক অধিকার রইল না, জোলা নাপিত কসাই হিন্দু মুসলমান সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ইসলামও তার শরিয়তী চৌহদ্দি ছাড়িয়ে হিন্দুসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবিত উদার ভাবধারার সঙ্গে মিশে গেল। চিশ্‌তী দরবেশ, মুসলমান সাধক ও সূফীরা ইসলামকে ভারতীয় রূপ দিলেন। মুসলমান মৌলবী পণ্ডিতরাই যে ইসলামধর্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন তা নয়, মুসলমান ধুনুরি কসাই সকলেই নতুন হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের পথে এগিয়ে এলেন। সংস্কৃত আরবী ফারসী থেকে সহজ সরল প্রাকৃত জনের হিন্দী বাংলা উর্দু ভাষার সৃষ্টি হল। স্থাপত্যে শিল্পকলায় হিন্দু-বৌদ্ধ-পারসী-আরবী ভাব ও শৈলীর সমন্বয় হল। ভারত-সংস্কৃতির নতুন যে বনিয়াদ গড়ে উঠল তা হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির বনিয়াদ। সমন্বয়ের ধারা তার অবিচ্ছিন্ন রইল, কিন্তু সেই ধারা পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হল।

ভারতের এই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও বাংলা তার নিজের বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাংলার এই বিশিষ্টতার কথা আগে বলেছি। বাংলাদেশ মানবপন্থী, শাস্ত্রপন্থী নয়। বাংলার দেবতারাও সাধারণ মানুষের মতন সুখেদুঃখে হাসেন কাঁদেন, প্রেমে উতলা হন। দুই পাড় ভেঙে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখানকার নদনদীর

ধর্ম। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ, বর্ষণকাতর এখানকার পলিমাটি উর্বর। তাই বাংলার ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতি দুই পাড় ভেঙে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাংলার মিলন শুধু বুদ্ধির মিলন নয়, বাংলার সমন্বয় শুধু আদর্শের সমন্বয় নয়, আবেগের সমন্বয়। বাংলার মহাযান বৌদ্ধমত, বজ্রযান শৈবমত সব এই আবেগের জোয়ারে ভেসে গেছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্মও কোনো বন্ধন, কোনো বিধিনিষেধ মানেনি।

বাংলার শ্রীচৈতন্য যখন জন্মালেন [৩৮] তখন বিজয়ী মুসলমান রাজশক্তি দেশের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা তার সামনে বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু করেছেন। তখন বৌদ্ধধর্মের অবসান ও অবনতির যুগ। বিকৃত তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পাঁকের মধ্যে তখন মহাযানের মহান আদর্শ ডুবে গেছে। ভাবাবেগের আতিশয্যে তখন আদর্শের বাঁধ ভেঙে ব্যভিচার ও দুর্নীতির বন্যা নেমেছে দেশে। বাংলার প্রকৃতির বিশেষত্ব তখন আদর্শ-বিকৃতির মধ্যে ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মতন অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের সময় নিহত হয়েছেন মুসলমানদের তরবারির আঘাতে, আর না হয় পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে পালিয়ে গেছেন। স্মার্তপণ্ডিতরা নব্যব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর চৌহদ্দির মধ্যে শিথিল সমাজকে আবার শক্ত করে বাঁধতে চাইলেন। তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের কাছে সকলেই সসম্ভ্রমে মাথা হেঁট করল, কিন্তু দূর থেকে ভয়ে ভয়ে। স্মার্ত রঘুনন্দনের রক্তচক্ষু কপালেই উঠে রইল, নতুন মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেন ক্রোধোদ্দীপ্ত নব্যব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিমূর্তি তিনি। বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত জনসাধারণের প্রতি কোনো মমত্ববোধ, কোনো দরদ ছিল না পণ্ডিতদের। শাস্ত্র আর নীতির সূত্র দিয়ে তাঁরা সব বিচার করেছিলেন। বাংলার জনসাধারণ কেন দলে দলে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল, কোথায় তাদের বেদনা, কোথায় সমাজের গলদ তা তাঁদের বিচার করার অবকাশ হয়নি। তাঁরা দেখেছেন কেবল ইসলামের তরবারি আর বল্লম, জনসাধারণের মনোবিকার আর দুর্নীতিপরায়ণতা। তাই শিখা আর পৈতা নিয়ে তাঁরা কঠোর কণ্ঠে শাস্ত্রের নীতিসূত্র আবৃত্তি করেছিলেন, জনসাধারণ দূর থেকে শ্রদ্ধা আর প্রণাম জানিয়ে সরে গিয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্য জন্মালেন। শাস্ত্রপন্থী স্মার্তপণ্ডিতদের সংকীর্ণ অলিগলিতে নয়, মানবপন্থী বাংলার উদার আকাশের তলায়, প্রেম ও ভাবাবেগের প্রশস্ত পথের উপর শ্রীচৈতন্য এসে দাঁড়ালেন ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে।

শংকর রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ-প্রমুখ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারদের মধ্যে

কার সম্প্রদায়ভুক্ত চৈতন্য ছিলেন তা নিয়ে এখানে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই।[৩৯] এখানে তা গৌণ। আগেই বলেছি, শংকর থেকে নিম্বার্ক পর্যন্ত জ্ঞানবাদ থেকে ভক্তিবাদের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। নিম্বার্কের ভক্তিবাদ বিশেষ করে আবেগপ্রধান প্রেমপ্রধান। শ্রীচৈতন্য কোনো বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত না হলেও, ভক্তিবাদের এই আবেগপ্রধান প্রেমপ্রধান ধারার বিকাশই যে তাঁর বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে, অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্য তো শুধু নবদ্বীপেই বন্দী হয়ে ছিলেন না; সারা ভারত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, নানাপ্রদেশের বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। নানাভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল একথা যদি নাও মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও সংস্কৃত আরবী ফারসী হিন্দী উড়িয়া মৈথিল তামিল তেলেগু মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষায় তাঁর চলনসই জ্ঞান ছিল বলে মনে হয়।

এদেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল,
সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।
—গোবিন্দদাস

সুতরাং চৈতন্যকে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত না করেও বলা যায়, তাঁর মধ্যে আবেগপ্রধান প্রেমপ্রধান ভক্তিবাদই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই ভক্তিবাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য বাংলার বিশিষ্টতা দান করেছেন। যা ছিল আবেগপ্রধান তা বাংলার শ্রীচৈতন্যের কাছে আবেগসর্বস্ব হয়েছে, যা ছিল প্রেমপ্রধান তা প্রেমময় প্রেমসর্বস্ব হয়েছে।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যুগসাধক শ্রীচৈতন্য বুঝলেন, শাস্ত্রের বাঁধাধরা পথে বাংলার জনমনের মোড় ফেরানো যাবে না, যায়নি কোনদিন। মানবপন্থী বাংলার চিরদিনের পথ মানবতার পথ, উদারতার পথ, প্রেমের পথ। তাই ইসলামের বাইরের রণমূর্তি ,উদ্যত তলোয়ার বল্লম দেখে তিনি ভয় পেলেন না। বাংলার প্রাকৃত জনের ধর্মান্তরকে তিনি কেবল নীতিভ্রষ্ট নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণের মনোবিকার বলে রক্তচক্ষু ললাটে তুললেন না। তিনি বুঝেছিলেন, ইসলামের আবেদন কোথায়, কোথায় তার অন্তর্নিহিত শক্তি। রাজশক্তি যতই উগ্র অত্যাচারী হোক না কেন, শুধু তার প্রতাপেই কোনো জাতিকে এমন বিপুল বেগে নতুন ধর্মের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। আরবের অসংখ্য জাতি-উপজাতি ইসলামধর্মের পাশে শুধু তলোয়ারের ঝল্‌কানি দেখে সংঘবদ্ধ হয়নি। বাইরের কোনো দেশেই ইসলামের প্রভাব-বিস্তার কেবল ঘোড়া আর তলোয়ারের জোরে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর

ইতিহাসে কোনো ধর্মের বিস্তার কেবল হানাহানির পথে হয়নি, না বৌদ্ধ-ধর্মের, না খ্রীষ্টধর্মের, না ইসলামের। মানবধর্মই সব ধর্মের আদি রূপ, জনমানসের অভিব্যক্তিই তার প্রথম প্রকাশ, প্রাকৃত জনের কামনা-বেদনাই তার মধ্যে রূপায়িত। তাই প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে, কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির অন্য সব পথ যখন বন্ধ তখন মানবধর্মের মধ্যেই জনমনের চাহিদা চরিতার্থ হয়েছে। তারপর সেকালের শ্রেণীসমাজের অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটেছে, মানবধর্ম হয়েছে শাসক ও তার পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর শাসন-শোষণের হাতিয়ার, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর ধর্ম, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিতের ধর্ম, মোল্লা মৌলবীর ধর্ম ; কিন্তু কোন ধর্মেরই আসল আদিরূপ তা নয়, তার বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিণতি মাত্র। সকল ধর্মের ক্ষেত্রে যা সত্য, ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে তা মিথ্যা নয়। ইসলাম যখন এদেশে এসেছিল তখন শুধু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে আসেনি, মুসলমান সাধকরাও ইসলামের বাণী প্রচার করতে করতে এসেছিলেন। সারা ভারতের মতন বাংলাতেও মুসলমান সূফী সাধক পীর ফকিরের অভাব ছিল না। হিন্দুর বিশুদ্ধ দেবতারা পর্যন্ত মুসলমান পীর ফকিরদের চেষ্টায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রদেবতা সত্যপীর মানিকপীর কালুগাজি-রূপে দেখা দিয়েছিলেন। বাংলার উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে শ্রীচৈতন্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, জাতিবিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষ-জর্জর শাস্ত্রপীড়িত আচারক্লিষ্ট বাংলাদেশে এই তরঙ্গবিক্ষোভ স্বাভাবিক। ইসলামের সাম্য ও ঐক্যের বাণী বোধ হয় তাঁর মতন করে আর কেউ আত্মসাৎ করেননি, ভারত-পন্থরাও না। কারণ এমন তরঙ্গবিক্ষোভ আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি, এমন করে দুই পাড়-ভাঙা ভাঙনের বন্যা আর কোথাও আসেনি। এ হল বাংলারই বৈশিষ্ট্য। কবীর দাদূ তো শুধু মিনতি করে, বড় জোর পায়ে ধরে বলেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমান ! আমাদের বচন মানো'। কিন্তু বাংলার শ্রীচৈতন্য শুধু মিনতি করেই ক্ষান্ত হননি, সাম্য মৈত্রী আর একতার 'বাণী' রচনা করাই যথেষ্ট মনে করেননি। তিনি গান গেয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পল্লী প্রান্তরে বাংলার প্রাকৃত জনও গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম অধঃপতন, ইসলামধর্মের আন্তরিক আবেদন, নব্যরাজধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়েরই রক্তচক্ষুর সামনে শ্রীচৈতন্য নতুন সুরে, অভিনব ভঙ্গিতে গান গেয়ে উঠলেন। শুধু 'যবন হরিদাস' তো দেশে শান্তি আনতে পারবেন না, কারণ সমাজে জগাই-মাধাইয়েরও যে অন্ত ছিল না।

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ,
ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ।
—চৈতন্য ভাগবত

ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম অবনতির মূর্তিমান প্রতীক জনার্দন-নন্দন জগাই আর রঘুনাথ-নন্দন মাধাই। জগাই-মাধাইয়ের মুক্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্যের শক্তিই প্রকাশ পেয়েছে, আর সেই শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছে যবন হরিদাসের ধর্মান্তরের মধ্যে। সেদিনের বাংলার সমাজের প্রতিচ্ছবি জগাই-মাধাই, আর 'যবন হরিদাস' শ্রীচৈতন্যের নতুন আদর্শ সমাজের মানুষ।

ইসলামী আদর্শের বিপুল বন্যা এবং মুসলমান রাজশক্তির প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য কি নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন? কি তাঁর হাতিয়ার? তিনি ইসলামবিরোধী ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি, তাই শাস্ত্র তাঁর হাতিয়ার নয়। প্রতিপক্ষের পণ্ডিতদের সঙ্গে কোনো ধর্মসমস্যা সমাধান করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্যও তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। সব ধর্মই 'মানবধর্মরূপে' শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই ধর্মরক্ষা হবে, মানবতার পথেই ধর্ম বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে। এই মানবধর্ম প্রচারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার শ্রীচৈতন্য আবিষ্কার করলেন জনসংগীত সংঘসংগীত বা সংকীর্তনের মধ্যে। 'আবিষ্কার' করলেন বললে কোন ভুল হয় না; কারণ যা বিস্মৃতির অন্ধকারে, জাতীয় অবনতির পাঁকের মধ্যে হারিয়ে যায়, ডুবে যায়, তাকে জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য আবিষ্কারই করতে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কীর্তনগানের কথা থাকলেও**, শ্রীচৈতন্যই তাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু আবিষ্কার নয়, চৈতন্য তাকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ভাগবতের কীর্তন আর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বাংলার বৈষ্ণবদের সংকীর্তন এক নয়। এই সংকীর্তনই হল শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার কেন?

মানুষের বাসনা কামনা আবেগ আকুলতা প্রকাশের আদি অকৃত্রিম বাহন ভাষা নয়, সাহিত্য নয়, অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য এবং সুর ও সংগীত। এখনও তাই নৃত্য সংগীতের আবেদন জনমনের কাছে সবচেয়ে বেশি। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগপ্রধান সংঘনৃত্য ও সংঘসংগীত বা সংকীর্তন তাই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং অভিনব টেকনিক। সমস্ত সমাজকে, সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে জাগাতে হলে এই জনসংগীতের ভিতর দিয়েই জাগাতে হবে। তাই যে-সংকীর্তন শুনে নবদ্বীপের ভট্টাচার্যেরা হল্লা-চীৎকার বলে বিদ্রূপ করেছেন, নবাব কাজিরা হুমকি দিয়েছেন, সেই সংকীর্তন শুনে তাঁদের কুলাঙ্গার বংশধরেরা আবার মানুষ হয়েছে, কাজিরা নিজেরাই তাতে যোগ দিয়েছেন। কীর্তন তো

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আবদ্ধ করে রাখার জন্য শ্রীচৈতন্য আবিষ্কার করেননি। সংকীর্তন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সকলের জন্য, জনসাধারণের জন্য, গণমানসকে নতুন ভাবাদর্শের পথে পরিচালিত করার জন্য। তাই কীর্তন শ্রীবাসের আঙ্গিনা থেকে নগরের রাজপথে এসে 'নগরকীর্তন' হল। হাজার হাজার নর-নারী, হিন্দু-মুসলমান সেই নগরকীর্তনে যোগ দিল। জনসমুদ্র সুরের তরঙ্গে, নৃত্যের আবর্তে উদ্বেল হয়ে উঠল। কাজিগাজি, বামুন পণ্ডিতেরা তৃণখণ্ডের মতন সেই তরঙ্গের তলায় তলিয়ে গেলেন। না খাঁওয়াই আশ্চর্য, কারণ এত প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে তো এর আগে আর কেউ আসেননি। মানবতার বাণীর ভিতর দিয়ে এই সংকীর্তনের মধ্যেই বাংলার শ্রীচৈতন্য বাংলার বিশিষ্টতাকে রূপ দিয়েছেন।

কবীর দাদূর বাণী আর শ্রীচৈতন্যের বাণীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। কবীর দাদূ কেন, বৈদিক ঋষিদের বাণী, মহাবীর বুদ্ধের বাণী, ভাগবতের বাণী অথবা মহম্মদের বাণী আর শ্রীচৈতন্যের বাণীর মধ্যেও কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ আছে সেই বাণী উচ্চারণের মধ্যে। বাণী উপলব্ধির পার্থক্যের জন্যই বাণী-প্রকাশের ভঙ্গির এই প্রভেদ। বাংলার এই ভঙ্গিটাই একেবারে নিজস্ব, অভিনব। দেবতার সঙ্গে এমন মানবীয় আত্মীয়তার সম্বন্ধ আর কারও নেই, তাই বাঙালী বৌদ্ধরা দোহা রচনা করেছেন, আর শ্রীচৈতন্য সৃষ্টি করেছেন সংকীর্তন। যেখানে আবেগ ও আত্মীয়তা এত গভীর, এত নিবিড়, এত মানবীয় যেখানে সংগীত আর কাব্যই তো শ্রেষ্ঠ ভাবপ্রকাশের বাহন। তাই বাংলার বৈষ্ণব সংগীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাস আর শাক্ত সংগীত-সাহিত্যে 'প্রসাদী সুর' ও গানের স্রষ্টা রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়েছে। বাংলার ঘরছাড়া বাউলরাও বাংলার ঘরের মানুষ।

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ভাবসমন্বয় এত গভীর, এত আবেগপ্রধান বলেই এখানে বৈষ্ণবদের নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সহজিয়া বৈষ্ণবরা হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির জন্যই দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। ঢাকার পঞ্চুফকিরের শত শত শিষ্য হিন্দু, কৃষ্ণনগরের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু মুসলমান, হজরতি সম্প্রদায়ের নেতা হজরতের বাস বাঁশবেড়ে। এরকম আরও অনেক সম্প্রদায় আছে, যেমন পাগল নাথী ও গোবরা সম্প্রদায়, দুজনেই মুসলমান, বাবা আউলের সম্প্রদায়, রামবল্লভী সম্প্রদায় ইত্যাদি।[৪১] বর্ণ জাতি সম্প্রদায় কোনোকিছুই এঁরা মানেন না। চৈতন্য-প্রবর্তিত ধারায় কতকটা বাউলদের মতন এঁরা আজও গান গেয়ে বেড়ান—

কালী কৃষ্ণ গড খোদা,
কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা,
তাতে নাহি টল।
মন, কালী কৃষ্ণ গড খোদা বল রে!
মগে বলে ফারা, তারা
গড বলে ফিরিঙ্গী
খোদা বলে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।

'পূর্ববঙ্গগীতিকায়' মুসলমান পল্লীকবিরাও গান রচনা করে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের ভাব প্রকাশ করেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন নিজ গুরু জিন্দাগাজীর কাছে বর চেয়ে 'মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াথান' ইত্যাদি গানে হিন্দুতীর্থগুলিকেও বন্দনা করেছেন।[৪২] নেজাম ডাকাতের গীতিকার মুসলমান পল্লীকবি চট্টগ্রামের সমস্ত গ্রাম্যদেবতাকে বন্দনা করে গান আরম্ভ করেছেন এবং শেষে 'সীতা শক্তি মাকে মানি, রঘুনাথ গোঁসাই' প্রভৃতি পদ গেয়ে 'দুনিয়ার সার' পিতামাতার চরণ বন্দনা করেছেন।[৪৩] চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখেছেন :[৪৪]

বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ।
ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত।
চণ্ডালেতে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়।
এমন সুধন্য দেশ জাত নাহি যায়।
ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে হাত।
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ।

বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পকলার মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। বাংলার 'বারদুয়ারী ঘর', 'আটচালা' 'দোচালা' ঘর নবাবরা ধ্বংস করলেও আবার তা তৈরি করেছেন। গৌড়ের 'সোনা মসজিদ' এখনও বারদুয়ারী মসজিদ নামে পরিচিত। হিন্দুদের মন্দির ভেঙে যেসব মসজিদ তাঁরা গড়েছিলেন তার মধ্যেও হিন্দুশিল্পীর কারিগরিই বেশি। রাজশাহীর 'বাঘার মসজিদ', গৌড়ের 'হুসেন সাহের মসজিদ', 'কদম শরীফ', 'নোটন মসজিদ', সবই হিন্দু মন্দিরের কারুকাজ ও ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত। গম্বুজ মিনার আর মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ আরবী লিপি ছাড়া বিদেশী প্রভাব তার মধ্যে বিশেষ

কিছু নেই। কিন্তু সে যাই হোক, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয়ে মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট দান এসব নয়। মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট দান হল, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম; সংকীর্তন গান, পদাবলী সাহিত্য এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমান পল্লীকবির অপূর্ব লোকসংগীত বাউল গান আর বাংলার মিশ্রদেবতা সত্যপীর মানিকপীর কালুগাজি ইত্যাদি। বাংলার মতন কেউ বোধ হয় মুসলমানদের এত আপনার করে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলার মুসলমানরা এই বাংলারই প্রাকৃতজন, ঘরের মানুষ। বাংলার মুসলমান মা-বোন-স্ত্রী একেবারে খাঁটি বাংলারই ঘরের মেয়ে। তাঁদেরই সন্তানরা তো বাংলার মুসলমান। তাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয় শুধু সাধকদের ভাবলোক সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাবলোকেও সেই সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব মানবধর্ম, সংগীত সংকীর্তন গান গাথা কাব্যের ঝর্ণাধারা, অভিনব সব মিশ্রদেবতা লোকদেবতা। আর সমাজে, অর্থাৎ বাস্তব জগতে ঘরের কোণেও তার প্রভাব পড়েছে। বেশভূষায়, আচারব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে যেমন এক পরিবারের মানুষ বলে মনে হয়, সেরকম ভারতের আর কোথাও হয় না।

সেকাল আর একালে সংস্কৃতিসমন্বয়ের পার্থক্য

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারা, এবং সেই ধারায় বাংলার বিশিষ্ট দান কি সে সমন্ধে আলোচনা করা হল। এখন প্রশ্ন হল, সেকাল অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্বয়ের সঙ্গে একালের পার্থক্য কোথায়? আগেই বলেছি, বাংলায় তথা সারা ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের তিনটি যুগ দেখা যায়। প্রথম যুগ, আর্য-অনার্য সংস্কৃতিসমন্বয়ের যুগ; দ্বিতীয় যুগ, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্বয়ের যুগ; তৃতীয় যুগকে আমরা বর্তমান যুগ বলতে পারি, ভারত-ইয়োরোপ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিসমন্বয়ের যুগ, নবজাগৃতির যুগ। পুরাতন যুগের সমন্বয়ের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সমীকৃত করে নতুন যুগের সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু নবযুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা নতুন; প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য কোথায় এবং কেনই বা এই পার্থক্য?

বেদে মানুষের সুখসম্পদ, শান্তি মৈত্রীর কথা অনেক পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে তো এইসব কথারই ছড়াছড়ি। উপনিষদেও বড় বড় কথার অন্ত নেই। মৈত্রেয়োপনিষৎ তো বর্ণাশ্রমধর্ম এবং বাহ্য ও বিগ্রহ পূজাচারের রীতিমত

বিরোধিতা করেছেন। বর্ণাশ্রমআচারযুক্ত বিমূঢ়রাই কর্মানুসারে ফল পেয়ে থাকে, আর বর্ণাদি ধর্ম ত্যাগ করে মানুষ সানন্দে তৃপ্ত হতে পারে। মণি মাটি পাথর লোহার বিগ্রহের পূজোয় মানুষের জন্ম ও ভোগ বিড়ম্বিত হয়, আর সাধক যিনি তিনি বাহ্যাচার ছেড়ে নিজের অন্তরে অর্চনা করেন। এসব উপনিষদেরই কথা।[৪৫] মহাবীর ও বুদ্ধের অহিংসা সাম্য মৈত্রীর বাণী সকলেই জানেন। ভাগবতরা ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। শুধু ধর্ম নয়, সমাজ ও অর্থনীতিক্ষেত্রেও ভাগবতরা খুব উদার। সকলকে সমানভাবে অন্ন ভাগ করে দেবার কথা তাঁরা বলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে প্রয়োজন মতন ক্ষুধার অন্ন পাবার অধিকার সকলের আছে এবং ছলে-বলে যে বেশি অন্ন অধিকার করে, ক্ষুধার অন্ন যে কেড়ে নেয় সে চোর, তাকে দণ্ড দেওয়া উচিত।[৪৬] মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান সাধকরা সকলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই কথা বলেছেন, কেবল যুগের উপযোগী করে তাকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে এসব উদার বাণী, মহান আদর্শ সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি। পণ্ডিত পুরোহিত, ভিক্ষুভিক্ষুনী, ব্যভিচারী তন্ত্রবিলাসী, আচার ও জাতস্বর্বস্ব বোষ্টম-বোষ্টমীতে সমাজ ভরে গেছে। কোনো আদর্শের মহত্ত্ব, কোনো বাণীর উদারতা সমাজকে উন্নত করতে পারেনি। বৈদিক ঋষি থেকে জৈন বৌদ্ধ ভাগবত শৈব বৈষ্ণব সাধকরা পর্যন্ত সকলে যুগে যুগে একই উদার বাণী যেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার করেছেন, তেমনি সমাজও বারবার ঘুরপাক খেয়ে সেই একই দুর্নীতি ব্যাভিচার ও ভেদবৈষম্যের পাঁকের মধ্যে ডুবে গেছে। যুগসংকটের সময় যুগসাধকদের কণ্ঠে নিপীড়িত মূক জনসাধারণের অচরিতার্থ আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কার্ল মার্ক্স তাই 'ধর্ম' সম্বন্ধে বলেছেন : 'Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world, the soul of soulless conditions.' কিন্তু সে কণ্ঠ ও দীর্ঘশ্বাস আবার রুদ্ধ হয়ে গেছে অচল অটল শ্রেণী-সম্প্রদায়-বর্ণ-বিভক্ত সমাজের জগদ্দলের চাপে। বাংলার শ্রীচৈতন্য, যিনি বাংলার নদনদীর বন্যার মতন ভাবের বন্যায় অনাচার ব্যভিচার ধর্মবিদ্বেষ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর সংকীর্তন নগরকীর্তনের মতন অভিনব হাতিয়ার মধ্যযুগের কোনো সাধকই আবিষ্কার করতে পারেননি, তিনিও প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে, সমাজের মূল কাঠামোকে সোজাসুজি আঘাত করার সাহস পাননি। শুধু সাহস পাননি বললেও বোধ হয় ভুল হবে, অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে তিনি বর্ণাচারপীড়িত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনও

চাননি।* নব্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া হয়ত তাঁর উপায় ছিল না। ঢাল তলোয়ার না নিয়ে নিধিরাম সর্দারের মতন তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাঁর একমাত্র তলোয়ার ভাবাবেগের তলোয়ার, একমাত্র হাতিয়ার তাই সংঘসংগীত নৃত্য। তাঁর সংগ্রামক্ষেত্র ভাবলোক, মর্তলোক নয়। সমাজ তো অচল অটল স্থিতিশীল, কূপমণ্ডূকবৃত্তি তার স্বধর্ম। সমাজের এই অচলায়তন চূর্ণ করার শক্তি শ্রীচৈতন্য কোথায় পাবেন? তাঁর আগে ভারতের বা বাংলার কোনো সমন্বয়সাধক পারেননি। পারেননি বলেই একই উদার বাণী, একই মহান আদর্শ তাঁরা বারবার ঘোষণা করেছেন। কেন করেছেন? কারণ সমাজের বুকের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদ বর্ণাশ্রমধর্ম ও শ্রেণী-বৈষম্যের জগদ্দল চেপে থাকলেও সমাজের তলার মানুষগুলো তার চাপে একেবারে মরে যায়নি। তারা বেঁচে ছিল। বেঁচে ছিল দেশের চাষী কারিগর নাপিত জোলা কসাই কামার ছুতোর ধুনুরিরা। তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-আশা-আদর্শও মরে যায়নি। তাদেরই অতৃপ্ত আশা আদর্শ, তাদেরই কামনা বেদনা যুগসাধকরা প্রকাশ করেছেন, বারবার করেছেন যুগসংকটের সময়। কিন্তু সমাজব্যবস্থাকে কেউ সোজাসুজি আঘাত করেননি, অর্থাৎ সামাজিক আন্দোলন কেউ করেননি। করার শক্তি ছিল না তাঁদের, হাতিয়ার ছিল না, কারও না। কি সেই শক্তি, সেই হাতিয়ার?

সেই শক্তি সামাজিক শক্তি, সেই হাতিয়ার অর্থনৈতিক হাতিয়ার। কোনো সাধক, কোনো মহাপুরুষের সাধ্য নেই সেই শক্তি, সেই হাতিয়ার ছাড়া সমাজের ও মানুষের উন্নতিসাধন করা। কথাটা হয়ত আধ্যাত্মিক ভাবশূন্য অতিবাস্তব বলে মনে হবে। মানসলোকের আদর্শ বা নীতি যতই আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত হোক না কেন, তার মূল হল সমাজের মাটিতে। অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর মানসিক ও সাংস্কৃতিক সৌধ গড়ে ওঠে। শাখা-

* 'There is no evidence that Chaitanya, ever wanted to interfere actively with the established social order, with the time-honoured Varnasrama Dharma;...what he wanted was not social, but religious freedom and fellowship...one need not emphasise only some of the anti-caste inclinations of Chaitanaya's religious (and never social) attitude and unnecessarily make him out to be (in the light of modern ideas) a great social reformer, which he never pretended to be.'—Dr. S. K. De: *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*: 81-82 (১৯৪৮)

প্রশাখা নিয়ে গাছ অনেক সুন্দর, তার চেয়ে আরও সুন্দর সেই গাছের ফুল ও ফল। কিন্তু গাছের ফুলফলের সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস ও মাটির তলায়, মাটির রসে আর শিকড়ে, তা অস্বীকার করা যায় না। ফুলের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে তার উৎসকে অস্বীকার করা অজ্ঞতা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ্‌দের মনোমৈথুন কল্পনার ব্যভিচার মাত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। ভারতে আধ্যাত্মিক ভাবধারার তাই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং যুগে যুগে যুগসাধকদের আবির্ভাবের ফলে তাই ভারতের সমাজব্যবস্থার কোনো উন্নতি, কোনো পরিবর্তন হয়নি। মুসলমানযুগের নবাব-বাদ্‌শাহরা, সাধক সুফী দরবেশরা পীর ফকিররা সেই মানসলোকের ভাবসমন্বয়কেই সমৃদ্ধ করেছেন মাত্র, সমাজব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তাঁরা করতে পারেননি। ভারতের সেই 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোট ছোট গ্রাম ও গ্রামাসমাজ সকল রকম পরিবর্তনের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়েছে ভারতের সুপ্রাচীন জাতিবর্ণবিভাগ-প্রথা।

ব্রিটিশযুগে এই অচল অটল আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজব্যবস্থা ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্‌স তাই বলেছেন :[৪৭]

> আপাতনির্দোশ শান্তশিষ্ট এই অসংখ্য ছোট ছোট সমাজকেন্দ্রগুলিকে যখন তছ্‌নছ্‌ করে দেওয়া হল তখন দুঃখদুর্দশার অকূল সমুদ্রে তারা ভেসে গেল। তাদের সনাতন সভ্যতা, বংশানুক্রমিক পেশা, কিছুরই যেন আর অস্তিত্ব রইল না। এসব দেখলে বৃটিশ শাসকদের প্রতি যে-কোনো মানুষের মন ঘৃণায় ভরে উঠবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এই নির্বিকার গ্রাম্যসমাজকেন্দ্রগুলিই যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের বনিয়াদ ছিল। এই গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে মনের কোনো প্রসার সম্ভব হয়নি। কুসংস্কারের বদ্ধকূপে মানুষের মন ছিল নিষ্ক্রিয় হয়ে, প্রচলিতপ্রথার দাস হয়ে। কোনো ঐশ্বর্য, কোনো ঐতিহাসিক প্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি।

কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক, এই হল ভারতের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বাংলার শ্রীচৈতন্যের ট্রাজিডির এই হল মূল কারণ, চৈতন্যপূর্ব যুগের সাধক ও সমন্বয়গুরুদেরও (Heroes of Synthesis) একই ট্রাজিডির এই একই মূল কারণ। এদেশে ব্রিটিশযুগ তাই পরিবর্তনের যুগ। মার্ক্‌স তাই ব্রিটিশের উদ্দেশ্য 'vilest' এবং ব্রিটিশ পদ্ধতিকে 'swinish' ও 'stupid' বলেও

প্রশ্ন করেছেন, 'এদেশে সমাজবিপ্লব ভিন্ন কি মানুষের মুক্তি সম্ভব? তা যদি না হয় তাহলে ইংলণ্ড যত অপরাধই করুক না কেন, সজাগ না হয়েও, এদেশে নতুন সমাজগতি সঞ্চার করে সে ইতিহাসের প্রতিনিধির কাজই করেছে।'[৪৮]

নবযুগের বাংলার তথা সারা ভারতের সামাজিক জাগৃতি ও সংস্কৃতি-সমন্বয় তাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ গভীর, তার পার্থক্য মূলগত। বাংলার চৈতন্য আর বাংলার রামমোহন বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মূলগত ব্যবধান আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলমান চিশ্‌তী দরবেশ, সূফী সাধক, পীর ফকির, দাদূ বা দারাশিকোর সঙ্গে সৈয়দ আহ্‌মদ্, আমীর আলির পার্থক্যও মূলগত নয় কি?

এতদিন মানুষের মন ছিল কুসংস্কারের বদ্ধকূপে নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ হয়ে, প্রচলিতপ্রথার দাস হয়ে। খরস্রোতা নদীর মতন যে-সমাজ প্রবহমান নয়, তার বুকে মানুষের মন যুক্তিবুদ্ধির পাল তুলে দিয়ে অভিযান করতে পারে না। কূপমণ্ডূকবৃত্তিই হয় তার স্বভাবধর্ম। এদেশের সেই স্থিতিশীল সমাজের বুকে তরঙ্গবিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে ইংরেজ শাসকরা। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আঘাতে যেমন নতুন ভাবাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সেই ভাবাবর্তের স্বাভাবিক ভাবসমন্বয়ের পরিণতির জন্য নতুন অর্থনৈতিক শক্তি অন্তত খানিকটা সক্রিয় হয়েছে সমাজের মূলে। তাই বৃহত্তর ভাবসমন্বয়ের পথ এযুগেই প্রশস্ত হয়েছে, আগেকার যুগে হয়েও হয়নি, কারণ এযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানসলোকের ভাবসমৃদ্ধির জন্য যে অনুকূল বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির সুযোগ ক'রে দিয়েছে তা আগেকার যুগের অচল অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করতে পারেনি। মধ্যযুগে কবীর দাদূ শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকদের ভাবসমন্বয়ের মহান আদর্শ বাইরের সমাজে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও, এযুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদর্শ রূপান্তরিত হয়ে সার্থকতার দিগন্তবিস্তৃত পথে জয়যাত্রা করবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির দুটি স্বতন্ত্র ধারার একটি আর্যাবর্তে, আর একটি আরবদেশে গিয়ে শেষ হবে না। তেমনি ভারত-সংস্কৃতির ভিতরের শাঁসটুকু ফেলে রেখে পাশ্চাত্ত্যসংস্কৃতির খোলসটিও ইংরেজদের সঙ্গে ইয়োরোপযাত্রা করবে না। এযুগের পরিবর্তন অর্থনৈতিক বলেই, এবং সে-পরিবর্তন অত্যন্ত বাস্তব সত্য বলেই, এযুগের নবজাগৃতির ভাবসমন্বয়ের ধারার ক্রমপরিণতি সম্ভাবনা বেশি।

এযুগে প্রথম শুরু হল মানসলোক আর মর্ত্যলোকের সমন্বয়। নতুন উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আঘাতে অচল অটল সনাতন

সমাজব্যবস্থার ভিত পর্যন্ত ভেঙে গেল। যন্ত্র এল সক্রিয়তা ও সচলতার বাণী নিয়ে, বিজ্ঞান এল সংস্কারমুক্তির বাণী নিয়ে। সনাতন ভাবধারার চক্রবৎ পরিবর্তনের পালা শেষ হয়ে গেল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমন্বয়সাধকদের বাণী, উদার আদর্শ এই প্রথম নেমে এল মানসলোক থেকে মাটিতে। সমাজ ও মানুষের সামনে এই প্রথম ইতিহাসের সমস্ত রুদ্ধ দ্বার একে-একে খুলতে লাগল, আঁকাবাঁকা পথ তার এগিয়ে গেল মানবমুক্তি সমাজতন্ত্র ও সাম্যের দিগন্ত পর্যন্ত। এগিয়ে চলাই হল এযুগের মূলমন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-সমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নবজাগৃতির ধারা নব নব রূপে এগিয়ে চলল সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের দিকে। পিছনে ফিরে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই, কারণ পিছনে ফিরে গিয়ে ডানা গুটিয়ে বসে থাকার সেই শান্তির নীড়, সেই আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজ ভেঙে গেছে। আর্য-সংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতি ইসলামীসংস্কৃতি যত বিশুদ্ধ হোক না কেন তার পুনঃপ্রবর্তন আর সম্ভব নয়। নতুন সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ আছে, শ্রেণী-বিরোধ আছে। তারই ফাটল দিয়ে রক্ষণশীলতা সাম্প্রদায়িকতা উঁকিঝুঁকি দেবে, মধ্যে মধ্যে তার আস্ফালনও শোনা যাবে কিন্তু ইতিহাসের মোড় ফিরবে না আর পিছনে। চলন্ত ইতিহাসের চাকার তলায় সব রক্ষণশীলতা দীনতা নীচতা সাম্প্রদায়িকতা চূর্ণ হয়ে যাবে। নবযুগের সামাজিক নব-জাগৃতির ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিশিষ্টতা এইখানে এবং তার স্বরূপ এইজন্যই বৈপ্লবিক।

নবজাগৃতির ভাববিপ্লব

ইতিহাসের এগিয়ে চলার ছন্দ ও নিয়ম মার্কসই প্রথম আবিষ্কার করেন। এই নিয়ম অনুসারে, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রাম বাইরে থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ধর্মবিরোধ, দার্শনিক বা আদর্শগত দ্বন্দ্ব বলে মনে হলেও, আসলে তা সমাজের কোনো বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়।

ফ্রিড্রীশ এঙ্গেল্‌স

কয়েকটি সংবাদ পরিবেশন করছি। ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এরকম কয়েকটি সংবাদ, যা কেবল সংবাদ নয়। যেমন :

তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।—১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেভিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার একজন কল লাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে। এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর, আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্দ হয়। (সমাচার দর্পণ—১১ মার্চ ১৮২৬) কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।—যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কলের দ্বারা গম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বল ধারি

বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন। (সমাচার দর্পণ—৮ আগস্ট ১৮২৯)

…এইক্ষণে ইংগ্লণ্ড হইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রূপ এক নূতন যন্ত্র যাহা এইস্থানে স্থাপিত হইল, ইহার দ্বারা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষাও এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরন্তু কলিকাতায় আসিয়া সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে যে ঢাকা শহরেতেও ঐরূপ এক কল প্রস্তুত হইতেছে…পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস আছে তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভজনকরণে বাধিত করিবেন।—কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকস্য।

(বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ—৮মে ১৮৩০)

ক্লাইব স্ট্রিট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাক্‌শালের মেজের ২৬৷৷০ ফুট নীচে গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ খানা রূপা মুদ্রিত হইতে পারে। গত বৎসরের ৩০ আপ্রিল লাগাইদ নূতন টাকশালের সমুদয় খরচ ২৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে তন্মধ্যে কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে ১৩ লক্ষ। সম্পূর্ণরূপে কল চলিলে প্রতিমাসে ১৮,০০০ টাকা খরচ হয়।—গত জানুআরি মাসের

আসিয়াটিক (সোসাইটির) জর্নল হইতে গৃহীত।

(সমাচার দর্পণ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪)

নূতন মুদ্রাবিষয়ক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে। ঐ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নির্দিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা চলন হইবে।

(সমাচার দর্পণ, ২৯ আগস্ট ১৮৩৫)

আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

(সমাচার দর্পণ, ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫)

সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশী-পর্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনা-গমন করিতেছে।

(সমাচার দর্পণ, ২৩ জুলাই ১৮২৫)

মোকাম কলিকাতাতে ছকরা গাড়ির উৎপাতে রাস্তায় চলা ভার···।

(সমাচার দর্পণ, ২৭ এপ্রিল ১৮২২)

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে

ক্রমে ২ ছাপা কর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক।

(সমাচার দর্পণ, ২২ জানুয়ারি ১৮২৫)

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হল্‌হেড প্রণীত 'A Grammar of the Bengal Language' ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লেখা এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশবিশেষ ছেনিকাটা বাঙলা হরফে প্রথম মুদ্রিত হয়।[১] ১৮৫৩ সালে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী এদেশে যানবাহনব্যবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে রেলপথ প্রবর্তনের কথা বলেন এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০ মাইল রেলপথ এদেশে তৈরি হয়।[২]

প্রাচীন বাঙলা সংবাদপত্র থেকে সংকলিত কয়েকটি সংবাদ। সংবাদগুলি সাধারণ সংবাদ নয়, জাতীয় জীবনের সংবাদ। প্রত্যেকটি সংবাদ জাতীয় জীবনের যুগসন্ধিক্ষণের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ। ঘটনাগুলি এই :

এদেশের ঢেঁকি যাঁতা তাঁত ইত্যাদির বদলে বিদেশ থেকে ধানভাঙা কল, আটাপেষা কল, কাপড়ের কল আমদানি হচ্ছে। কলগুলি বাষ্পীয় শক্তি চালিত। কোনো কলে প্রতিদিনে দশমণ চাল হয়, কোনো কলে দিনে দু'হাজার মণ গম পিষতে পারা যায়। এদেশে এসব কলের কাণ্ডকারখানা আগে কেউ দেখেননি, তাই দলে দলে সকলে গঙ্গার তীরে তীর্থযাত্রীর মতন কল দেখতে যাচ্ছেন এবং দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন।* শুধু তাই নয়, অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে, সন্দেহ জাগছে। কলে কি দেশের মঙ্গল হবে, না, অমঙ্গল হবে? সংবাদপত্রে তাঁরা পত্রক্ষেপ করে জানতে চাইছেন, ইংরেজদের ও ইংলণ্ডের এইসব যন্ত্রপাতির ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা যেন এই সন্দেহ তাঁদের মন থেকে দূর করেন। কল আসছে, নতুন টাকশালও তৈরি হচ্ছে। টাকশালে টাকাপয়সা তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানি হচ্ছে। সাতঘণ্টায় প্রায় তিনলক্ষ টাকা তৈরি করা হবে। কোম্পানির তৈরি এই টাকা ভিন্ন হরেক-রকমের টাকাপয়সাও যে আর দেশের মধ্যে চলবে না, সে-সংবাদও

* উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লোকপ্রিয় স্বভাবকবি রূপচাঁদ পক্ষী লেখেন: 'পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল, জলতোলা কল, খোয়াভাঙা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ, করে একদিবসে সোজা পথ। কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর॥'—'সঙ্গীত রস কল্লোল'। (১৯৭৮)

আমরা পাচ্ছি। বিচিত্র বহুরূপী সব পয়সাকড়ি আর চালু থাকবে না। পয়সার কি আর অন্ত আছে না কি? পুরানো সিক্কা পাই পয়সা, নতুন 'বিট্' পাই পয়সা, মাত্রাহীন বাংলা ফারসী ও দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা। মহাদেবের বড় ত্রিশূলচিহ্ন-আঁকা পয়সা, ছোট ত্রিশূল-আঁকা 'গুট্‌লি' পয়সা, পাটনাই পয়সা। তাছাড়া 'কামারিয়া ত্রিশূলি পয়সা', অর্থাৎ দেশের কামারেরা এক ছিলিম তামাক খাওয়ার মতন অত্যন্ত সহজেই যেসব কৃত্রিম পয়সা তৈরি করত।[৩] এতরকমের পয়সাকড়ি, সোনা রূপোর টাকা আধুলি আর চলবে না। কোম্পানির টাকা পয়সা সকলকে বিতাড়িত করে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। সংবাদগুলির মধ্যে এদেশের যানবাহনব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়। পাটনা কাশী গয়া বৃন্দাবন প্রয়াগ দিল্লী সর্বত্রই পায়ে-হাটা পথেই যাতায়াত করতে হত। পথের মধ্যে নদীর উপর কাঠের আর দড়ির সেতু ছিল। কোম্পানির আমলেও এই ব্যবস্থা বহুদিন চালু ছিল, নতুন পথ আর সেতু তৈরি হয়েছিল, ডাকবাংলা গড়ে উঠেছিল পথের মধ্যে মধ্যে ডাকবাহকদের ও ইংরেজ কর্মচারীদের বিশ্রাম নেবার সুবিধার জন্য। জলপথে ছিল নৌকা। কিন্তু ১৮২৫ সালে ইংলণ্ড থেকে বাষ্পীয় জাহাজ প্রথম এসে পৌঁছল এদেশে। অবশ্য তিনমাস বাইশ দিনে এল, কিন্তু তাতে কি? দেশের মধ্যে জলপথে বাষ্পীয় নৌকা চলাচল শুরু হল। তারপর ইংরেজদের স্বার্থেই যে এদেশে রেলপথ তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন তা লর্ড ডালহৌসী বুঝলেন। রেলপথও তৈরি হল। দেশের পণ্ডিতদের যা কিছু পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান তা এতদিন হাতে-লেখা পুথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই জ্ঞান বিতরণ করে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা এবং সাধারণ লোককে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবার কোন প্রবৃত্তি তাঁদের ছিল না, কারণ উপায়ও ছিল না। ইংরেজদের আমলে এদেশে ছাপাখানা এল, এদেশের কর্মকারই তখন ছেনি-কাটা বাংলা হরফ এবং অন্যান্য হরফ তৈরি করল। চালের বাতায় গোঁজা পুথির গোপন বিদ্যা গ্রন্থাকারে ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

এই যে সব ঘটনা ঘটল এগুলো আগেকার রাজ্য ভাঙাগড়ার এবং রাজ-বংশের উত্থান-পতনের গুরুগম্ভীর ঘটনার চেয়ে একদিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধানকল, গমভাঙা কল, পাটকল, কাপড়ের কল, টাকা তৈরির কল, বই ছাপার কল, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথের বাষ্পীয় ইঞ্জিন—এসব যখন এদেশে এল তখন সশব্দে তাদের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়নি। আর্য শক হূণ পাঠান মোগলের ঘোড়ার মতন শব্দ করে তারা আসেনি,

তলোয়ারের ঝনৎকারও তাদের শোনা যায়নি। তারা নিঃশব্দে এসেছে, হয়ত একটু ধোঁয়া জমেছে এখানকার নির্মল আকাশে, অথবা একটু শব্দও হয়েছে নাট-বল্টু-শ্যাফ্‌ট-হুইলের। কিন্তু আগেকার সমস্ত অভিযানের নৃশংসতা এদেশের বোবা মাটি বুক পেতে সহ্য করেছে। হাজার নৃশংসতা, হাজার অত্যাচারেও এদেশের ধ্যানমগ্ন সমাজের ধ্যানভঙ্গ হয়নি। ধ্যানভঙ্গ হয়েছে কলের ধোঁয়ায়, যন্ত্রপাতির শব্দে। আরবী ঘোড়া আর তলোয়ার যা পারেনি, সামান্য ধানকল, পাটকল, টাকা ছাপানো কল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন তাই পেরেছে। তারা শুধু উপরতলা ধ্বংস করেনি, সমাজের ভিত পর্যন্ত উপ্‌ড়ে ফেলতে চেয়েছে। তাই তারা শুধু ধ্বংসের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করে আসেনি, নবজীবনের নবজাগরণের প্রভাতী সুরের রেশ তুলেও এসেছে।

তাই এযুগকে আমাদের দেশের 'রিনেস্যান্সের যুগ' অর্থাৎ নবজীবন ও নবজাগৃতির যুগ, আধুনিক যুগের শৈশবকাল বলা হয়। ইয়োরোপের অনুকরণে বলা হয়, কিন্তু আমাদের ইতিহাসের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুবিচার করে বলা হয় না।* চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদিন ইয়োরোপে নবযুগ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল উত্তর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে। এদেশে যেসব যন্ত্রদূত এসে বহু শতাব্দীর গাঢ় নিদ্রা থেকে আমাদের হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল, ইয়োরোপে তাদের জন্ম ও বিকাশ হচ্ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। সামন্ততন্ত্রের জঠরেই তাদের জন্ম এবং সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেই তাদের বিকাশ হয়েছে। সেকথা পরে বলছি। ইয়োরোপের বহু শতাব্দী ধরে যেসব যন্ত্রদূতের জন্ম ও বৃদ্ধি, ইয়োরোপকেও যারা মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিক যুগের আলোবাতাসের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তারাই এদেশের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারা শরীরী 'যন্ত্রী', রীতিমত স্থূল। তারা সূক্ষ্ম অশরীরী 'আদর্শ' নয়। তারা 'টেক্‌নিক্‌স', 'ইডিওলিজ' নয়। মূল 'টেক্‌নোলজি', ফল-ফুল শাখাপ্রশাখা 'ইডিওলজি'। ইয়োরোপের নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ঘটেছিল টেক্‌নোলজিকাল বিপ্লবের জন্য। ইয়োরোপ থেকে 'টেক্‌নোলজি' ও 'ইডিওলজি' দুইই এদেশে আমদানি হয়েছিল। কিন্তু কেবল যদি 'আদর্শ' আসত এবং তার সঙ্গে কল যন্ত্রপাতি স্টীমইঞ্জিন, বাষ্পীয় জাহাজ না আসত, যদি টাকা তৈরির যন্ত্র, ছাপাখানা ও রেলপথ না তৈরি হত, তাহলে আদর্শের সোনার কাঠির স্পর্শেও এদেশের ঘুমন্ত সমাজের ঘুম ভাঙত না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হত আদর্শকে। আদর্শকে এদেশে বসবাস করতে হয়েছে, সেই

*নতুন সংযোজিত 'বাংলার নবজাগরণ একটি অতিকথা' দ্রষ্টব্য। (১৯৭৮)

বাসের বনিয়াদ তৈরি করেছে উন্নত উৎপাদনের হাতিয়ার, নতুন যন্ত্রপাতি, টেক্‌নিক। কত সাধকের কত আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে এদেশে, জড়তার অতল অন্ধকারে কত মহান আদর্শ ডুবে গেছে তার হিসাব নেই। আদর্শের যে স্বতন্ত্র শক্তি নেই বা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা নেই তা নয়। মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সও কোনোদিন তা বলেননি।[৪] ফলফুলের স্বাদ সৌরভ নিশ্চয়ই আছে, তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াও অস্বীকার করা মূর্খতা। কিন্তু ফলফুল শূন্যে ঝোলে না, গাছের ডালে ঝোলে, গাছের শিকড় থাকে মাটির তলায়। এই শিকড়টা হল 'টেক্‌নিক্‌স', বিশেষ অর্থনৈতিক উৎপাদনপদ্ধতি, আর মাটি হল সমাজ। ফল-ফুলের বীজ মাটিতে পড়ে তা থেকে নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে, আরও সজীব আরও সতেজ গাছ। তেমনি বিশেষ টেক্‌নোলজির ভিত্তির উপর যে ইডিওলজির বিকাশ হয়। তারই প্রভাবে, ঘাতপ্রতিঘাতে আবার টেক্‌নোলজিরও উন্নতি হয়। শেষকালে টেক্‌নোলজির এই উন্নতি এমনই এক স্তরে পৌঁছয় যখন পুরাতন খোলস তাকে ছাড়তে হয়, আদর্শবিপ্লব ভাববিপ্লব ঘটে। এইভাবেই মানুষের উৎপাদন-হাতিয়ারের উন্নতি হয়েছে 'উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, তারই ছাঁচে-ঢালা সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের রূপ বদলেছে, আদর্শের প্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই হল মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। অন্যান্য সব ইতিহাস হল কাহিনী রূপকথা গালগল্প অথবা ঘটনাসংকলন, ক্যাটালগ ও ক্রনিকেল মাত্র।

ছোট ছোট যে-সব যন্ত্রপাতির কথা আগে বলেছি তারা কেউ তাই ছোট নয়। ধানকল পাটকল কাপড়কল চেংগিস তৈমুরের চাইতেও শক্তিশালী। প্রেস আর টাইপ আর ট্যাকশাল শংকর-রামানুজ-কবীর-দাদু-নানক-চৈতন্যের ব্যর্থ বাণী ও আদর্শকে রূপান্তরিত করে সার্থক করেছে। রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম ভারতের ব্যবধান ঘুচিয়েছে, গ্রাম্য আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙেছে। নতুন যুগের চৈতন্যের ভাবাদর্শ ঘণ্টায় অন্তত পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারে। চৈতন্য যা পারেননি, বাষ্প ও বিজ্ঞান সহজেই সেই জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য সমাজের বুক থেকে বিলুপ্ত করতে পারবে। আর বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ কেউ যা পারেননি, 'টাকা' তাই পারবে। নবযুগের সুদর্শনচক্র 'টাকা' প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে সমাজের মধ্যযুগীয় শ্রেণীভেদ বংশগৌরব কৌলিন্যবোধ বর্ণবিভেদ সব ভেঙে চুরমার করে দেবে। সুতরাং 'সমাচার দর্পণের' সংবাদ সামান্য সংবাদ নয়, প্রত্যেকটি সংবাদ এক-একটি অসামান্য সংবাদ ও ঘটনা।

যন্ত্রযুগের শৈশবকাল

এদেশে যন্ত্রযুগের শৈশবকালের বৈপ্লবিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে ইয়োরোপের যন্ত্রযুগের শৈশবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। বিশদভাবে আলোচনা না করলেও চলবে, কারণ এ বইয়ের বিষয়বস্তু অন্য। তবু যন্ত্রযুগের শৈশবকালে মূল যে কয়েকটি আবিষ্কারের জন্য বিরাট ভাববিপ্লব ঘটা সম্ভব হয়েছে তাদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সব আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘড়ি ছাপাখানা, যন্ত্রের তৈরি কাগজ ও কাঁচ, মানচিত্র ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই যান্ত্রিক ঘড়ি তৈরি হয় ইয়োরোপে। ইতিমধ্যে অবশ্য গির্জায় ঘণ্টা বাজা শুরু হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে যদিও ঘড়ির ডায়েল কাঁটা ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড কিছুই হয়নি, তাহলেও গির্জায় নিয়মিত ঘণ্টা বাজে, মহাকালের বুক কাঁপে, গির্জাও কাঁপে। ঘড়ির আগমনী গির্জার ঘণ্টাতেই বেজে উঠল, কিন্তু ঘড়ি এল গির্জার মহাকালের কল্পনা ধূলিসাৎ করতে। আধুনিক ঘড়ি ১৩৪৫ সালের মধ্যে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডে সময়কে খণ্ডখণ্ড করে, ডায়েলের উপর কাঁটার সাহায্যে সময়ের ক্ষয়ের হিসাব দিয়ে তৈরি হল। এই ছোট্ট ঘড়িটি হল ভবিষ্যতের বিরাট জটিল যন্ত্রযুগের প্রতিচ্ছবি। এই ঘড়ির ভিতরের কলকব্জার মডেলেই যেন ভবিষ্যতের সমস্ত যন্ত্রপাতি গড়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত সব যন্ত্র যত বিরাট ও জটিল হোক না কেন এই এই ঘড়ির ভিতরের যান্ত্রিক রূপের পরিবর্ধিত রূপ ছাড়া তা আর কিছুই নয়। ক্লক্‌মেকার আর কর্মকারদের সহযোগিতায় পৃথিবীর অধিকাংশ যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, তারাই হল যন্ত্রযুগের প্রথম মেশিনিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার। নানারকমের যন্ত্রপাতির বিচিত্র রূপকল্পনার উৎস হল ঘড়ি।[৫] তাছাড়া যান্ত্রিক ঘড়ি মধ্যযুগের মহাকালের কল্পনাসৌধ সর্বপ্রথম ধূলিসাৎ করে দিল। সনাতন-শাশ্বতের কল্পনা, আদি-অন্তহীন মহাকালের কল্পনা, যার উপর মধ্য-যুগের ধর্ম দেবতা ও ধর্মযাজকের প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাকে চূর্ণ করল ঘড়ি। সময় কূলকিনারাহীন মহাকাল নয়, শাশ্বত আর সনাতনের সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই—এই হল ঘড়ির বাণী, এযুগের বাণী। টিকটিক করে, ঢঙ ঢঙ করে মহাকালের আকাশস্পর্শী মহীরুহকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে চলল ঘড়ি, এযুগের নির্মম কাঠুরে। মহাকালের মহাসমুদ্রের বুকে যে-মানুষের জীবন ছিল বুদ্‌বুদের মতন অর্থহীন, গির্জার গগনচুম্বী গম্বুজের দিকে চেয়ে, মসজিদের মিনার আর মন্দিরের চুড়ো পার হয়ে যে-মানুষের

দৃষ্টি স্বর্গের অসীম শূন্যতায় ঈশ্বরের সন্ধানে মিশে যেত, সেই মানুষের পায়ের তলায় মাটি হয়ে উঠল সত্য, তার জীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে হয়ে উঠল সচেতন। দেবতা নয়, সবার উপরে মানুষ সত্য, এ হল এযুগের ঘড়ির বাণী। মানুষ শুধু সত্য নয়, তার চব্বিশটা ঘণ্টা সত্য, চৌদ্দশ' চল্লিশ মিনিট সত্য, ছিয়াশি হাজার চারশ' সেকেণ্ডও সত্য। তেমনি মানবতার বিরাট আদর্শ শুধু সত্য নয়, তার প্রত্যেকটি মানুষও ঠিক তেমনি সত্য। ঘড়ি অবিরাম এই কথা ঘোষণা করে এল। সময়কেও টুক্‌রো টুক্‌রো করে হিসাব করা যায়, হিসাব করতে হবে। ফিউডাল লর্ড, রাজা মহারাজার মতন বেহিসাবী হয়ে সময়ের অপব্যয় করলে চলবে না: সময়ের মূল্য আছে, টাকার দিক থেকে তো বটেই। ঘড়ি শুধু সমস্ত যন্ত্রের আদর্শ প্রতিচ্ছবি নয়, যন্ত্রযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অগ্রদূত, বাস্তববাদের অগ্রদূত, সময়ের অর্থমূল্যের অগ্রদূত।

কালের ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'স্থান' সম্বন্ধেও ধারণা বদলে গেল। ১৩১৪ সালের হিয়ারফোর্ড মানচিত্র অথবা ১৩৫৬ সালের আন্দ্রিয়া ব্যাংকোর মানচিত্র আজকাল যেকোনো শিশুও আঁকতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর এই প্রথম মানচিত্রগুলির উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের সুস্পষ্ট দূরত্ব-রেখা তখন কলাম্বাসের মতন অনেক দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। সমুদ্রের উপকূল ধরে সাবধানে ভয়ে ভয়ে চলার আর প্রয়োজন নেই। মোটামুটি পৃথিবীটাকে চারকোণের সীমারেখায় বেঁধে ফেলা গেছে, স্থানের হিসাব একটা করা গেছে। ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এখন ভূমণ্ডল বন্দী। সুতরাং অকূল সমুদ্রে নৌকোর পাল তুলে দিয়ে পাড়ি দেওয়া যায়, যে-কোনো অজানা রাজ্যে, বিশাল পৃথিবীর যে-কোনো এক ভূখণ্ডে নৌকা ভিড়বেই। এইভাবে ক্লক্‌মেকাররা শাশ্বত সনাতন মহাকালের কল্পনা এবং কার্টোগ্রাফাররা অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এবিদ্রোহ যন্ত্রযুগের বিদ্রোহ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই ভেনিসের মুরানোতে কাচের বিখ্যাত কারখানা তৈরি হয়ে গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাচ নয়, যন্ত্রযুগের কাচ। এ-কাচের স্বচ্ছতা, প্রতিফলনশক্তি অনেক বেশি। উত্তাল কাচের লেন্‌সের ভিতর দিয়ে দূরের ছোট জিনিস কাছে এবং কাছের জিনিস আরও কাছে অনেক বড় দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে চশ্‌মার প্রচলন হল ইয়োরোপে। ১৬০৫ সালে ডাচ অপ্‌টিশিয়ান জোয়ান লিপ্‌পারশাইম প্রথম দূরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করে গ্যালিলিওর জ্যোতিষী গবেষণার পথ পরিষ্কার করে দিলেন। ১৫৯০ সালে আর একজন ডাচ অপ্‌টিশিয়ান জ্যাকেরিয়াস্‌ জ্যান্‌সেন অনুবীক্ষণযন্ত্র

আবিষ্কার করলেন। দু'জনই অপ্‌টিশিয়ান, একজন বৃহত্তর জগৎ ক্ষুদ্রতর করলেন, আর একজন ক্ষুদ্রতর জগৎ বৃহত্তর করলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের ভিতর দিয়ে নিজের দাঁতের মধ্যে অদ্ভুত সব ক্ষুদ্র দানবদের আবিষ্কার করে ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানী লিউয়েনহুয়েক পৃথিবীর প্রথম ব্যাক্‌টেরিওলজিস্ট হলেন। শুধু পৃথিবী নয়, গ্রহ-উপগ্রহের রাজ্য নয়, অদৃশ্য ব্যাক্‌টেরিয়ার রাজ্য পর্যন্ত কাচের ভিতর দিয়ে মানুষের দৃষ্টিগোচর হল। তাছাড়া চশ্‌মার ভিতর দিয়ে বাইরের বাস্তব জগৎটাও অন্যরকম মনে হল। বার্ধক্যের দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য আর কিছুই অস্পষ্ট মনে হয় না। বার্ধক্যেও পরলোক-দেবলোকের অস্পষ্ট রহস্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হবার প্রয়োজন নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মচেতনা অবসন্ন হবে না। কাচের আরশিও তো এক অদ্ভুত জিনিস। এতদিন নার্সিসাসরা সরোবর ও দীঘির স্বচ্ছ জলে, অথবা অস্বচ্ছ কাচের ভিতরে নিজের যে রূপ দেখেছে তা তো অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা। নিজের সেই অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা রূপ দেখেই তো তারা মুগ্ধ হয়েছে এতদিন? আর এখন? বিখ্যাত ভেনিসিয়ান কাচের আরশিতে নিজের মুখ প্রতিফলিত হবে, কত সুন্দর, অদ্ভুত, কত অতুলনীয়ই না মনে হবে সেই মুখ! ভ্রূ চোখ কপাল নাক ঠোঁটের ভিতর দিয়ে প্রতিভার দীপ্তি ফুটে উঠবে, অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস ও শক্তির বিদ্যুৎ ঝিলিক দেবে। ভেনিসিয়ান আরশির উপর দিয়ে সেই দীপ্তির ঢেউ খেলে যাবে। ঘড়ি এবং ঘড়ির আদলে গড়া যন্ত্রপাতি যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অগ্রদূত হয়, তাহলে ভেনিসিয়ান গ্লাস উগ্র ব্যক্তিসর্বস্বতা ও অহমিকার অগ্রদূত নিশ্চয়ই।[৬]

কাগজ, ব্লক প্রিন্টিং ও ছাপার হরফের জন্ম চীনে। তারপর জাপান কোরিয়া তুরস্ক পারস্য ও মিশরেও আর প্রচলন হয়। আরবরাই চীন থেকে কাগজ তৈরির কৌশল ইয়োরোপে প্রচার করে। ফ্লোরেন্স ও ইটালিতে প্রথমে যন্ত্রে কাগজ তৈরি হয়। জার্মাণিতে ছাপার আধুনিক কলাকৌশলের বিকাশ হয় এবং সেখান থেকে ইয়োরোপে ও সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।[৭] পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গুতেনবার্গ ও তাঁর সহকর্মীরা আধুনিক ছাপাখানা ও টাইপ তৈরি করে ফেলেন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই জার্মানিতে প্রায় হাজারেরও বেশি সাধারণ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ভেনিস ফ্লোরেন্স প্যারিস লণ্ডন সর্বত্রই এই ছাপাখানা গড়ে ওঠে। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটল। শিক্ষা ও জ্ঞান কারও ব্যক্তিগত বা কুলগত সম্পত্তি আর রইল না। মধ্যযুগের ধর্ম ও কুসংস্কারের ভিত্তি যে-অজ্ঞান তার প্রথম যান্ত্রিক শত্রু হল প্রিন্টিং প্রেস। শিক্ষার সর্বজনীন গণতান্ত্রিক

আদর্শ ছাপাখানাই ঘোষণা করল। কার্টার তাই বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে সব চাইতে 'cosmopolitan' ও 'international' আবিষ্কার হল প্রিন্টিং প্রেস।

১০০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যন্ত্রযুগের শৈশবকাল বলা যায়। এই শৈশবকালের মধ্যেই মৌল আবিষ্কারগুলির ব্যাপক প্রসারের ফলে পরে শিল্পবিপ্লব ঘটে। মূল আবিষ্কারের সূত্র ধরে পরে আরও দ্রুতগতিতে অনেক আবিষ্কার হতে থাকে। মানবসভ্যতার এই প্রগতির ধারার যদি একশ' বছরের কোনো মানুষের জীবনের তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হয়, প্রায় ৮৫ বছর তার কিন্দারগার্টেনে কেটেছে, ১০ বছর কেটেছে প্রাইমারী স্কুলে, আর বাকি ৫ বছরের মধ্যে সে অতি দ্রুতগতিতে হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষা শেষ করেছে। যন্ত্রযুগের প্রগতিও ঠিক এই ধারাতে হয়েছে। নবম শতাব্দীতে ঘোড়ার লোহার খুর ও আধুনিক সাজসজ্জা আবিষ্কারের পরে অশ্বচালিত উইণ্ডমিল ওয়াটারমিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘড়ি কম্পাস বারুদ মানচিত্র যান্ত্রিক কাচ দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণযন্ত্র প্রিন্টিং প্রেস প্রভৃতির আবিষ্কার হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে।[৯] তারপর যান্ত্রিক হাতিয়ার (Mechanised tools), শক্তিসঞ্চারের যন্ত্রপাতি (Transmitting Mechanism) এবং বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক (ভবিষ্যতে পারমাণবিক) প্রভৃতি শক্তিচালক যন্ত্রের (Motor Mechanism) ক্রমোন্নতির ফলে যন্ত্রযুগের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।[১০] যে কোনো যন্ত্রকে এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে হাতিয়ারগুলি যান্ত্রিক রূপ পেল, যেমন ছেনি চিম্‌টে হাতুড়ি রেঁদা ইত্যাদি। হাত আগে যে কাজ করত এখন যান্ত্রিক হাতিয়ার সেই কাজ করে, শুধু যন্ত্রটি চালাতে হয় মানুষকে। মানুষের বদলে মূল চালকশক্তি হল ঘোড়া বাষ্প বিদ্যুৎ এবং এই শক্তিকে যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানারকমের হাতিয়ারের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজন হল আরও যন্ত্রপাতির। মূল বা প্রধান চালকশক্তি, যেমন স্টীম ইঞ্জিন, স্টীম টার্বাইন, কেলরিক ইঞ্জিন, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক মেশিন ইত্যাদি। এই মূলশক্তির বিভিন্ন বাহন-যন্ত্র, যেমন ফ্লাই-হুইল শ্যাফ্‌ট পুলি পিনিয়ান স্ট্র্যাপ গিয়ার ইত্যাদি তারপর যান্ত্রিক হাতিয়ার, যেমন ছেনি চিম্‌টে রেঁদা ইত্যাদি। এই তো আধুনিক যন্ত্র, যত জটিলই তার চেহারা হোক না কেন এই হল তার আসল চেহারা।[১১] যন্ত্রের এই জটিলতর ক্রমোন্নতির ফলে শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক যুগের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়েছে।

এই হল 'Profile of Technics', যন্ত্রযুগের রেখাচিত্র বা পার্শ্বচিত্র।[১২]

যন্ত্রযুগের শৈশবকালের মূল যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলির সমাবেশ ও প্রভাব চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্স, যেরকম দেখা যায় ইয়োরোপের আর কোথাও সেরকম দেখা যায় না। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানেই ভূমিষ্ঠ হয় বলা চলে। তাই ইয়োরোপের রিনেস্যান্স বা নবজাগৃতির সূচনা হয় ইটালিতে। কিন্তু ইটালির যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি যখন বন্ধ হয়ে গেল, তার আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও তখন আর বজায় রইল না। ইটালি থেকে জার্মানি হল্যাণ্ড ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অর্থনৈতিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল। ইটালির বণিক ব্যবসায়ী পেরুৎজি, মেডিচির পরিবর্তে জার্মান ধনিক ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার, ফাগার ওয়েলসার হচস্টেটার, হাউগ, ইম্‌হফ প্রভৃতির ধনসম্পত্তি প্রভাবপ্রতিপত্তি অনেক বাড়ল। ধনসম্পত্তির পরিমাণ দেখলেই তা বোঝা যায় :[১৩]

১৩০০ সাল	পেরুৎজি :	৮০০, ০০০ ডলার
১৪৪০ সাল	মেডিচি :	৭,৫০০,০০০ ডলার
১৫৪৬ সাল	ফাগার :	৫০,০০০,০০০ ডলার

ফাগারের যুগে ইটালির ফ্রেস্‌কোবাল্‌ডি, গুয়ালতারত্তি, স্ট্রাংজি প্রমুখ ধনিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও, একাধিপত্য ছিল না। ইটালির অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌গতি শুরু হয়েছিল, তাই সাংস্কৃতিক অবনতির পিচ্ছিল পথে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে ইটালি আবার ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইয়োরোপের নবজাগৃতিকেন্দ্র ইটালি অবনতিকেন্দ্রে পরিণত হলেও, ইয়োরোপের জাগৃতিজোয়ারে ভাঁটা পড়েনি। কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশ ইটালিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। পেরুৎজি-মেডিচির পথে ফাগারদের আবির্ভাব হয়েছে, ফাগারদের পথে জাহারফ-ভাইকার-শ্লাইদার-মর্গান-ফোর্ডদের পূর্ণবিকাশ হয়েছে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়েছে, ধনতন্ত্রের বিকাশের পথও প্রশস্ততর হয়েছে। উদ্‌যোগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাধীনচিন্তা সংস্কারমুক্তি স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শ, ধনতন্ত্র ও যন্ত্রযুগের শৈশবকালের নবজাগৃতির মূলমন্ত্র আরও প্রচণ্ডবেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে, ইয়োরোপ এবং সারা পৃথিবীর বুক আলোড়িত করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অচল অটল ভিত্তিকে চূর্ণ করে, সনাতন শাশ্বত ধর্ম নীতি ও আদর্শের গম্বুজ ধুলিসাৎ করে নবযুগের অভ্যুদয় বৈপ্লবিক। এই নবজাগৃতি ইয়োরোপের নয় শুধু, মানুষের নবজাগৃতি।

টাকা ধর্ম, টাকা স্বর্গ

যন্ত্রযুগের শৈশবকালের মৌল আবিষ্কারগুলির কথা আগে বলেছি। ঘড়ি শাশ্বত মহাকালের কল্পনা চূর্ণ করে জটিলতম যন্ত্রের প্রতিমূর্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। মানচিত্রকরেরা অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চারিদিকের সীমানার মধ্যে বেঁধে ফেলে দিল। অদৃশ্য রহস্যলোক ভেদ করে কাচ ব্যাকটেরিয়া ও গ্রহউপগ্রহের রাজ্যে প্রবেশ করল। ভেনিসিয়ান আরশিতে মুখ দেখে মানুষ নিজেকে দেবদেবীদ চাইতে বেশি সুন্দর, বেশি শক্তিশালী মনে করল। মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের আত্মাভিমান ও সংকীর্ণতা চূর্ণ করে সর্বজনীন শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের বাণী নিয়ে এল প্রিন্টিং প্রেস। তারপর বাষ্পীয়শক্তি হাজার হাজার ঘোড়ার শক্তি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করে প্রমাণ করে দিল ভগবান সর্বশক্তিমান নয় সর্বশক্তিমান মানুষ। দূরত্ব জয় করার, ব্যবধান চূর্ণ করার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ পেল শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে। লেওনার্দো পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুধু যে যন্ত্রবিদ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন তা নয়, আকাশপথে উড়ে যাওয়ার জন্য এরোপ্লেনও নক্‌শা করেছিলেন। লেওনার্দো কেন, যুগ যুগ ধরে মানুষ এই দূরত্ব জয় করতে চেয়েছে, স্থানকালের ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে, পাখির মতন ডানা মেলে উড়তে চেয়েছে আকাশে, ক্ষিপ্রগতি হরিণের মতন, ঘোড়ার মতন ছুটতে চেয়েছে মাটিতে। তার ব্যর্থ কল্পনা রূপকথা রচনা করেছে। জিন পরী দৈত্য দানব রাজকুমাররা ডানা মেলে আকাশে উড়েছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটেছে, এক এক পদক্ষেপে সাত সাত ক্রোশ পথ। রেলপথে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, রাজপথে মোটর, আকাশপথে বিমান মানুষের সেই দূরত্ব-জয়ের বাসনাকে আজ বাস্তবে রূপায়িত করেছে। রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ মধ্যযুগের অলিগলির সংকীর্ণতা, মধ্যযুগের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে দিয়েছে। 'মনো-মারুতগামিনী' 'সর্ববাতসহা যন্ত্রযুক্তা নৌকা', 'পুষ্পকযান' আজ বাস্তব সত্য, মধ্যযুগের ব্যর্থ কামনার প্রতীক নয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে, দেশ দেশান্তরে বাষ্পীয় ট্রেন যে ব্যবধান ঘুচিয়েছে, শহরে-নগরে মোটর আরও দ্রুতগতিতে তাকে সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু এ হল পরের কথা। নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে মুদ্রা। মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতিই নবযুগের সমাজের বনিয়াদ। যা কিছু হচ্ছে, যত উদ্যম, যত প্রেরণা গবেষণা আবিষ্কার সবই এই মুদ্রার। মোহে। এ-মুদ্রা মধযুগের মুদ্রা নয়, রঙ-বেরঙের বাহারে মুদ্রা নয়, ফিউডাল লর্ড, রাজা মহারাজার প্রতাপ জাহির করাই তার উদ্দেশ্য নয়। মধ্যযুগের

মুদ্রার নড়াচড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, লর্ডদের মতন মুদ্রাও ছিল আরামপ্রিয় অলস ও বিলাসী। মুদ্রার চাইতে জিনিসপত্তরই নড়েচড়ে বেড়াত বেশি। প্রয়োজনীয় জিনিসের বদলে জিনিস পেলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলত, মুদ্রার প্রয়োজন হত সামান্য। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগে মুদ্রার রূপান্তর ঘটল। ছোট 'চাকৃতি' হলে কি হবে? সেই চাকৃতির ঘুরপাক খাওয়ার (Circulation) যে প্রচণ্ড শক্তি তা আর কোনো মুদ্রার কোনকালেই ছিল না। সেকালের মুদ্রার আলস্যে দিন কাটানো চলত, ধামা কলসি হাড়ি সিন্দুকের মধ্যে ডানা গুটিয়ে কুম্ভকর্ণের মতন ঘুম দিলেও তার ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একালের মুদ্রার আলস্যে দিন কাটানো চলে না। অলস হয়ে থাকলেই মুদ্রার আর কোনো মূল্য থাকে না। এ-যুগের ব্যাঙ্কে গিয়ে মুদ্রা যখন জমা হয় তখন সে ব্যাঙ্কের সিন্দুকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না। লোহার সিন্দুক ভেদ করে মুদ্রা বাইরের জগতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়, তবেই সে আরও মুদ্রা প্রসব করে, ব্যাঙ্কাররা সুদ দেয়। ধনতান্ত্রিক মুদ্রা তাই সচল সজীব গতিশীল। প্রয়োজন মতন তার গতি কমানো-বাড়ানো যায়, ঠিক যন্ত্রের মতন। তার জন্য অর্থনীতিবিদ্‌দের কত ফরম্যুলা আছে, যন্ত্রবিদ্‌দের যেমন যন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আছে। নতুন যন্ত্রযুগের সচলতা সক্রিয়তা ও প্রচণ্ড গতিশীলতার আদর্শ প্রতিমূর্তি হল মুদ্রা, টাকা (সিমেল)।[১৪]

টাকা ধনতান্ত্রিক যুগের ধর্ম, টাকাই স্বর্গ। সবার উপরে টাকাই সত্য। টাকা শুধু গতিশীল নয়, টাকা সৃষ্টিশীল (Creative)। টাকার গতিশীলতার উপর টাকার সৃষ্টিশীলতা নির্ভর করে। সেকালের 'সঞ্চিত ধন' একালের 'মূলধনের' মতন সৃষ্টিশীল ছিল না। ধনতান্ত্রিক যুগে 'ক্যাপিটাল' হল 'ক্রিয়েটিভ'। বিশাল প্রাসাদ অট্টালিকা প্রমোদ-উদ্যান আর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এযুগে সঞ্চিত ধনের কবর দেওয়া হয় না। প্রাসাদ অট্টালিকা যে এযুগে নেই তা নয়, ধনিক পুঁজিপতিরা যে তা তৈরি করেননি তাও নয়। কিন্তু টাকার প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। টাকার প্রধান ও মহান উদ্দেশ্য হল, কারখানা থেকে কারখানায়, শ্রমশিল্প থেকে শ্রমশিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক থেকে শত শত বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানে ঘুরপাক দিয়ে বেড়ানো এবং অনবরত বংশবৃদ্ধি করা। টাকার অভিযানের অন্ত নেই। যত বেশি চলবে, যত বেশি ঘুরবে তত বেশি টাকার সৃষ্টিশক্তি বাড়বে। নর্তকী বাইজীর নাচের জন্য সেকালের রাজা মহারাজারা অনর্গল টাকা খরচ করতেন। একালের পুঁজিপতিদের সেই বেহিসাবী ব্যয়ের প্রয়োজনই নেই। সবই এযুগে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত

হয়েছে। টাকা নিজে রূপান্তরিত হয়ে সকলকেই রূপান্তরিত করেছে। মানুষও হয়েছে বেচাকেনার পণ্য, মুনাফার শিকার। মধ্যযুগের নর্তকী প্রমোদকানন ছেড়ে এযুগের বাণিজ্যকেন্দ্র শহরে বাস করছে, এখন তার দেহ মন সবই পণ্য, সবই "সৃষ্টিশীল মূলধন"। ধনতান্ত্রিক যুগের টাকার প্রজননশক্তি এত প্রচণ্ড, তার সৃষ্টিশক্তি এতই প্রবল যে নারীর প্রজননশক্তিকে ধ্বংস করে তার এক বিরাট অংশকে সে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত করেছে।*

কার্ল মার্ক্স তাই বলেছেন, এযুগের মুদ্রার ঘূর্ণাবর্তে যা পড়বে তাই সোনা হবে। সেকালের কোনো মুনিঋষির হাড়ে এরকম ভেল্‌কি খেলত না।[১৫] মুদ্রাকে মার্ক্স 'radical leveller' বলেছেন। একদিক থেকে বিচার করলে, মৃত্যুর চাইতেও শক্তিশালী 'লেভেলার' টাকাকে নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু কোন্ দিক থেকে? টাকা চূর্ণ করেছে মধ্যযুগের রক্তের দম্ভ, কুলকৌলীন্যের ব্যবধান। যন্ত্রযুগে বংশগৌরব কুলমর্যাদা কিছু নেই। বংশানুক্রমিক পেশাগত শ্রেণীভেদও টাকা ভেঙে দিয়েছে। তার বদলে টাকা নিজের কৌলীন্য সগৌরবে হাজির করেছে। টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম তো নিশ্চয়ই, তুক্‌তাক ঝাড়ফুঁক স্তোত্রমন্ত্র সবই 'টাকা টাকা টাকা'। তাছাড়া টাকাই বংশ, টাকাই গোত্র, টাকাই শ্রেণী। নতুন যে শ্রেণীবিন্যাস হল সমাজে সে হল টাকার বিন্যাস। সবার চাইতে বড় কুলীন টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা। রক্তের প্রবাহের মতন যখন টাকারও বৈশিষ্ট্য হল তার প্রবাহ, তখন 'রক্ত' হল 'টাকা', সমাজের শিরা-উপশিরায় টাকারই প্রবাহ ছুটে চলল। ধনতান্ত্রিক সমাজের রক্তপ্রবাহ টাকা।*

'টিক্-টিক্-টক্-টক্ করে ঘড়ি বলল: "শাশ্বত মহাকালকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাট্‌ছি। প্রত্যেকটা সেকেণ্ড, প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা টিক্‌টিকানির মূল্য আছে।' প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে টাকা বলল: 'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা বংশ, টাকা গোত্র, টাকাই জপতপধ্যান। ঘড়ির টিক-টিকানির সঙ্গে টাকা-টাকা করে জপ করো। হিসাব করে প্রতি সেকেণ্ডে টাকা পয়দা করো, টাকার গতি বাড়িয়ে দাও। সময়ের যে মূল্য, যে হিসাব, সে হল টাকার মূল্য, টাকার হিসাব।' মধ্যযুগ ছাড়িয়ে যন্ত্রযুগ ও ধনিকযুগের প্রবেশদ্বারের সামনে বড় বড় হরফে লেখা হল :

* সৃষ্টিশীল মূলধন ও টাকার যুগ থেকে 'সৃষ্টিশীল সাহিত্য-শিল্পের' উদ্‌ভব হল। (১৯৭৮)

* লেখকের 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' গ্রন্থ (১৯৭৮) দ্রষ্টব্য।

TIME IS MONEY

প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেবদেবী, স্বর্গ-নরক, জিন পরী দৈত্য দানব ভূতপ্রেত পিশাচদের নিয়ে অনন্ত অসীম রহস্যময় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যে শাশ্বত সনাতন মহাকাল, তা যন্ত্রযুগে, ধনতান্ত্রিক যুগে তালগোল পাকিয়ে কুঁচকে এই ছোট্ট 'টাইম ইজ মনি' কথাটির মধ্যে নবরূপান্তর লাভ করেছে। এখন আর মিনার গম্বুজ বা অনন্ত আকাশের দিয়ে চেয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললে হবে না, 'হে ঈশ্বর!' এখন বলতে হবে, 'হে হিসাবের খাতা! হে লেজার!' এখন আর ভক্তি নয়, আবেগের চাপে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা যাওয়া নয়, ভাবালুতা নয়। এখন জমা খরচের লাভলোকসানের কড়ায়গণ্ডায় হিসাব, বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণ বাণবিদ্ধ নির্মম নিষ্ঠুর যুক্তি। আবেগ-ভক্তির স্যাঁতসেঁতে রহস্যলোক পার হয়ে ধনতান্ত্রিক যুগ বুদ্ধি ও যুক্তির বিশাল শুক্‌নো খট্‌খটে প্রান্তরে পা দিয়েছে। 'সময় আর টাকার' মতন 'টাকা আর বুদ্ধি', টাকা আর যুক্তি' এক হয়ে মিশে গেছে। এই বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান টাকার অভিযানের মতনই যুগান্তকারী।

বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান

এতদিন 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভার' কোনো বালাই ছিল না। মধ্যযুগের সমাজের মতন পাণ্ডিত্য প্রতিভা সবই অচল অলস ছিল। অধমের অবশ্য তাতে কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু যাঁদের অধিকার ছিল তাঁরা সংঘ কুল শ্রেণী বা 'গিল্ডের' মধ্যে সকলে তা সমানভাবে বণ্টন করে নিতেন। প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে হঠাৎ জ্যোতিষ্কের মতন কারও উদয় হত না। যন্ত্রযুগে ঘড়ি যেমন প্রতি সেকেণ্ডকেও সশব্দে ঘোষণা করল, টাকা যেমন হল গতিশীল ও সৃষ্টিশীল, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি শিল্পকলা সব কিছুর উপর 'প্রতিভার' ছাপ পড়ল। 'প্রতিভা' বা 'জিনিয়াস' কথার জন্ম হল বুর্জোয়াযুগে।[১৬] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টাকা যেমন স্রষ্টা, 'ক্যাপিটাল' যেমন 'ক্রিয়েটিভ', তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকলেই স্রষ্টা, সকলেই 'ক্রিয়েটিভ্'।* কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের শৈশবকালে এই

* বুর্জোয়াযুগ বা ধনতান্ত্রিক যুগের শ্রমভেদের ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রেও বিভেদ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে এই বিভেদ প্রকট হয়ে উঠে যে গভীর সংস্কৃতিসংকট সৃষ্টি করেছে, ধনতান্ত্রিক যুগের শৈশবকালে তা করেনি। তখন শিল্পীরা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়াররাও শিল্পী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমভেদ যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও 'ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস'-দের কৌলীন্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তেমনি বিকট মূর্তি ধারণ

সৃষ্টিশক্তির চেতনা সুস্থ চেতনা ছিল। কর্মী ও শিল্পীর মধ্যে তখনও ব্যবধানের প্রাচীর ওঠেনি। ধনতান্ত্রিক যুগের যখন বিকার ও সংকট দেখা দিয়েছে, যখন সমস্ত সমাজ 'পাগলা গারদে' পরিণত হয়েছে, তখন 'জিনিয়াসের' স্বাতন্ত্র্যবোধও উগ্র হয়ে উঠেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'লুনাসি' হয়েছে 'জিনিয়াসের' নামান্তর, 'পাগলামি' ও 'প্রতিভা' এক হয়ে মিশে গেছে। কিন্তু মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকে ধনতন্ত্র যখন প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, যন্ত্রযুগ ও বৈজ্ঞানিক যুগের যখন আবির্ভাব হল তখন তার সৃষ্টির প্রেরণার প্রাবল্য ছিল, তার বুদ্ধির ও যুক্তির অভিযানের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। এই বুদ্ধি ও যুক্তির দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যই জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার খুলে গেছে, বিজ্ঞান ও গতিশীল বাস্তব জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছে।

ঘড়ি ছাপাখানা কামান বারুদ কম্পাস মানচিত্র যন্ত্র এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। দূরবীক্ষণযন্ত্রের অপূর্ব কাচের ভিতর দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। অনুবীক্ষণযন্ত্র ক্ষুদ্রতম রহস্যলোককে অনাবৃত

করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি কবি, গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিক তিনি 'ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস', আর যিনি ঐতিহাসিক, সমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী বা গবেষক তিনি 'প্রডাক্‌টিভ লেবারার'। যিনি ষ্টুডিওতে ছবি আঁকেন, পাথরের মূর্তি গড়েন, তিনি 'জিনিয়াস', যিনি বাড়িঘর নির্মাণ করেন, নগরপরিকল্পনা করেন তিনি 'ফিল্ড লেবারার'। যিনি ল্যাবরেটরীতে বন্দী হয়ে অধীত বিজ্ঞানের গবেষণা করেন তিনি 'জিনিয়াস', যিনি যন্ত্রের নক্‌শা করেন, ইঞ্জিনিয়ার, তিনি 'মজুর' মাত্র। এই যে বিকট বৈষম্য, এ হল বিকৃত বুর্জোয়াযুগের দান। কল্পনার ঐশ্বর্য এবং সেই কল্পনাকে রূপ দেবার শক্তি যদি 'প্রাতভার' বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে কবি বা ঔপন্যাসিকের চেয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর কল্পনাশক্তি কম নয়, বরং বেশি। 'ইমেজ' ও ঘটনাকে কবি ঔপন্যাসিক যেমন চোলাই করে তাকে সাহিত্যিক রূপ দেন, ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরাও তেমনি প্রচুর উপাদান চোলাই করে তাকে সাহিত্যিক রূপ দেন। যিনি বিরাট একটি নগরের পরিকল্পনা করেন তিনি ষ্টুডিওবন্দী ভাস্কর বা শিল্পীর চেয়ে কম 'প্রতিভাশালী' কিসে? যে মিস্ত্রী একটা নীরেট কাষ্ঠখণ্ড থেকে সুন্দর একটা কাঠের জিনিস তৈরি করেন তিনি কি শিল্পী নন? যিনি যন্ত্রের ডিজাইন করেন, বিরাট জটিল যন্ত্রের মধ্যে যাঁর সমস্ত কল্পনা মূর্ত হয়ে ওঠে তিনি 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞানীর চেয়ে কম শক্তিশালী কিসে? এই বিভেদ ও বৈষম্য, এই 'fantastic nonsense' উদীয়মান গতিশীল বুর্জোয়াযুগের দান নয়, অস্তগামী বিকৃত ধনতান্ত্রিক যুগের দান। একশ্রেণীর তথাকথিত মার্কসবাদীদের (লেখকের মতে) মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে 'জিনিয়াসের' একাধিপত্য স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ণতা সম্পূর্ণ অর্থহীন 'নন্‌সেন্স'। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স তাঁদের রচনাবলীর নানাস্থানে এই বিভেদের কারণ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন। মার্কসবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত শিল্পী Eric Gill-এর *Work & Property* এবং *Sacred & Secular* বই দু'খানি পড়তে পারেন। (১৯৪৮)

ও আলোকিত করেছে। কলাম্বাস অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন নির্ভয়ে, তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে নতুন জগৎ তিনি আবিষ্কার করবেন। বিশ্বের সীমানা তো মানচিত্রেই ধরা পড়েছে। নতুন জগৎ, সোনার জগৎ কলাম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্রান্সিস বেকনও (১৫৬১-১৬২৬ খ্রী) তাই দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করলেন নতুন জ্ঞানরাজ্যের সন্ধানে। মধ্যযুগের কূলকিনারাহীন অজ্ঞান ও কুসংস্কারের মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে বেকন নির্ভয়ে পাড়ি দিলেন যুক্তির নৌকায় বুদ্ধির পাল তুলে দিয়ে। বেকন লিখলেন, 'Advancement of Learning' (১৬০৫) 'New Methodology' (১৬২০) 'New Atlantis' (১৬২৫)। 'নিউ মেথডলজি' বেকনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আশ্চর্য! 'নিউ মেথডলজি' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের উপর পর্যন্ত জ্ঞানরাজ্যের কলাম্বাস বেকনের অনুসন্ধানী মনের ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে পাল তুলে দিয়ে একটি জাহাজ চলেছে, পুরাতন জগতের সীমানা হার্‌কিউলিসের স্তম্ভ দুটি পার হয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে নতুন জ্ঞানজগতের সন্ধানে। পরিষ্কার বোঝা যায়, বেকনের লক্ষ্য হল নতুন জ্ঞানজগতের কলাম্বাস হওয়া। এই গ্রন্থের গোড়াতে বেকন নিজেই স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন: 'নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের স্থির বিশ্বাস নিয়ে এবং সেই বিশ্বাসের সমর্থনে তাঁর যুক্তি দিয়ে কলাম্বাস যেমন অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে অভিযান করেছিলেন, আমিও সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে এইসব বিষয় সম্বন্ধে আমার মতামত ও যুক্তি লিপিবদ্ধ করছি'।

নতুন জ্ঞানজগতের কলাম্বাস বেকন বললেন: কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণই হবে বিজ্ঞানীর প্রথম কর্তব্য। কিন্তু মনের অবস্থা ঠিক ভাঙা আরশির মতন হয়ে আছে। সেখানে যা কিছু প্রতিফলিত হয় তার আসল রূপের বদলে বিকৃত রূপটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেইটাই মনে হয় সত্য। মনের আরশিটা এইভাবে ভেঙে রয়েছে কতকগুলি কুসংস্কারের ভারে। এই কুসংস্কারগুলিকে বেকন 'idols' বা 'ভূত' বলেছেন।* ভূতগুলির মধ্যে চারশ্রেণীর ভূতের দৌরাত্ম্যই মারাত্মক:

জাতের ভূত (Idols of the Tribe)	মানবজাতির কতকগুলি সাধারণ সংস্কার আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, যা ভাল লাগে তাই সত্য বলে বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি। এ হল 'জাতের ভূত'।

* Idols-এর বাংলা 'ভূত' না হলেও এখানে 'ভূত' কথাটা যুৎসই বলেই আমি ব্যবহার করেছি। (১৯৪৮)

গুহার ভূত (Idols of the Cave)	প্রত্যেক ব্যক্তির কতকগুলি নিজস্ব সংস্কার আছে, কিছুতেই তা সে ছাড়তে চায় না। এগুলি 'গুহার ভূত'।
বাজারের ভূত (Idols of the Market-place)	ভাষাগত কতকগুলি সংস্কার আছে যা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। ভাবের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে কতকগুলি 'শব্দ' ও 'নামের' সৃষ্টি হয়। মানুষ মনে করে নামগুলির সঙ্গে বাস্তব অস্তিত্বেরও সম্পর্ক আছে। যেমন দৈব অদৃষ্ট ভাগ্য ভূত ইত্যাদি। এগুলি 'বাজারের ভূত'।
রঙ্গমঞ্চের ভূত (Idols of the Theatre)	এগুলি হ'ল 'বিশেষ চিন্তাধারার' সংস্কার। বেকন বেশ জোর দিয়ে বলেছেন : 'আমার মতে, পৃথিবীতে যেসব দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়েছে সেগুলি রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের মতন। নানারকমের অবাস্তব দৃশ্যপট দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দার্শনিকরা তাঁদের নিজস্ব মনগড়া জগতের অভিনয় করে গেছেন মাত্র'। তাই এই দার্শনিক মতামতগুলি 'রঙ্গমঞ্চের ভূত।'

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে বেকন 'নিউ মেথডলজি' লিখেছিলেন। জানি না, আজ পর্যন্ত আর কেউ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তা দৃষ্টি ও যুক্তি সম্বন্ধে আর কিছু নতুন কথা বলতে পেরেছেন কিনা। যে চার রকমের সংস্কার বা ভূতের কথা বেকন বলেছেন তাদের কবল থেকে মানুষের মুক্তি কি আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে? হয়নি, কারণ বিজ্ঞানের আলোক আজও অনেক দেশে, অনেক মানুষের মনে পৌঁছয়নি। দেশ হিসাবে বিচার করলে, জাতের ভূত, গুহার ভূত ও বাজারের ভূতের দৌরাত্ম্য থেকে যারা মুক্ত হয়েছে, রঙ্গমঞ্চের ভূত হয়ত তাদের স্কন্ধে ভর করে বসে আছে। আর মানুষ হিসাবে ক'জন মানুষ যে এই বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে চার রকমের ভূতের কবল থেকেই মুক্ত হয়েছে, তা বোধহয় গুণে ফেলা যায়। তা যাক। পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সংকট ও বিকৃতির কথা মনে করে বেকন

'নিউ মেথডলজি' লেখেননি। বৈজ্ঞানিক যুগের দিগন্তবিস্তৃত সোনালি ভবিষ্যতের খস্‌ড়া করে গেছেন তিনি। বেকনই নতুন বৈজ্ঞানিক জগতের কলাম্বাস। তারপর সেই জগতে অনেকে অনেক মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন, তাতে বেকনের 'আবিষ্কারের' মূল্য কমেনি।

শুধু বৈজ্ঞানিক জগতের সন্ধান দিয়েই বেকন নিশ্চিন্ত হননি, আদর্শ বৈজ্ঞানিক সমাজের চিত্রও তিনি এঁকে গেছেন 'নিউ অ্যাটলান্টিসের' মধ্যে।[১৭] প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অজানা দ্বীপ বেনসালেমে তিনি নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজ কল্পনায় গড়ে তুললেন। বাইরের অসভ্য লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু সেই দ্বীপের কর্মীদের বাইরের জগতে তথ্যের সন্ধানে যেতে বাধা নেই। এই দ্বীপে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার বেকন তৈরি করলেন তার নাম 'সলোমন হাউস'। এই সলোমন হাউসের মধ্যে দু'টি সুদীর্ঘ গ্যালারি। সেখানে নতুন জগতের আবিষ্কর্তা কলাম্বাস থেকে আরম্ভ করে নানারকমের যন্ত্র ছাপাখানা কাচ কাগজ ধাতু শিল্পকলা ইত্যাদির আবিষ্কর্তাদের প্রস্তরমূর্তি সাজানো। এ যেন এযুগের 'রকফেলার ইন্‌স্টিটিউট' আর 'ডয়েট্‌সে মিউজিয়ম'।[১৮] বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য ব্রিটিশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিক অ্যাসোসিয়েশনগুলি তো অনেকটা এই পরিকল্পনা অনুসারেই গড়ে উঠেছে।[১৯] বেকনের আগে ফ্লোরেন্সে অবশ্য ১৪৩৮ সালেই মেডিচি প্রথম নতুন যুগের 'অ্যাকাডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র কেপ্‌লার ছাড়া পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর (গোড়ার দিকে) বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই হয় ইটালিয়ান ছিলেন, না হয় ইটালিতেই শিক্ষা পেয়েছিলেন। ১৬০১ সালে রোমে 'Accademia dei Lincei' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালি তখন নতুন ধনতান্ত্রিক যুগ, যন্ত্রযুগ ও বৈজ্ঞানিক যুগের কেন্দ্র, নবজাগৃতিকেন্দ্র। কিন্তু আগেই বলেছি, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইটালির অর্থনৈতিক প্রাধান্য কমে যায়, পেরুজি ও মেডিচিদের বদলে ফাগারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়োরোপের অন্যান্য কেন্দ্রে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের বিকাশ হতে থাকে। তখনই বেকন এই 'সলোমন হাউসের' পরিকল্পনা করেন। তারপর ১৬৪৫ সালে ইংলণ্ডে যে 'অদৃশ্য গোপন কলেজ' স্থাপিত হয়, তাকেই 'রয়াল সোসাইটি' নাম দেওয়া হয়েছে পরে। ১৬৩১ সালে প্যারিসের Etienne Pascal-এর Salon-কেই পরে ১৬৬৬ সালে 'রয়াল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্স' নাম দেওয়া হয়। এই সব সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি কি বেকনের 'সলোমন হাউসের' পরিকল্পনা অনুসারেই গড়ে ওঠেনি?[২০]

শাস্ত্র ধর্ম দেশাচার জনশ্রুতি এবং নানারকমের কুসংস্কারের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ গবেষণা ও পরীক্ষার পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। বেকনের এই পথ ধরেই হব্‌স (Hobbes) ও লক্ (Locke) আরও অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। বেকনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে লক্ বাস্তব দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। লক্ বললেন, যে-জ্ঞান ইন্দ্রিয়গোচর নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তা সত্য নয়, জ্ঞানই নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে ইন্দ্রিয়ের অগোচর যা তা জানবার শক্তি মানুষের নেই। বস্তুবাদ দৃঢ়পদে বেকন থেকে হব্‌স্, হব্‌স্ থেকে লক্ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ফ্রান্সে দেকার্ত (Rene Descartes) বস্তুবাদের এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মধ্যযুগের সমস্ত কুসংস্কার ধর্মবিশ্বাস ও দেশাচারের বিরুদ্ধে দেকার্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং স্বাধীনচিন্তা যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে প্রচার করলেন। ইংলণ্ড থেকে বেকনের ভাবধারার সঙ্গে ফ্রান্সের দেকার্তের ভাবধারার মিলনের ফলে 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদের' উৎপত্তি হল।[২১] তারপর শুরু হল মধ্যযুগের আদর্শবাদের ধ্বংসাবশেষের বিরুদ্ধে শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্‌রা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এঁদের মধ্যে ভল্‌টেয়ার দিদেরো হেল্‌ভেটিয়াস দ্যালেম্বার্ট হলবাখ কণ্ডেয়াক রুসো ও ভল্‌নির নাম স্মরণীয়। এঁরা এক 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' গ্রন্থ প্রচার করলেন, দিদেরো ও দ্যালেম্বার্ট সেই গ্রন্থ সম্পাদনা করলেন। কুসংস্কার ও অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে মানুষকে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করাই হল এঁদের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সার্থক হল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। মার্কস-এঙ্গেল্‌সও তা স্বীকার করেছেন। এঙ্গেল্‌স বলেছেন, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চলেছে, তার মধ্যে তিনটি সংগ্রামই প্রধান : জার্মানির প্রটেস্ট্যাণ্ট রিফর্মেশন, ১৬৪০ ও ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব। এই তিনটি পর্যায়ের সংগ্রামের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবই সব চাইতে সার্থক বিপ্লব, চূড়ান্ত সংগ্রাম। একমাত্র ফরাসী বিপ্লবেই ধর্মের কোনো মুখোস পরতে হয়নি বিদ্রোহীদের। পরিষ্কার প্রশস্ত রাজনৈতিক পথের উপর দাঁড়িয়ে, ধর্মের সমস্ত মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মধ্যযুগের অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, এবং সেই সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক যুগের শৈশবে বুদ্ধি ও যুক্তির যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা সার্থক

হল তাঁর বয়ঃসন্ধিক্ষণে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীর মধ্যে।

তারপরের ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন নেই এখানে। বাংলার তথা সারা ভারতের নবজাগৃতির উৎস-সন্ধান এখানেই শেষ করা যেতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের 'Liberte, Egalite, Fraternite'র মহান আদর্শ 'Infantry, Cavalry, Artillery'র আদর্শে পরিণত হয়েছে।[২২] কারণ ধনতান্ত্রিক যুগের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা বদলেছে। যতদিন বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যতদিন তারা শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ হয়নি, ততদিন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের বিরোধও তীব্রতর হয়নি, স্পষ্টতর হয়নি। তা যখন হল তখন বুর্জোয়াশ্রেণী দেখল, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যেসব হাতিয়ার নিয়ে তারা সংগ্রাম করেছে সেই সব হাতিয়ার তাদের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়েছে। যে সর্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও স্বাধিকারের আদর্শ তারা প্রচার করেছে, প্রবর্তন করেছে, সেই আদর্শ এখন তাদেরই আধিপত্যকে ধূলিসাৎ করতে চাইছে। তাদের অগ্রগতির 'মূলমন্ত্র' যে স্বাধীনচিন্তা যুক্তি বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, তাই এখন 'সোশ্যালিস্টিক' হয়ে উঠেছে।[২৩] সোশ্যালিজমের বিকাশ হচ্ছে সেই স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে, সেই যুক্তি ও বুদ্ধির অবিশ্রান্ত অভিযানের পথে, বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বলতর হয়ে। তাই তো বুর্জোয়াশ্রেণীকে আবার, মার্ক্‌সের ভাষায়, সমাজের 'all the elements of that vague, dissolute, down-at-heels and out-at-elbows rabble' দলবদ্ধ করতে হচ্ছে। মধ্যযুগের আবর্জনাস্তূপ ঘেঁটে আবার তাকে ধর্ম শাস্ত্র অধ্যাত্মবাদ যাদুমন্ত্র কুসংস্কার জড়তা গোঁড়ামি সংকীর্ণতা স্বেচ্ছাচারিতা, সবই কুড়িয়েবাড়িয়ে জড়ো করতে হচ্ছে,[২৪] সঙ্গে সঙ্গে 'লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটার্নিটির' বদলে 'ইনফ্যান্ট্রি ক্যাভালরি আর্টিলারির' মহত্ত্বও প্রচার করতে হচ্ছে, কারণ 'সোশ্যালিজমের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে তাদের। কিন্তু এ হল আধুনিক ইতিহাস, ব্যাধিগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক যুগের সংকট এবং সংস্কৃতিসংকটের ইতিহাস। এখানে সেই ইতিহাস আমরা আলোচনা করছি না। নবযুগের নবজাগৃতির মূলমন্ত্র কি তা আমরা আলোচনা করেছি। সেই মূলমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই বাংলার নবজাগৃতি-আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে।

'সমাচার দর্পণে'র সংবাদগুলি কেন সাধারণ সংবাদ নয়, জাতীয় সংবাদ, ঐতিহাসিক ঘটনা, তা নিশ্চয়ই এই আলোচনার পরে পরিষ্কার বোঝা যাবে। খানকল পাটকল, একরকমের টাকা পয়সা, ছাপাখানা, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথ—এগুলি হল এদেশের নবজাগৃতির প্রথম দূত। আগে যে ঘড়ি ও ভেনিসিয়ান কাচের কথা বলেছি, যে দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণযন্ত্রের কথা বলেছি, তাও নিশ্চয়ই এদেশে আগে ছিল না। আর্য্যরা বা মুসলমানরা এই অর্থনৈতিক এজেন্টদের এদেশে নিয়ে আসতে পারেননি। এদেশের মাটিতে এদের উৎপত্তিও হয়নি। ইংরেজরা আসার পরে এই অর্থনৈতিক এজেন্টরা এদেশে এসেছে। এই অর্থনৈতিক এজেন্টরাই নবজাগৃতির অগ্রদূত। এই সব কলকারখানা, কোম্পানির টাকা পয়সা, বাষ্পীয় জাহাজ, রেলপথ সর্বপ্রথম এদেশের স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় আঘাত করে ভাঙতে আরম্ভ করে। শাশ্বত সনাতন মহাকালের গগনচুম্বী গম্বুজ এই বিপ্লবী অর্থনৈতিক দূতরাই ধূলিসাৎ করেছে। এদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সর্বজনীনতা আত্মবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যুক্তির এরাই আদিগুরু। শাস্ত্র কুসংস্কার দেশাচার ও জনশ্রুতির বিরুদ্ধে এরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রামমোহন, দ্বারকানাথ, 'ইয়ং বেঙ্গলের' নেতৃবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, সকলের সংগ্রামের পথ এই বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক এজেন্টরাই পরিষ্কার করে দিয়েছে। কলকারখানা, বাষ্পীয় শক্তি, সচল মুদ্রা এবং প্রিন্টিং প্রেস যদি না থাকত, তাহলে রামমোহন-'ইয়ং বেঙ্গল'-বিদ্যাসাগর সকলের সমস্ত আন্দোলন ও আদর্শবাদ কবীর-দাদূ-চৈতন্যের মতন শূন্যে মিলিয়ে যেত। বলিষ্ঠতা উদারতা প্রগতিশীলতা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, কোনো কিছুরই বিকাশ হত না এঁদের চরিত্রে। তাই বলে কলকারখানা বাষ্পীয়শক্তি মুদ্রা ও প্রিন্টিং প্রেসের যান্ত্রিক সৃষ্টি এঁরা নন। যন্ত্র এঁদের চলার পথের আগাছা কেটে সাফ করেছে। নতুন অর্থ-নৈতিক শক্তি সমাজের জড়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মূলে আঘাত করেছে। তাই এঁদের চলার বেগ প্রচণ্ড হয়েছে এবং সেই চলার পথে এঁরাও আবার সেই অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করেছেন। এই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতির ধারা। বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয়ের ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার জন্যই এই প্রবাহের বিশেষ জোয়ার-ভাঁটা এই বাংলাদেশেই সম্ভব হয়েছে এবং সেই জোয়ার-ভাঁটা উত্থান-পতনের তরঙ্গ-বিক্ষোভের প্রধানকেন্দ্র হয়েছে কলিকাতা মহানগর। কারণ নতুন যুগ নগরকেন্দ্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক নয়।

বাংলার নবজাগৃতির প্রথম যুগে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি। এখানেও নবজাগৃতির ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। 'প্রতিভার' বিকাশ যদিও এযুগেই সম্ভব হয়েছে, তাহলেও ঐতিহাসিক নিয়মেই নবযুগের গোড়াতে সেই বুদ্ধি ও সৃষ্টির প্রতিভা এবং কর্মীর প্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। বুদ্ধির সঙ্গে কাজের, শিল্পীর সঙ্গে উদ্‌যোগী শিল্পপতির ও কর্মীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ফন্ মার্টিনের ভাষায় বলা যায়, বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের 'entrepeneur'রা একই ব্যক্তি ছিলেন। ইয়োরোপীয় নবযুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশেও অক্ষুণ্ণ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে 'অদ্ভুত সাদৃশ্য' বলে মনে হলেও, এ কেবল সাদৃশ্য নয়, অদ্ভুতও নয়, একই ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার প্রকাশ মাত্র।

বাংলার নবযুগের সমন্বয়সাধক রামমোহন কেবল সাধক ছিলেন না, ভাবরাজ্যেই তাঁর সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান কম দুঃসাহসিক নয়। তাঁর সরকারী চাকরি, কোম্পানির কাগজের ব্যবসা ও তেজারতি কারবার থেকে ধনসঞ্চয়ের স্পৃহা শাস্ত্রপন্থী না হলেও, যুগপন্থী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রধান সহকর্মী দ্বারকানাথের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যম সম্বন্ধে প্রশংসায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও পঞ্চমুখ ছিলেন। সেকথা আগে বলেছি।* ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নেতাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ অসাধারণ বাগ্মিতা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের জন্য অগ্রণী ছিলেন। রামগোপাল ইহুদী ব্যবসায়ী জোসেফের অফিসে কাজ করতেন প্রথমে, পরে কেল্‌সল সাহেবের অংশীদার হয়ে 'Kelsall Ghosh & Co' প্রতিষ্ঠা করেন। শেষে 'R. G. Ghosh & Co' নামে এক কোম্পানি করে রামগোপাল স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল 'অবাধ বাণিজ্যের' আদর্শ, টিপিকাল 'free enterprise'-এর আদর্শ। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের দানও যুগান্তকারী। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমে (১৮৩৯ সালে) 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোম্পানি'তে আমদানি-রফ্‌তানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে দুই ছেলেকে নিয়ে 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যাণ্ড সন্স' কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোং লিঃ', 'পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইন্‌ভেস্টমেণ্ট কোং', 'হাওড়া ডকিং কোং লিঃ' ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির ডিরেক্টর

* দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (১৯৪৮)

ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি 'বেঙ্গল টি কোং' ও 'ডারাং টি কোং লিঃ'-এরও ডিরেক্টর ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদের অভিযান বিশেষ-উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ সালে যখন 'দি সোসাইটি ফর্ দি একুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। 'দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র (১৮৪৩) সভাপতি ছিলেন জর্জ টম্‌সন, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি গোড়া থেকেই 'দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'বীটন সোসাইটি' (১৮৫১), 'দি ক্যাল্‌কাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেন্‌শন অফ্ ক্রুয়েল্‌টি টু অ্যানিম্যাল্‌স' (১৮৬১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বেভারলি সাহেব ও প্যারীচাঁদ 'দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে'র (১৮৬৭) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৮২০ সালে কেরী সাহেব এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যে 'এগ্রিকাল্‌চারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া'-র প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৮ সালে প্যারীচাঁদ তার সদস্য হন, কৃষিবিষয়ে সোসাইটির জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই হল বাংলার প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক প্যারীচাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ-ছাড়া শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক উন্নতির জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনিক ব্যবসায়ী শেঠ-শীল-মল্লিকদের দানও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কর্মীর উদ্যম, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর প্রতিভার অপূর্ব সংমিশ্রণ এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগৃতির প্রথম যুগে সম্ভব হয়েছিল। এই সংমিশ্রণ, এই সমন্বয় ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক।

বাংলার নবজাগৃতির ধারা বাধাবন্ধহীন সমতলক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়নি।* কোনো আন্দোলনই তা হয় না। তার উত্থানপতন আছে, জোয়ার-ভাঁটা আছে, ছন্দ ও তরঙ্গ আছে। রামমোহনের যুগ প্রধানত ভাবকেন্দ্রিক সমন্বয়ের যুগ। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই ধারার যে পর্যায়-ভাগ করেছেন তা লেখকের মতে বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি 'বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দে'র তৃতীয় যুগকে 'যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয়সাধনের' যুগ বলেছেন। তা কোনমতেই বলা যায় না। অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'The Renaissance in India' গ্রন্থে এই নবজাগৃতির ধারার যে পর্যায়-ভাগ ও বিশ্লেষণ করেছেন তাকে আদর্শবাদীর বিশ্লেষণ বলা যায়। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে নবজাগৃতির যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি তো দূরের কথা, আদর্শবাদীর নিষ্ঠা ও উদারতা পর্যন্ত নেই, আছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিকৃতবুদ্ধির ও বিভ্রান্তদৃষ্টির পরিচয়। (১৯৪৮)

আন্দোলন গৌণ, আদর্শলোকের সংগ্রামের সামান্য বাস্তব রূপ ও পরীক্ষা মাত্র। তাঁর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ, তাঁর নতুন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁর সংগ্রামের সার্থকতা। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাকে সমীকৃত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। শ্রেষ্ঠ জীব বলে দেবতাদের অস্তিত্ব রামমোহন স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মের অবতার না স্বীকার করলেও রাম কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে অবতার বলে মেনেছেন। পুরাণতন্ত্রাদি জাতিভেদ দেশাচার ইত্যাদি তিনি একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বেকনের চারশ্রেণীর 'idols'-এর বিরুদ্ধে রামমোহন অভিযান করেছিলেন সত্য, কিন্তু কুসংস্কারের সমস্ত মানস-প্রতিমা ও প্রেতাত্মাগুলিকে তিনি ধ্বংস করতে পারেননি। এই ধ্বংসের কাজ প্রধানত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতাদেরই করতে হয়েছে, ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের মতন তাঁরা সমস্ত মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস দেশাচার জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যে নতুন শক্তি রামমোহনের যুগে 'সঞ্চারিত' হয়েছিল তাকে আরও গভীর করে 'ইয়ং বেঙ্গলের' নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে সমাজের বুকে 'সম্প্রসারিত' করেছিলেন। তাঁরা ইয়োরোপের 'বাঙালী সংস্করণ' ছিলেন না। তাঁরা বাংলাদেশেরই মানুষ ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলের কথাও ভুলে যাননি। ব্রাহ্মসমাজের পরিণতি অথবা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের একদেশদর্শিতা ও উগ্রতা পরের কথা, আরএকদিকের কথা। রামমোহনের যুগ থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগের প্রসারতা ও ব্যাপকতাই এখানে উল্লেখ-যোগ্য। এই ব্যাপক শক্তিসঞ্চার ও আলোড়নের ফলেই নবজাগৃতির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং পরে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবল গতিশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে আত্মস্থ হয়েছে। এই ধারাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এই ধারাই বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত-ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে মিশে গেছে। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও এই ধারা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার রাজেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথম যুগে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলা ছাপার হরফ তৈরি হয়েছে এবং বাংলা গদ্য জন্মগ্রহণ করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে গেছে। আগের যুগের সামাজিক জড়তা, স্থিতিশীলতা ও আদিম সরলতার মধ্যে বাংলা গদ্যের

বিকাশ সম্ভব হয়নি, হতে পারে না, পৃথিবীর কোনো দেশেই হয়নি, কারণ ভাষা ও জীবন, ভাষা ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। তাই সমাজ যখন সচল সক্রিয় ও জটিল হয়ে উঠল, মানুষের জীবনের সামনে বিবিধ সমস্যা দেখা দিল, তখন ভাষাকেও আর অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কাব্যের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হল না। সমস্ত জটিলতাকে আত্মসাৎ করে বাংলা গদ্যের ধীরে ধীরে বিকাশ হল, সামাজিক নক্‌শা ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে উপন্যাসেরও জন্ম হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের পূর্ণবিকাশ হল।

নবজাগরণের এই ধারার পাশাপাশি আরএকটি ধারাও নবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাকে আমরা রাধাকান্ত ভূদেব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধারা বলতে পারি। এই দুই ধারা ঠিক প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দুটি পরস্পর-বিরোধী নির্দিষ্ট ধারা নয়। নবজাগৃতির প্রথম প্রচণ্ড গতিশীলতার যুগে বিরোধ তীব্র উগ্রমূর্তি ধারণ করেনি। প্রগতির সাধারণ ধারাই নতুন-পুরাতনকে সমীকৃত করে নিজস্ব গতিবেগে সমন্বয়ের পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই দ্বিতীয় ধারাটি প্রতিক্রিয়াশীলতার বাঁধাধরা খাতে বইতে পারেনি। তাকে শুধু বিরোধিতার (Opposition) ধারা বলা যায়। এই ধারার 'দুর্বলতা' তার 'উদারতা'র মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকান্ত ভূদেবের ভিতর দিয়ে এই ধারার চরম প্রকাশ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে হয়েছে। রাধাকান্ত ভূদেবের ধর্মগোঁড়ামি ও সামাজিক উদারতা শেষে রামকৃষ্ণের স্বাভাবিক মানবতাবোধ এবং বিবেকানন্দের ধর্ম ও মানুষ, আশ্রম ও সমাজ, শাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নূতনত্ব, তার বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য। যা কিছু নতুন মহান উদার, তা সব এদেশেই ছিল। ধর্ম আশ্রম মঠ সবই থাকল, কিন্তু তাও যে কত মহান, কত মানবিক, কত উদার, কত গতিশীল, এমন কি কতদূর 'সমাজতান্ত্রিক' পর্যন্ত হতে পারে, বিবেকানন্দ তা শুধু এদেশের লোককেই বললেন না, বিদেশেও প্রচার করতে গেলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ ব্যর্থ হলেন। নতুন ভাবধারাকে সমীকৃত করে সমৃদ্ধ হওয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তাকে আরও গভীরভাবে আবেগভরে আপনার করে নেওয়া বাংলার বিশিষ্টতা। আবেগ নিষ্ঠা বলিষ্ঠতা উদারতা ও গভীর মানবতাবোধের মধ্যে বিবেকানন্দের চরিত্রে বাংলার বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। বিবেকানন্দ নব-যুগের বাংলার শ্রীচৈতন্য, কিন্তু বাংলার নবজাগৃতির যুগ রামমোহন দ্বারকানাথ

দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার কেশবচন্দ্রের যুগ, ডিরোজিও টম্‌সন কৃষ্ণমোহন রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের যুগ, বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলালের যুগ, মধুসূদন প্যারীচাঁদ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যুগ। শ্রীচৈতন্যের যুগ শেষ হয়েছে। বিবেকানন্দের যুগও শেষ হয়ে গেল। রাধাকান্ত ভূদেব বিবেকানন্দের ধারাই পরবর্তীযুগে পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতার খাতে প্রবাহিত হয়েছে। জাগৃতির ধারা, প্রগতির ধারা যত দ্রুত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, বৃহত্তর সমন্বয়ের পথে এগিয়ে গেছে, রাধাকান্ত ভূদেব বিবেকানন্দের ধারাও তত দ্রুত সংকুচিত হয়েছে, তার উদারতা ও মানবতাবোধ বর্জন করে সংহত প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক রূপও বদলে যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াশ্রেণী শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পা দিচ্ছে, নিজের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর উদারতা মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধই আজ সাবালক বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে ভীতিপ্রদ 'সোশ্যালিজমে'র রূপ ধারণ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা তাই 'আর্য-সংস্কৃতি', 'নব্যহিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতি', এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে শক্তিশালী ও সংহত হচ্ছে। বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে, স্পষ্টতর হচ্ছে। বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণীর শৈশবকালের উদারতা মানবতা ও স্বাধীনতার বাণী আজ তাই সংকীর্ণতা বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার গর্জনে পরিণত হচ্ছে। সংকটের সময় সোশ্যালিজমবিরোধী ধর্মযুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্জনাস্তূপ ঘেঁটে ধর্ম শাস্ত্র অহিংসা সাম্প্রদায়িকতা অধ্যাত্মবাদ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি ভূতপ্রেতদের জড়ো করতেও আজ তাই বুর্জোয়াশ্রেণী পশ্চাদ্‌পদ নয়।

কিন্তু জাগৃতি ও প্রগতির ধারা ঐতিহাসিক নিয়মেই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে। প্রবাহের পথে সংঘাত ও বিরোধ তীব্রতর হবে। হওয়া স্বাভাবিক। রামমোহন 'সোশ্যালিজম' সম্বন্ধে রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে বিলেতে তর্ক করেছিলেন। 'কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের' মূলসূত্রগুলি তিনি জানতেন। বেকন, লক, ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্টরা, ফরাসী বিপ্লব, রামমোহনকে, বিশেষ করে নব্যবাংলার নেতাদের, উৎসাহিত করেছিল, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। সেই পথে তাঁরা নির্ভয়ে অভিযান করেছিলেন। তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর রুশবিপ্লব আরএক যুগান্তরের প্রেরণা দিয়েছে। রবার্ট ওয়েন থেকে মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌সের পথে লেনিনের যুগ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে পৃথিবী সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি। বিদেশের কোনো বিপ্লব, কোনো স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাতে রামমোহনও কুণ্ঠিত হননি।

নেপ্‌লসবাসীদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ব্যর্থতায় রামমোহন শুধু যে বেদনাবোধ করেছিলেন বা ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়তে দেখে তিনি যে শুধু 'ধন্য, ধন্য, ফ্রান্স!' বলে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়। রামমোহন বলেছিলেন: 'স্বাধীনতার শত্রু আর স্বেচ্ছাচারিতার মিত্র যারা তাদের জয় ইতিহাসে হয়নি কোনদিন, হবেও না ভবিষ্যতে।' এযুগে নির্ভয়ে তাই রুশবিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাঙালী তথা ভারত-বাসী অভিনন্দন জানাবে।* বাংলার নবজাগৃতির এযুগের উত্তরাধিকারীরা তাই নির্ভীকচিত্তে লেনিন গোর্কি স্টালিনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে সমীকৃত করবে। বাংলার জাগৃতিধারা, বাংলার সমাজ সংস্কৃতি দৃঢ়পদে বলিষ্ঠ-চিত্তে 'সোশ্যালিজমে'র প্রশস্ত পথে বৃহত্তর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।

* আজ আর একথা বোধহয় বলা যায় না, কিন্তু ১৯৪৮ সালে নিশ্চয় বলা যেত। আজ কেন বলা যায় না, সে-বিষয়ে আমার 'মেট্রোপলিটান মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ' গ্রন্থে (২য় সং, ১৯৭৭) "বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারা" প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। (১৯৭৮)।

সংযোজন : ১৯৭০

বাংলার নবজাগরণ

সমীক্ষা ও সমালোচনা

সমাজের মতো সামাজিক ইতিহাসের সমীক্ষাও গতিশীল। পরিবর্তনশীল অর্থে গতিশীল। সমীক্ষার বিভিন্ন পর্বে ইতিহাসের গতিশক্তির উৎসসন্ধানী দৃষ্টি যত গভীরে প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমে তত সমাজের আলো-অন্ধকারের কানাচ ও কক্ষগুলি গোচরে আসে, তত তার কাজচালানো রাং-ঝালাইয়ের জোড়াতালিগুলি ধরা পড়ে, পলেস্তারার ফাঁক দিয়ে রং-চটা ফাটলগুলি উঁকি মারে এবং আমাদের অনেক মনগড়া ও বইপড়া ভাবপ্রতিমার সম্মোহনী রূপ তার ভিতরের ও পেছনের বাঁশ-খড়ের কঙ্কালটির রূঢ় প্রকাশে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার নবজাগরণের যে ভাবপ্রতিমা, উনিশ শতকের পশ্চাদ্‌পটে, নানারঙের প্রলেপ দিয়ে আমরা নির্মাণ করেছি, তার অনেক রঙ আজ সামাজিক গতির তরঙ্গে ধুয়েমুছে মাটি হয়ে গিয়েছে, অনেক রঙের বাহ্য ঔজ্জ্বল্য ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। তার কারণ, প্রলেপগুলি বেশির ভাগই কাঁচা রঙের। তা থেকে বোঝা যায়, আমাদের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণে, বিশেষ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা, মূলে কোথাও গলদ আছে, ভয়ঙ্কর একটা ফাঁক ও ফাঁকি আছে, যে ফাঁক ও ফাঁকি কেবল তারিখ ও তথ্যের সমারোহে পূরণ করা যায় না। কারণ প্রাণহীন নীরেট তথ্য, মহাফেজখানা বা গ্রন্থাগার যেখান থেকেই আবিষ্কৃত হোক, ঐতিহাসিক ও অনুসন্ধানীর হাতে তা খেলার পুতুল মাত্র। তিনি তাঁর দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বিচারভঙ্গি অনুযায়ী সেগুলি নির্বাচন করেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে সামনে উপস্থিত করেন এবং তার ভিতর দিয়ে ইতিহাসের পালাগান শোনান। সেটা কেবল তথ্যের পুতুলনাচের ইতিকথা, সমাজের ও মানুষের ইতিকথা নয়। একই তথ্যের কত বিচিত্র প্রকাশ ও ব্যাখ্যা আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে সাময়িকপত্রে দেখতে পাই। কাজেই কেবল তথ্য নয়, তথ্যান্তর্গত

সত্যটিকে বুঝতে হলে ইতিহাসের গতিবোধ তো বটেই, সেই গতির ছন্দ ও তাল-মাত্রা সম্বন্ধেও বোধ সজাগ থাকা প্রয়োজন। এই বোধ থাকলে ঐতিহাসিক তথ্যবিচার বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে, ইতিহাস বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, এবং তা যদি হয় তা হলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যায়। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের এই মিলনসীমান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমরা উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের গতিধারার বিচারবিশ্লেষণ করব এবং চেষ্টা করব তার অসঙ্গতি অসমগতি ও অপূর্ণতার কারণগুলি নির্দেশ করতে।

পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে আমাদের ঐতিহাসিকরা সাধারণত উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বিচার করে থাকেন। ইতিহাসে কখনও দেখা যায় না যে দুই দেশের বা দুই পরিবেশের এক-ধরনের ঘটনার মধ্যে ঠিক একই কারণের সমাবেশ অথবা একই প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। কিন্তু কারণ ও তার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, কতকগুলি মৌল বিষয়ের বা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সাদৃশ্যের জন্য আমরা 'রেনেসাঁসে'র মতো ঐতিহাসিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি। ইতিহাসের দিক থেকে 'রেনেসাঁস' কথার 'typological' গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি? জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেদ ফন্ মার্টিন তাঁর *Sociology of the Renaissance* গ্রন্থে রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্দেশ করে বলেছেন—'the typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle Ages and modern times: it is a typical early stage of modern age.' মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে এবং সেইদিক থেকে রেনেসাঁসকে আধুনিক যুগের প্রথম উদয়পর্ব বলা যায়। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে কখনও অতীত যুগের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটে না, বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে—সমাজের মূল গঠন-বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে। এই মূল গঠন-বিন্যাস অর্থনৈতিক, যার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সমাজের গোষ্ঠীবিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে এবং তার উপর ভিত্তি করে সমাজের ধ্যানধারণা ভালমন্দ-বিচারবোধ সবকিছুর বিকাশ হয়। মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির যদি বিশেষ পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই পুরাতন ভিত্তির উপরে গঠিত সামাজিক সংস্থা বা ইন্‌স্টিটিউশনগুলির অথবা সাংস্কৃতিক ধ্যান-

ধারণাগুলির স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, বহিরাগত ভাবসংঘাতের ফলে একটা সঞ্চরণশীল পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এইদিক থেকে বিচার করলে, typologically উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোড়নকে 'রেনেসাঁস' বললে ভুল হয় না, কিন্তু বৈদেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত এই জারজ রেনেসাঁস-এর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁস-এর প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু তার বাস্তব পশ্চাদ্‌ভূমি না থাকার জন্য শেষপর্যন্ত তার সামাজিক ফলাফলও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষময় হয়েছে। 'রেনেসাঁস' বা নব-জাগরণের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি বিচার করে বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আমরা তার অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা আরও ভাল করে বুঝতে পারব।

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের যে সামাজিক 'breach' বা বিচ্ছেদ রেনেসাঁসের অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে আগে উল্লেখ করেছি, তার প্রথম প্রকাশ হবে সামাজিক অঙ্গবিন্যাসের (social structure-এর) পরিবর্তনে। মধ্যযুগের সমাজ ছিল একটা 'rigidly graduated system' এবং সেই কঠোর প্রায়-অচল স্তরবিন্যস্ত সমাজের চেহারা ছিল পিরামিডের মতো, অপরিবর্তনীয়—'pyramid of Estates'-এর পাশে অচল-অনড় 'pyramid of values'। অর্থাৎ স্থাবর ধনসম্পত্তির পিরামিডের পাশে স্থাবর ভালমন্দবোধ ও অটল ধ্যানধারণার পিরামিড—যেমন 'base' বা বনিয়াদ, তেমনি তার উপরের 'superstructure' বা সৌধ। ধনতন্ত্রের উন্মেষপর্বে, রেনেসাঁসের যুগে, এই পিরামিডে আঘাত হানল প্রথমত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি, দ্বিতীয়ত নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যমান সচল 'টাকা' (money)। আঘাতের ফলে মধ্যযুগের সামাজিক পিরামিডে ভাঙন ধরল, অচল স্তরিত সমাজের ভিতরে দেখা গেল নতুন এক সচল স্তরায়ন (flexible social stratification) আরম্ভ হয়েছে সমাজে। সমাজে মানুষকে স্তরিত করার শক্তি হল অবাধ প্রতিযোগিতায় অর্জিত টাকার। টাকা সচল গতি-শীল, কাজেই সামাজিক স্তরগুলিও, গতিশীল, rigid বা অচল নয়। আগে সমাজে কোনো ঊর্ধ্বাধঃ গতি (vertical mobility) ছিল না, এখন সেই গতি সঞ্চারিত হল অবাধগতি টাকার দৌলতে এবং টাকা সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যমানে পরিণত হওয়ার ফলে—সামাজিক মর্যাদার মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির মান। ইটালীয় রেনেসাঁসের কালে সমাজের এই গতিশীলতা দেখে আক্ষেপ করে Aeneas Sylvius বলেছিলেন: 'Italy...has lost all stability...a servant may easily become a King' এবং Lujo Brentano দুঃখ করে

বলেছিলেন যে টাকার জোরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যধিক বাড়ছে। শুধু তাই নয়, তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দেখে যে 'Cash payments are now the tie between people.' ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কার্ল মার্কস 'cash nexus' বলেছিলেন, তার প্রায় চারশ বছর আগে ব্রেনতানো এবং আরও অনেকে সেই 'cash tie'-এর চেহারা দেখে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও টাকার সচলতার দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে, প্রধানত নতুন মহানগর কলকাতা কেন্দ্রে, আঠার শতক থেকে এই ধরনের পরিবেশ রচিত হয়েছিল। কলকাতা শহরে যে নতুন নাগরিক অভিজাত ধনিকগোষ্ঠী (urban aristocracy) গড়ে উঠেছিল, তার পরিবার-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অধিকাংশেরই টাকার ধান্দায় নগরে আগমন এবং যে-কোনো কৌশলে যে-কোনো গম্য-অগম্য পথে-বিপথে-কুপথে টাকার সন্ধানে বেপরোয়া অভিযান আঠার শতকের বিভিন্ন পর্বে আরম্ভ হয়েছিল। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ছিল ইংরেজদের, এদেশীয় বা বাঙালীদের সম্পূর্ণ নয়। করিতকর্মা বাঙালীদের স্বাধীনতা ছিল ইংরেজদের অধীনে ও সাহচর্যে যে-কোনো কর্মে নিযুক্ত হবার, অবশ্য কোনো আধ্যাত্মিক কর্মে নয়, অর্থকরী কর্মে। আরএকটি স্বাধীনতাও তাঁরা এইসময় প্রদর্শন করেছিলেন, সেটি হল মধ্যযুগীয় কুলবৃত্তিগত বন্ধন ছিন্ন করে যে-কোনো অর্থকরী কর্ম করার স্বাধীনতা। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিকদের মধ্যে অনেকেই কুলবৃত্তি ও কুল-মর্যাদা ত্যাগ করে, নতুন টাকার মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইটালীয় সমাজপ্রসঙ্গে সিলভিয়াসের কথার—'servants may easily become a King'—প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে :

> ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রমাধীন··· অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।

ভবানীচরণ অর্থনীতিবিদ্ না হলেও এখানে একটি বিরামচিহ্নহীন বাক্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আঠার শতক ও উনিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের মর্ম প্রকাশ করেছেন। ভবানী-চরণের কথা যে কতখানি সত্য তা কলকাতার প্রাচীন ধনিক পরিবারগুলির আদিপুরুষদের কর্মজীবনের কাহিনী বিচার করলে বোঝা যায়। আঠার শতকে কলকাতার বহিরাঙ্গিক বিন্যাস অনেকটা মধ্যযুগীয় নগর ও গণ্ডগ্রামের মতো ছিল—বিভিন্ন কুলবৃত্তিজীবীদের বাস ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। আঞ্চলিক পুরনো নামগুলি থেকে তা বোঝা যায়, যেমন কুমোরটুলি কলুটোলা জেলিয়াটোলা ডোমটুলি গোয়ালটুলি পটুয়াটোলা শাঁখারীটোলা ইত্যাদি। এই মধ্যযুগীয় নাগরিক পরিবেশে শোভাবাজারের দেব-পরিবার, সিমলের দে-সরকার পরিবার, জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, মল্লিক পরিবার এবং আরও অনেক প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বণিক পরিবার, যাঁরা সে সময় কলকাতার নতুন ধনিকসমাজ গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিগান তর্জাগান আখড়াইগান পাঁচালি কথকতা ইত্যাদির সঙ্গে ঘোড়দৌড়, বুলবুলির লড়াই, পোষা বাঁদরের বিয়ে, মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ, সাহেবদের খানা পিনা, গঙ্গার ঘাটনির্মাণ, দেবালয় নির্মাণ, তীর্থস্থানে ধর্মশালা নির্মাণ প্রভৃতির কল্যাণে বাঙালী Comprador-শ্রেণীর নব্যধনিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। আঠার শতকের মাত্র দশ-বারজন কলকাতার বিখ্যাত বাঙালী ধনিক পরিবারের বিচিত্র ভোগবিলাসের (যাকে conspicuous consumption বলা হয়) ব্যয়ের পরিমাণ যদি হিসেব করা যায়, তাহলে মোট অংক অন্তত কয়েক কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এই মূলধন জমা করা থাকলে উনিশ-শতকে এই সমস্ত পরিবারের বংশধররা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে উদযোগী হয়ে অন্তত কিছুটা অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি।

তার উপর আঠার শতকের শেষে, ১৭৯৩ সালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে যখন নতুন জমিদারশ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পথ নব্য-ধনিকদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাঁরা ভোগবিলাসের পর উদ্বৃত্ত টাকা প্রধানত জমিদারী কিনতে ব্যয় করেন। কার্ল মার্কস তাঁর *Notes on Indian History* গ্রন্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন 'greater part of the province's landholdings fell rapidly into the hands of a few city-capitalists who had spare capital and readily invested it in land'. স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যাঁরা কিছুটা

সেই সময় উদ্‌যোগী হন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামদুলাল দে ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিন্তু উভয়েই শেষ পর্যন্ত বিশাল স্থাবর সম্পত্তির মালিকে পরিণত হন। শহর থেকে উপার্জিত অর্থে আরও কতজন যে খুদে-মাঝারি জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীতে পরিণত হয়েছিলেন তার ঠিক নেই। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায় যে মধ্যস্বত্বের বিস্তারের ফলে জমিদারীর সংখ্যা বাংলাদেশে দেড় লক্ষের বেশি হয়েছে, বিশ হাজার একরের উপরে বড় জমিদারীর সংখ্যা পাঁচশ'র কিছু বেশি, বিশ হাজার থেকে পাঁচশ একরের মধ্যে মাঝারি জমিদারী প্রায় ষোল হাজার, এবং পাঁচশ একর ও তার কম ছোট জমিদারীর সংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু কম। এর সঙ্গে যদি জমিদার-পত্তনিদার-জোতদারদের গোমস্তা নায়েব তহশীলদার পাইক দফাদার প্রভৃতি কর্মচারী ও ভৃত্যদের সংখ্যা যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্বনীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজে কমপক্ষে সাত-আট লক্ষ লোকের এমন একটি 'শ্রেণী' (সামাজিক 'স্তরায়ন') তৈরি হয়েছে, যে শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। অবশ্য সামাজিক শ্রেণী হিসেবে বলতে গেলে 'একটি' শ্রেণী বলা যায় না, দু'টি শ্রেণী বলতে হয়—একটি নতুন জমিদারশ্রেণী, আরএকটি নতুন মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী। নামে দুই শ্রেণী হলেও, কাজ ও স্বার্থের দিক থেকে এদের চিন্তাভাবনা ও আচরণ একশ্রেণীর মতো।

এর পাশে নাগরিক সমাজে, যেমন কলকাতা শহরে, ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের বিশ্বাসভাজন আরও দু'টি শ্রেণী তৈরি করেছিলেন—একটি নতুন নাগরিক ধনিকশ্রেণী, আর-একটি নতুন নাগরিক মধ্যশ্রেণী। এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, দালাল প্রভৃতির সংখ্যা অনেক, বাকি নানারকমের চাকরিজীবী। নাগরিক মধ্যশ্রেণীর একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গড়ে উঠেছিল বাঙালি ইংরেজিশিক্ষিত এলিট্‌শ্রেণী। ব্রিটিশ আমলে বাঙলী সমাজের এই নতুন শ্রেণীরূপায়ণ নিশ্চয় একটা বড় রকমের পরিবর্তন এবং আগেকার পিরামিডের মতো স্তরিত সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। আগে বলেছি, নবযুগের নতুন শ্রেণীবিন্যাস অচল নয়, সচল, ঊর্ধ্বাধঃ গতিশীল, এবং সেই গতির প্রধান চালকশক্তি 'টাকা'। টাকা সচল, শ্রেণীও তার ছন্দে সচল। বাঙালী সমাজে আঠার-উনিশ শতকে এ-সত্যও নির্মম বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার জন্যই কি তাকে 'রেনেসাঁস' বলা যায়? বিশেষ করে যে-সমাজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ধনতন্ত্রের 'typical early stage'-এর কোনো আভাস পাওয়া যায় না? বিশেষ করে শ্রমশিল্পের

বিস্তারে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের অগ্রগতিতে ? যে-সমাজে কোনো 'entrepreneur'-এর সুদূর পদধ্বনিও শোনা যায় না অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ? কেবল টাকার ধান্দা, টাকা সম্পর্কে মুনাফালোভী মনোভাব যদি typical early stage of capitalism হয় (অবশ্য এটা capitalist mentality নিশ্চয়) তাহলে বাংলাদেশে উনিশ শতকে নিশ্চয় তার বিকাশ হয়েছিল বলতে হয়, এবং সেটা যে রেনেসাঁসের যুগের একটা ঐতিহাসিক লক্ষণ তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি প্রকৃত 'রেনেসাঁস' তা নয়।

আরও আশ্চর্য হতে হয় এই কথা ভেবে যে ইয়োরোপীয় 'রেনেসাঁসের' ঐতিহাসিক পথে আমাদের দেশে প্রকৃত নবজাগরণের যাঁরা অগ্রদূত হতে পারতেন, ব্রিটিশ আমলের নতুন সামাজিক প্রতিবেশে সেই বাঙালী বণিক-শ্রেণী (merchants) আদৌ সচল ও সজাগ হলেন না। কেন হলেন না, সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বাংলার, তথা ভারতের সমাজেতিহাসের অনুসন্ধানীদের। দুঃখের বিষয়, গতানুগতিক ইতিহাসের পাতায় বহুজনচর্বিত পর্বতপ্রমাণ তথ্যস্তূপের মধ্যেও এরকম কোনো প্রশ্নেরই আভাস পাওয়া যায় না, উত্তর তো দূরের কথা। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে মধ্যযুগ ও আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের (এবং ভারতবর্ষের) বণিকজাতি বংশধরপম্পরায় দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে বাঙালী বণিকদের সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধনপতি সদাগর আমি বসি হে উজানী, গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী'। ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধাম' —তাঁদের মধ্যে চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরও ছিলেন। এ রকম আরও অনেক বিবরণ থেকে বাংলাদেশের গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বণিক-জাতির বাণিজ্যলব্ধ ধনৈশ্বর্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে একথা অন্তত ভাবা যেতে পারে যে এদেশে Mercantile Capitalism-এর বিকাশ স্বচ্ছন্দে হতে পারত এবং তার ক্রমিক পরিণতি, ঐতিহাসিক অবস্থার আনু-কূল্যে, ইয়োরোপের মতো Industrial Capitalism-এ হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তা হল না কেন ? তা ছাড়া, যে ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে বিজ্ঞান (Science) অনুশীলনের (গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি) ধারা

বেশ পরিস্ফুট ছিল (মধ্যযুগে অবশ্য শীর্ণ হয়েছিল), সেই দেশে সর্বত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল কেন, তাও ভাবা দরকার। যদি 'মার্কাণ্টাইল ক্যাপিটালিজম্'-এর স্বাভাবিক বিকাশ হত এদেশে এবং তার পরিণতি হত 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম্'-এ, তাহলে বিজ্ঞান অনুশীলনের ধারা অনেক বেশি পরিপুষ্ট হত এবং তার প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হত না। তা যদি হত, তাহলে ইয়োরোপের মতো কি আমাদের দেশেও 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক লক্ষণ স্বভাবতঃই দেখা দিত না? উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ প্রসঙ্গে এরকম কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয় নি এবং তা না হবার ফলে নবজাগরণ-বিষয়ে সমস্ত আলোচনা ও গবেষণা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে বলতে হয়। আমরা শুধু গতানুগতিক ইতিহাস চর্চার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বাইরের খোলটির গায়ে আঁচড় কেটেছি, অনেক হিজিবিজি আঁচড়, কিন্তু ভিতরের বস্তুটিকে সন্ধান করি নি। বাস্তব সমাজ, বাস্তব জীবনের কথা ভুলে গিয়ে আমরা শুধু এদেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মানসলোকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান দর্শনের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করেছি, অথচ দেশের বাকি পঁচানব্বুই জন মানুষের মনের সুদূর প্রান্তে পর্যন্ত তার কোনো স্পর্শ লাগল কিনা, অথবা আদৌ লাগতে পারে এরকম কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা, সে-বিষয় চিন্তা করার অবকাশ পাই নি।

আমাদের প্রশ্ন, কেন এদেশের বণিকশ্রেণী আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশে সহায় হলেন না, কেন ধনপতি সদাগররা এ যুগের কোটিপতি ক্যাপিটালিস্ট হতে পারলেন না? এ প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য নতুন দৃষ্টিতে পর্যাপ্ত গবেষণা ও তথ্যানুশীলন প্রয়োজন। আপাতত আমাদের মনে হয়, বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে বাঙালী সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রতি সামাজিক উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই হল এই স্বাভাবিক ঐতিহাসিক গতি ব্যাহত হবার অন্যতম কারণ। এদিক থেকে চীনের সমাজের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সমাজের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জোসেফ নীডহাম চৈনিক সমাজের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—'The despising of the merchant was a very old characteristic in Chinese thought...' আমাদের দেশেও একথা সত্য। কিন্তু চৈনিক সমাজে জাতিবর্ণভেদ (caste) বলে কিছু ছিল না, বর্ণবৈষম্য ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। এই বর্ণবৈষম্যজনিত সামাজিক অবজ্ঞা ও উপেক্ষা আমাদের দেশে বণিকশ্রেণীকে শক্তিশালী আধুনিক পুঁজি-পতিশ্রেণীতে পরিণত হতে দেয় নি, উদ্যম উদ্‌যোগ ও অর্থনৈতিক অভিযানের

দুঃসাহসিক পথ থেকে তাদের উৎখাত করেছে। যে কর্ম ও কৃতিত্বের জন্য কোনো সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লভ্য নয়, তা করার জন্য কোনো প্রেরণা এদেশের বণিকরা পান নি। কাজেই এদেশের বাণিজ্যলব্ধ মূলধনের ঐতিহাসিক বিকাশ হয় নি আধুনিক শিল্পগত মূলধনে, এবং তা না হওয়ার ফলে যেমন বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক অবনতি হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার দীর্ঘস্থিতি ও গতানুগতিকতা এদেশের মানুষকে কর্মবিমুখ ও আলস্যের উপাসক করেছে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে ধর্মচর্চার চূড়ান্ত বিকৃতিতে, নৈষ্কর্ম্যের সাধনায়।

ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের দেশের পুরাতন সমাজব্যবস্থা অনেককিছু ওলটপালট করেছেন বটে, কিন্তু তার মূল গড়নটিকে অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিকে একেবারেই আঘাত করতে পারেন নি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরা টাকার ধান্দায় খানিকটা ব্যবসাবাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কাছেও বাণিজ্যলব্ধ টাকার আকর্ষণের চাইতে শিক্ষা ও চাকুরীলব্ধ টাকার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে। আর তার চাইতেও বড় সত্য হল, বাঙালী বণিকরা (গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি) ব্রিটিশ আমলেও কেউ আধুনিক শিল্পপতি হবার জন্য উদ্‌যোগী হলেন না, তাঁদের বংশগত বাণিজ্যের গণ্ডির মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন। এমন কি ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হবার পরেও আজও তাঁদের মধ্যে সেরকম কোনো উদ্‌যোগের লক্ষণ দেখা যায় না, তার কারণ সমাজের মূল বর্ণভিত্তিক গড়ন আজও অটুট আছে, বদলায় নি এবং সেই সমাজবিন্যাসে বণিকরা নিম্নস্তরের উপেক্ষার পাত্র হয়ে আছেন।

একথা সহজ সত্য যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ আদৌ সহজগম্য ছিল না এবং পদে পদে তার বাধা ছিল অনেক। কিন্তু বাংলার অর্থনীতিক্ষেত্রে অন্তত শিল্পবাণিজ্যের মধ্যবর্তী স্তরে যেটুকু সক্রিয় হওয়ার সুযোগ ছিল, যথেষ্ট মূলধন সঞ্চয় করা সত্ত্বেও বাঙালীরা তা হন নি, নিষ্ক্রিয়তার প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামের জমিদারী, শহরের গৃহসম্পত্তি, কোম্পানির কাগজ, স্বর্ণপিণ্ড ইত্যাদিতে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আয়ের সুযোগ খুঁজেছেন, আর যাঁরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত মধ্যশ্রেণী, তাঁরা চাকরি, বিশেষ করে সরকারী চাকরিকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। ছেলে দারোগা হোক, ডেপুটি হোক, সরকারী কেরানী হোক, নিদেনপক্ষে জমিদারের গোমস্তা বা নায়েব হোক, এই ছিল বাঙালী মায়েদের প্রার্থনা দেবতার কাছে, এবং বিবাহের বাজারে এই সব পাত্রের

মূল্য ছিল অত্যধিক, যেমন বর্তমানে 'ইঞ্জিনিয়ার' নামক জীবদের। পরিবার থেকে সমাজ পর্যন্ত এমনই একটা পরিবেশ রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে যে বাঙালীর মন 'achievement-oriented' বা ব্যক্তিকৃতিমুখী হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ পায় নি তার মধ্যে, 'slavery-oriented' বা দাসত্বভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠেছে। এই দাসত্বপ্রবণ দারোগা-কেরানী-গোমস্তা-নির্ভর, গ্রাম্য নব্য-জমিদার-পত্তনিদার ও নাগরিক নব্যধনিক খুদে-ব্যবসায়ী-মুখাপেক্ষী যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, দেশের বড়জোর শতকরা দশজনের গণ্ডি পর্যন্ত যার আলোক বিচ্ছুরিত, বাকি নব্বুইজনের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে শুধু অজ্ঞান ও সুপ্তির ঘোর অন্ধকার, সেই নবজাগরণের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে মনে হয়।

ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের মধ্যেই আমাদের দেশে রেলপথ, পোস্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, পাটকল, কাপড়ের কল এবং অন্যান্য কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ট মূলধন, উদ্যম ও সুদক্ষ কারিগরির প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু বিদেশীর শাসনশোষণাধীনে থাকার ফলে স্বভাবতই সেগুলি enclave-এর (আংক্লাভ্) রূপ নিয়েছে যে 'আংক্লাভ'-গুলি 'cut out and isolated from the surrounding economy, but tied to the economy of the home county.' গুনার মীরডাল তাঁর *Economic Theory and Under-Developed Regions* গ্রন্থে, এবং পরবর্তী *Asian Drama* গ্রন্থে, এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। মীরডাল নতুন কথা কিছু বলেন নি, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ্, বিশেষ করে মার্কসবাদীরা, একথা অনেক আগেই বলেছেন। রেলওয়ে, তৎসংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্প, পাটকল, প্ল্যানটেশন সবই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো গড়ে উঠেছে এদেশে, পরিপার্শ্বের দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, বিদেশী শাসকদের নিজেদের দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের দেশের, অন্তত বাংলাদেশের 'surrounding economy'-র সামন্ততান্ত্রিক রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, বরং ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থে নবরূপে তাকে রূপায়িত করা হয়েছিল। পরিপার্শ্বের এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন যে নতুন অর্থনীতির বিকাশ বাংলাদেশে হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ইংলণ্ডের দেশীয় অর্থনীতির স্বার্থে, মূলধন উদ্যম কারিগরি সবই প্রায় ইংলণ্ডের। আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল 'plentiful labour supply and low wages'-এর দিক থেকে, অর্থাৎ যথাসম্ভব অল্প মজুরিতে প্রচুর পরিমাণে মজুর সরবরাহের দিক থেকে। তাই আমরা করেছি, মূলধন উদ্যম কারিগরি-কুশলতা কিছুই নিজেরা তেমন নিয়োগ বা প্রয়োগ করতে পারি নি।

ব্রিটিশের প্রধান লক্ষ্য ছিল, নিরাপদ-নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে এ দেশের আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতি (social stability) যে-কোনো উপায়ে বজায় রাখা। 'সামাজিক স্থিতি' কথাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। ব্রিটিশ শাসকরা এ দেশের সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অথবা সামাজিক অঙ্গবিন্যাসে এমন কোনো দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে চান নি, যাতে সামাজিক স্থিতি নষ্ট হতে পারে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অভ্যুদয় হলে যে সামাজিক সচলতা ও পরিবর্তনের সূচনা হত, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্বিঘ্নে শোষণ-শাসনের সুবিধা হত না। দেশী-বিদেশী লুণ্ঠনস্বার্থে সংঘাত হত। কাজেই তাঁদের কোনো স্বার্থ ছিল না রেনেসাঁসের অর্থনৈতিক ভিত্তি এদেশে গড়ে তোলার। তাঁরা এমনভাবে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যাতে তার অতীতের সামন্ততান্ত্রিক বনেদটি মূলত বজায় থাকে। যেমন আমরা আগে বলেছি—গ্রাম্য সমাজে নতুন জমিদারশ্রেণী, বৃহৎ একটি জমিদারী-নির্ভর মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী, এবং নাগরিক সমাজে নতুন অর্বাচীন অভিজাত-ধনিকশ্রেণী, খুদে-ব্যবসায়ী দোকানদার চাকরিজীবী প্রভৃতিদের নিয়ে বড় একটি নাগরিক মধ্যশ্রেণী এবং তার মধ্যে সোনার চাঁদের মতো একদল ইংরেজিশিক্ষিত 'elite'। সাম্রাজ্যবাদীর অধীন দেশে, যেমন আমাদের বাংলাদেশে, এই শিক্ষিত 'এলিট'-গোষ্ঠী সম্বন্ধে জঁ্য পল্ সার্ত্র যে উক্তি করেছেন তা নির্মম হলেও সত্য :

> 'The European *elite* undertook to *manufacture* a native *elite*. They picked out promising adolescents: they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth···These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed'. (Preface, Fanon : *The Wretched of the Earth*).

বাংলাদেশের পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাশিক্ষিত 'এলিট' প্রসঙ্গেও সার্ত্রের এই উক্তি প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে এই এলিটের কথা আসবে।

যে-ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গড়নের পরিবর্তন ব্রিটিশ আমলে দেখা গেল, তাতে সমাজের যে 'institutional power-structures', যেমন আমাদের জাতিবর্ণভেদ, ধর্মসম্প্রদায়ের বৈষম্য ইত্যাদি—তার কোনো উন্নতিশীল পরিবর্তন কিছু হল না। যে-কোনো সমাজের স্থায়িত্ব ও শক্তির

প্রধান উৎস হল institutions এবং আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের power-structure যে-সমস্ত ইন্‌স্টিটিউশনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অন্যতম হল যৌথ পরিবার (joint family), জাতিভেদপ্রথা (caste system), বিবাহপ্রথা, ধর্ম ইত্যাদি। উনিশ শতকের সমাজসংস্কারকদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (গাছের গোড়ায় জল দিয়ে ডাল কাটার মতো) এবং সংস্কার-আন্দোলন মধ্যে মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত কোনো সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের পরিবর্তন হয়নি, এমন কি উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সদলবলে ও সশব্দে বাংলার নবজাগরণের রঙ্গমঞ্চ দখল করা থেকে বোঝা যায় যে এগুলির দৃঢ়ভিত্তিতে কোনো আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। লাগবার কথা নয়, কারণ মূল অর্থনৈতিক গঠনের পরিবর্তন ছাড়া সমাজের institutional power-structure-এর কোনো পরিবর্তন হতে পারে না, বাংলাদেশেও সেই কারণে হয় নি। এবং তা হয় নি বলেই বাংলাদেশের রেনেসাঁস-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অনেক বাষ্প বিদ্যুৎ ও বুদ্‌বুদ্ উদ্‌গার করে কোনরকমে নিভ-নিভ সল্‌তেটি জ্বালিয়ে রেখেছিল মাত্র। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনেকাংশে ব্যর্থতা ও ট্র্যাজিক পরিণতি, অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার এইটাই প্রধান কারণ বলে মনে হয়। জাতিভেদপ্রথা, ধর্মসম্প্রদায়-বৈষম্য ইত্যাদি 'hardened institutions of inequality' যেমন দেশের ভিতরের উন্নত ভাবাদর্শের সম্প্রসারণে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি উন্নত ও অগ্রগামী দেশ থেকে আগত কোনো উন্নতিশীল শক্তির বিস্তারকেও সঙ্কুচিত করতে পারে। 'If they hamper the spread effects within those countries, they inhibit at the same time, the spread of expansionary momentum from the advanced countries abroad' (Myrdal). এই কারণে মধ্যযুগে যেমন রামানন্দ কবীর দাদু নানক নামদেব প্রমুখ সাধক-সংস্কারকদের জাতিবৈষম্য ও ধর্মভেদের বিরুদ্ধে সমস্ত আবেদন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ তাঁদের ভাবাদর্শের কোনো প্রসার হয়নি, তেমনি উনিশ শতকে বাংলাদেশে রামমোহন বিদ্যাসাগর ইয়ংবেঙ্গল দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সংস্কারকদের পাশ্চাত্ত্য ভাবসংঘাতজাত উন্নতিশীল সংস্কার-আদর্শের বিস্তারও অনেকটা সংকুচিত হয়েছে। নতুন ভাবাদর্শের 'spread effect' যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য ভাবসংঘাতের 'expansionary momentum'ও 'inhibited' হয়েছে, পুরাতন institutional power-structure-এর প্রতিঘাতে। তাই দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণ মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য

বিদ্যাশিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মস্তিষ্কের আন্দোলন, দেশের মানুষের আন্দোলন নয়। আমাদের দেশের মতো ঐতিহ্যানুগামী সমাজে (tradition-bound society) পুরাতন সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের শক্তি যে কত সংহত ও সুদৃঢ়, তা ব্রিটিশ শাসনমুক্তির প্রায় পঁচিশ বছর পরেও, আধুনিক যন্ত্রোন্নত শিল্পায়নের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, আজও আমরা ধর্মবৈষম্য জাতিভেদ প্রভৃতির সদম্ভ আত্মপ্রকাশে বুঝতে পারছি। কাজেই উনিশ শতকে এই সমস্ত ইন্‌স্টিটিউশনের লৌহপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে বাংলার নবজাগরণের আদর্শ কিভাবে খণ্ডিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অনুমান না করে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। 'ধর্ম' যখন সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্‌স্টিটিউশন, বিশেষ করে আমাদের মতো ঐতিহ্যমুখী ('tradition-oriented') সমাজে, তখন ধর্মসংস্কারের কথাই প্রথম বলি। অজস্র ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার-বিচার, বাহ্য অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা ও বহু-দেবতাবাদ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজমানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দেখে রামমোহন গভীর বেদনাবোধ করেছিলেন এবং পাশাপাশি খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারও মিশনারীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের সঙ্কট তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই প্রাচীন উপনিষদ ও তন্ত্রশাস্ত্র থেকে বাহ্যানুষ্ঠানবর্জিত একেশ্বর ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন ও প্রচার করে এই কথাই বলতে বা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুধর্মের উৎসমুখে সন্ধান করলে সেখানেও সহজ সরল অকৃত্রিম একদেবতা নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করা যায় না। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেছিলেন হিন্দুধর্মের এই প্রকৃত রূপ, শুধু খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছে নয়, সমগ্র দেশবাসীর কাছে উদঘাটিত করার জন্য। যুগে যুগে ঐতিহাসিক সঙ্কট-কালে শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারকদের পথই অনুগমন করেছিলেন রামমোহন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল—যদিও সেই ব্যর্থতা বিদেশে তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য তিনি নিজে বিশেষ অনুভব করেন নি। দুটি কারণে ব্যর্থ হয়েছিল, প্রথম কারণ, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ভিতরের স্থাপত্য থেকে আরম্ভ করে সাপ্তাহিক উপাসনা, উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি সবকিছুর উপর খ্রীস্টান গির্জা ও ধর্মের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ। দেবদেবীর দেবালয় যে-দেশের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে যেখানে গৃহদেবতা অতিদরিদ্রের অতিসরল অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে উপাস্য, সেখানে দেবতা ও তাঁর উপাসনার প্রতি এই 'intellectual' বা বুদ্ধিযুক্তিসর্বস্ব মনোভঙ্গি কখনই সমাজে সাধারণজনগ্রাহ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, এরই অনুসিদ্ধান্ত—গজদন্তমিনার বা প্রাসাদশীর্ষ থেকে কেবল

নিরপেক্ষ বুদ্ধি ও যুক্তির সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে, অথবা বিমূর্ত মানবতা-বোধসম্ভূত হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কোনো জনসমাজে কখনও ধর্মসংস্কার করা যায় না। তা যদি করা যেত তাহলে রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ থেকে কবীর দাদূ নানক শ্রীচৈতন্য সকলেই হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্মের কাঠাম পাল্টে ফেলতে পারতেন। তা যদি করা যেত, তাহলে বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ পাদে পৌঁছেও আমরা হিন্দুধর্মের এরকম মধ্যযুগীয় উৎকট স্বরূপপ্রকাশে স্তম্ভিত হতাম না।

রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ তাঁর ব্যক্তিত্বমুগ্ধ কয়েকজনমাত্র সহগামীর সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নব্যধনিক জমিদার ও শহরের নতুন রাজা-মহারাজা। যেমন টাকীর জমিদার, তেলিনীপাড়ার জমিদার, ভূকৈলাস-খিদিরপুরের রাজা প্রভৃতি। এঁদের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনার মর্ম বোঝা দূরে থাক, হিন্দুধর্ম ও সমাজের সাংস্থানিক গঠনে আঘাত করা প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ ও স্থিতস্বার্থের বিরোধী ছিল। তাই রামমোহনের অনুপস্থিতিতে ও অবর্তমানে তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রায় গোঁড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। দ্বারকানাথের বদান্যতায় ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্তু তার আদর্শ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজে দীক্ষা নিয়ে ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজ' থেকে 'ব্রাহ্মধর্মে'র রূপ দেন। তিনি বলেন 'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।' কিন্তু হিন্দুধর্মেরই বিশাল পরিধির মধ্যে যখন নতুন 'ব্রাহ্মধর্ম' হল তখন চিরাগত নীতি অনুযায়ী অন্যান্য বহু উপাসক-সম্প্রদায়ের মতো ব্রাহ্মদের আর-একটি সম্প্রদায়-রূপে হিন্দুসমাজ ধীরে ধীরে নির্বিবাদে আত্মসাৎ করে নিল। তারপর শুধু অতিনির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে 'peaceful coexistence' ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় রইল না।

উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে, একথা ঠিক যে কেশবচন্দ্র সেন বলিষ্ঠ প্রগতিশীল আদর্শে—যেমন স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি—ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু যে বিস্তৃত চোরাবালির ভূমি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল, অবশেষে কেশবচন্দ্র নিজেই তাতে প্রোথিত হলেন। হিন্দুধর্মের সনাতন ইনস্টিটিউশন গুরুবাদ অবতারবাদ তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই সময় আদিব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনও 'Brahmoism is Hinduism' কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং তার অন্যতম প্রবক্তা হন রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও নীতির এই

করুণ পরিণতির পর উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের বিজয় অভিযান স্বাভাবিক। প্রধানত শহরবাসী শিক্ষিত এলিটের ideological আন্দোলন—যার 'spread effect' ও 'expansionary momentum' প্রায় ছিল না বলা চলে, তা আতসবাজির মতো চমক সৃষ্টি করতে পারে—যেমন প্রায় বছর দশেকের জন্য উনিশ শতকের তিরিশের দশকে করেছিলেন ডিরোজীয়ান ইয়ং বেঙ্গল দল—কিন্তু তার স্থায়ী দান বিশেষ থাকে না। কতকগুলি প্রগতিশীল 'values' ও 'ideas'-এর যে 'সেডিমেণ্ট' বা তলানি পড়ে থাকে সমাজমনের উচ্চস্তরে, পরে নতুন অবস্থান্তরে নতুন নিরিখে তার পুনর্মূল্যায়ন হয়। যেমন বর্তমানে হচ্ছে। সে যাই হোক, উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার প্রসঙ্গে আরও একটু বলা যায় এই যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরাও ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিপাদ্য ছিল এই যে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ-রাষ্ট্রের মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্ত প্রগতিশীল ভাবাদর্শ নিহিত আছে—সাম্য গণতন্ত্র স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতা, পুরুষ-নারীর সামাজিক সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি—তার জন্য নতুন কোনো আদর্শ বাইরে থেকে আমদানি করা অর্থহীন। উনিশ শতকের প্রথম পর্বের 'ওরিয়েণ্টালিস্ট'—যাঁরা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন—এবং শেষ পর্বের 'রিভাইভালিস্ট'দের মনোভঙ্গি ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। উভয়েরই বক্তব্য হল সবই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দু ধর্মে আছে, গীতায় সাম্যবাদ পর্যন্ত। এইটাই হল সবচেয়ে মারাত্মক বিপজ্জনক চিন্তাধারা, যার প্রভাব থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী, সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতা মুক্ত হতে পারেন নি। আমাদের দেশের এই চিন্তাধারা ও ধারণা সম্বন্ধে মীরডাল তাঁর *Asian Drama* গ্রন্থে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন 'this may be good tactics, but it is bad sociology'। বাস্তবিকই তাই। দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসমাজকে বিভ্রান্ত করার দিক থেকে এবং তাদের অসাড় নিস্পন্দ করে রাখার দিক থেকে এ কৌশল খুব ভাল, কিন্তু সামাজিক বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে সনাতন হিন্দুধর্মের মতো একটি অটল 'ইন্‌স্টিটিউশন' কতকগুলি সামাজিক ইনস্টিটিউশনের শক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সব কয়টি হল জাতিভেদ বর্ণবৈষম্য গুরুবাদ প্রভৃতি সামাজিক অসাম্য এবং মূল অর্থনৈতিক অসাম্যের 'hardened institutions of inequality'. কাজেই সবই যে বেদ-উপনিষদ-গীতায় আছে, সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতশাস্ত্রে আছে, একথা বলা 'good tactics', কিন্তু 'bad sociology'. এই চিন্তাধারা আজও

আমাদের সমাজে বেশ সক্রিয় থাকার ফলে এবং যন্ত্রোন্নয়ন-শিল্পোন্নয়নের সংঘাতে সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির শিথিলতার মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য-বৈষম্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, বর্তমানে তাই দেখা যায় ধর্মের পুরাতন institutional power-structures যেন ক্রমে আরও শক্তিশালী হচ্ছে—গুরুবাদ পৌত্তলিকতা অবতারবাদ জাতিভেদ ধর্মানুষ্ঠান অত্যধিক মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—বিশেষ করে বাংলাদেশের শহরে-নগরে ও তার উপকণ্ঠে। শুধু এই বিষয়টি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের একটি চমৎকার ক্ষেত্র হতে পারে, অত্যন্ত interesting—কেবল মধ্যবিত্তদের নানারকমের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বিচারের দিক থেকে নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার পলেস্তারার উপর প্রাচীন ধর্মীয় ইন্‌স্টিটিউশনের আঘাত লাগলে কিভাবে যে তা এখনও সহজে খসে যেতে পারে সেই দিক থেকে, এবং millenarianism বা স্বপ্নস্বর্গ কামনা ও পরিত্রাতা messiah-র প্রভাব যে মধ্যবিত্তের মানস-স্তরের কত গভীরে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে, সেই বিষয় অনুশীলনের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম বিশেষ ঘটে নি। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বোধহয় উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় সমাজসংস্কার আন্দোলন, যা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম্যসমাজে পর্যন্ত খানিকটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়। তাও দেখা গেছে বিধবাবিবাহ যাঁরা করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে সাময়িক অর্থলোভে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন, কোনো আদর্শপ্রীতির জন্য বিবাহ করেন নি। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বুঝতে পেরে শেষজীবনে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজ গ্রহণ তো করেই নি, শিক্ষিত উচ্চসমাজে যাঁরা আদর্শের দিক থেকে একদা তা সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন নি। বিধবাবিবাহের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক প্রথা, যেমন নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা, যৌথপরিবার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি—যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে শুধু প্রথা হিসেবে বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত হতে পারে না। আর যে প্রথাগুলির কথা উল্লেখ করলাম সেগুলিও সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তির আধুনিক রূপান্তর ছাড়া পরিবর্তিত হতে পারে না। তাই

বিধবাবিবাহ ব্যর্থ হয়েছে, নারীর পরাধীনতা, যৌথপরিবার সবই বজায় থেকেছে, এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই কোনো আইন পাস করতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় শিক্ষিতশ্রেষ্ঠও আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের সমাজসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালী এলিটের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় গণ্য হতে পারেন এবং সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত এলিটের মন যে চিরায়ত সামাজিক প্রথা ও ইন্‌স্টিটিউশনের কতদূর আবদ্ধ হয়ে ছিল, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়।

ইয়োরোপীয়ান এলিটের আদর্শপুষ্ট হয়ে এদেশের শিক্ষিত এলিট গড়ে উঠেছিল। সেই আদর্শের বীজ থেকে অঙ্কুর, এবং অঙ্কুর থেকে গাছ ফল ফুল হবার মতো দেশের মানুষের মনের মাটি তৈরি হয় নি, তার কারণ তার উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রচিত হয় নি। তার উপর এই শিক্ষিত এলিটশ্রেণীর সামাজিক উৎপত্তিও বাংলার নবজাগরণের প্রবাহকে কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রধানত হিন্দুসমাজের উচ্চস্তর থেকে, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আধুনিক বাঙালী এলিটের উদ্‌ভব হয়েছে। এককথায় উনিশ শতকের বাঙালী এলিটকে উচ্চবর্ণের সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত 'এলিট' বলা যায়। তার ফলে এই এলিটগোষ্ঠী-অনুপ্রাণিত ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন হিন্দুসমাজ কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলমান এলিটগোষ্ঠীর বিকাশ হয় নি বলা চলে। ব্রিটিশের ক্রমবর্ধমান প্রশাসন-যন্ত্রের নানাশ্রেণীর চালক ও কর্মচারী সরবরাহের জন্য যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রবর্তন করা হয়েছিল, তা হিন্দুরাই বেশি আয়ত্ত করেছিলেন বলে এই স্তরের চাকরিজীবীদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ধনিক ও মধ্যবিত্তের স্তরে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের বিচ্ছেদ তো হয়েছিলই, শিক্ষিত এলিটের স্তরেও হয়েছিল। এই কারণে বাংলাদেশে যে সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ট্রাজিডি ঘটেছে, তাও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে অস্বীকার করা যায় না। যদি ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত না করে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয় তাহলে তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এইভাবে বাঙালী মুসলমানসমাজ উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে, পরবর্তীকালে নতুন উদীয়মান

বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত এলিটশ্রেণী স্বভাবতই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে একাত্মীয়তা স্থাপন করতে পারেন নি। তার আগেই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সামাজিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল খণ্ডিত বাংলাদেশ এবং খণ্ডিত ভারত।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অনুপ্রেরণার মূলে যে প্রগতির ধ্যানধারণা—'idea of progress'—সক্রিয় ছিল, তারই বা স্বরূপ কি? ফরাসী বিপ্লব ও ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব, বাষ্পীয় শক্তি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রিসিটি, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপাদনের প্রসার ইত্যাদির জন্য যে বাস্তব সামাজিক পরিবেশ ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক মনীষী ও শিল্পী-কবিদের প্রগতির চিন্তাধারায় তারই প্রতিফলন হয়েছিল। প্রত্যক্ষ 'material progress'-এর উপর 'ideas of progress' রচিত হয়েছিল। তার চারিদিকে ছিল মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান ও অগ্রগতি—অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে। যদিও এই উন্নতি ও প্রগতি প্রধানত বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়াশ্রেণী ও নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্য নির্ধারিত, তাহলেও তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। রেলপথ ও রেলগাড়ির গতির মতো প্রগতির ধারণাও হল সরল ও যান্ত্রিক। কবি টেনিসন যখন লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের রেলপথে প্রথম যাত্রা করেন, তখন ১৮৩০ সালে, তিনি লেখেন:

Let the great world spin forever down the ringing grooves of change.

১৮৫১ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে বাস্তব অগ্রগতির নিদর্শন সকলকে দেখানো হয়েছিল। Edinburgh Review (October 1851) তখন প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য জানিয়ে লেখেন যে এই বিরাট মেলার লক্ষ্য হল 'to seize the living scroll of human progress, inscribed with every successive conquest of man's intellect.' ইংলণ্ডের বাস্তব পরিবেশ থেকে উদ্ভূত এই প্রগতির ধ্যানধারণা ইংরেজ শাসক ও এলিটগোষ্ঠী আমাদের দেশের এলিটগোষ্ঠীর মস্তিষ্কে রোপণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ অবাস্তব পরিবেশে। ভৌগোলিক ও সামাজিক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তার ফলে বাংলাদেশে কিছুটা আদর্শগত আলোড়ন হয়েছিল এবং যতটা হয়েছিল সেই অনুপাতে সামাজিক সুফল ফলে নি। পুরাতন মধ্যযুগীয় সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের লৌহপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে প্রগতির ভাবধারা প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ পাদে পৌঁছেও আমরা তাই আজ বাংলার

সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিচিত্র সহাবস্থান দেখতে পাই—ধর্মীয় গুরুবাদ থেকে রাজনৈতিক মার্কস্‌বাদ, সর্বক্ষেত্রে। জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সেই উনিশ-শতকীয় সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত-মানস আজও আমাদের বুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশে তাই আজ অলিগলিতে, পাড়ায় পাড়ায় ধর্মীয় গুরু, Messiah ও অবতারের প্রাদুর্ভাব, প্রত্যেক মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে অন্তত একজন করে তরুণ আধুনিক কবি ও কমিউনিস্টের আবির্ভাব, প্রত্যেক অঞ্চলে মহকুমায় ও থানায় একটি করে মার্কসবাদী ও সোশ্যালিস্ট দল—একজন ব্যক্তি বা 'গুরু'-কেন্দ্রিক—প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মার্কসবাদী—শুধু বিশেষত্ব এই যে তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী, বিশেষ করে যে কমিউনিস্টরা বড্ড বেশি masses-এর মুখ চেয়ে শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে এবং বিশিষ্ট সভ্য ভদ্রলোকের মতো পার্লিয়ামেন্টারি কায়দায় মার্কসবাদী আন্দোলনের কথা বলে না, আধুনিক শিক্ষায়তনের পাশাপাশি পেশাদার অ্যাস্ট্রলজারের চেম্বার, ভীড়ের চাপ দু' জায়গাতেই সমান, কোনোরকমে লিখতে-পড়তে শিখেছেন এরকম বাঙালীর মধ্যে অন্তত শতকরা কুড়িজন 'ক্রিয়েটিভ' সাহিত্যিক অর্থাৎ অরিজিন্যাল গল্প উপন্যাস কবিতা লেখেন এবং তাঁদের সৃজনীপ্রতিভার স্ফুরণ অশিক্ষিত অমার্জিত শিশ্নপরায়ণতার ('genitality') মধ্যে, ফ্রয়েডীয়ান অর্থে eroticism-এ নয়, কিঞ্চিৎ অর্থের মালিক এ রকম বহু বাঙালী নামে গালভরা 'ব্যবসায়ী' আসলে নেপোশ্রেণীর নিকৃষ্ট দালাল এবং অবাঙালী মোনোপলিস্ট পুঁজিপতির আজ্ঞাবহ মাল-যোগানদার দাসানুদাস—এ রকম সব বিচিত্র সামাজিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত অদ্ভুত মধ্যবিত্ত হবুচন্দ্রের রাজ্য বাংলাদেশের মতো দেশ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এও অনেকটা আমাদের উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত এলিটগোষ্ঠী অনুপ্রাণিত নবজাগরণের উত্তরাধিকার, কেবল আকারে ও বিকারে অনেক পরিবর্ধিত। কার্ল মার্ক্‌সের 'alienation' এবং এমিল দুর্কহাইমের 'anomie'-র সামাজিক অনুসন্ধানের আদর্শক্ষেত্র আজ বাংলাদেশ। কিন্তু সেটা আলোচনার যোগ্য বিষয়, আপাতত আমাদের আলোচনা নয়।* আমাদের কথা হল, বাংলাদেশের বিশাল বর্ধিষ্ণু জনসমাজে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যারা মার্ক্‌সের ভাষায় 'submen' ছিল, অর্থাৎ যারা তাদের শক্তি ও

* আমার নতুন বই 'মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ'-এর মধ্যে এবিষয়ে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। (১৯৭৮)

শোষিত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, তারা আজ তাদের 'sub-humanity' সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছে এবং সেই মানবেতর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। প্রাথমিক রাষ্ট্রীক ও নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ তাদের সার্থক হলে, ভবিষ্যতে তারা আমাদের লিখিত ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং তখন অনেক অধুনা প্রচলিত মূল্যায়নের মানদণ্ড আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে। বইপত্র তো হবেই। তখন অনেক রূঢ় মানসিক আঘাতের হাত থেকেও আমরা নিষ্কৃতি পাব না। বিশিষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা হয়ত তখন বর্তমানের ক্লাব হোটেল আড্ডাখানা ও 'সুইট হোম' ছেড়ে অরণ্যবাসী হতে চাইবেন। কিন্তু বর্তমানের মিলেনারিয়া-নিজম্, অ্যানোমি, অ্যালিয়েনেশন ও মার্ক্সইজম্-এর সমন্বয়, উনিশ শতকের 'ব্রাহ্মইজম্' ও 'হিন্দুইজম'-এর মতো অথবা ইয়ং বেঙ্গলের 'রেডিকালিজম্' ও আশী-নব্বুই-এর দশকের হিন্দু 'রিভাইভ্যালিজ্ম্'-এর সমন্বয়ের মতো, অরণ্যেও সম্ভব হবে না, অন্তত বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ জনারণ্যে তো নয়ই।

সংযোজন ১৯৭৮

'বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা

আদিমযুগের অতিকথার (Myth) একটা গঠনবিন্যাস (Structure) আছে যা লেভি-স্ট্রাউসের মতো নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টির রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়ে এবং যার ভিতর থেকে আদিম বর্বর বন্য মানসের (The Savage Mind) আপাত-অজ্ঞাত চিন্তাভাবনাকল্পনার বর্ণাঢ্য রূপ রামধনুর মতো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক যুগের অতি-কথাগুলি আত্মগোপন করে থাকে নীরেট সব তথ্যের পাথরচাঁইয়ের তলায় এবং তথ্য মানে রাজারাজড়ার সিংহাসন কাড়াকাড়ির কাহিনী, প্রাসাদচক্রান্ত আর যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ওমরাহ-উমেদারের অথবা একালের স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তির কীর্তিকলাপ। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস দেশের ইতিহাস নয়, লোকসমাজেরও ইতিহাস নয়। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তদুপরি আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা ইতিহাসচর্চা শিখেছেন ইরেজদের কাছ থেকে। নৃবিদ্যা প্রত্নবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে, ভারতের সুদূর অজানা অতীতের ইতিহাস, প্রধানত ইংরেজদের অভিভাবকত্বে, পুনরুদ্ধৃত হয়েছে। একথা সত্যের খাতিরে অস্বীকার করা যায় না। এদিক থেকে বিদ্যানুরাগী কয়েকজন ইংরেজের কাছে আমরা ঋণী, যেমন কানিংহাম, মার্শাল, বেগলার, হাটন এবং আরও অনেকে। কিন্তু 'আধুনিক' যুগের ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা নানাদিক থেকে এদেশীয় ঐতিহাসিকদের বিচার-বুদ্ধিকে ঘোলাটে-ধোঁয়াটে করে দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর মতো আমরা ইংরেজদের গুরুগিরি অন্ধের মতো মেনে নিয়েছি। আধুনিক যুগ মানে ইংরেজ শাসকদের যুগ, তাই আধুনিক যুগের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় শাসকরা

আমাদের বুঝিয়েছেন যে তাঁরাই আধুনিকতার ভগীরথ এবং আধুনিকতা মানে প্রগতি অগ্রচিন্তা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার-মুক্তি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অগ্রগতি, যার গাণিতিক যোগফল হল 'নবজাগৃতি', যেমন ইয়োরোপের 'রেনেসাঁস' সেইরকম। 'রকম' দেখে আমরা ধাঁধিয়ে গিয়েছি কিন্তু রকমটা যে 'কি রকম' তা আর ভেবে দেখিনি। সাদা (White) ঐতিহাসিকরা বলেছেন অতএব কালা (Black Native) ঐতিহাসিকদের তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া কোনো গতি নেই। তাই মনে হয়, আমাদের দেশের আধুনিককালের ব্রাহ্মণোত্তর বুদ্ধিজীবীদের ঠিক অ্যান্টনিও গ্রামসির সংজ্ঞানুসারে 'Organic' ও 'Traditional' গোষ্ঠীতে দ্বিচিহ্নিত করা যায় না।* ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর লেজুড়রূপে মূলত তাঁদের 'organic' বলেই চিহ্নিত করতে হয়, যদিও গ্রামসির 'traditional' গোষ্ঠীভুক্ত দুচারজন ভাসমান স্বনির্ভর বুদ্ধিজীবী ছিলেন না যে তা নয়, কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে, আমাদের আলোচ্য নয়, আপাতত ইতিহাসের গতিনির্ণয় করাই আমাদের লক্ষ্য।

উল্লেখ্য হল, ইয়োরোপীয় 'রেনেসাঁসে'র মডেলটি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের দেশে নির্বিচারে যাঁরা প্রয়োগ করতে অত্যুৎসাহী হয়েছেন তাঁরা একজাতের অভিজাত কলেজে হয়ত শিক্ষালাভ করেছেন (যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজে), পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অন্য সকলকে দাবিয়ে টপকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, অতএব 'ইতিহাস' মানে 'তিনি' এবং 'তিনি' আর 'ইতিহাস' অভিন্ন এবং তাঁর মার্কসবাদী ব্যাখ্যানও অভ্রান্ত। এইটাই বিভ্রান্তিকর ট্র্যাজিডি। অর্থাৎ এই মার্কসীয় ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই নবজাগৃতির প্রত্যয়ের নিমিত্তকারণ। অবশ্য এই ট্র্যাজিডির মূলে আরও একটি বড় কারণ আছে এবং সেটা হল 'ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল' সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের উক্তিগুলি। এরকম একটি উক্তি উদ্ধৃত করে (বাংলা তর্জমা) আজ থেকে তিরিশ বছর আগে (তখন আমার নিজের বয়সও তিরিশ) 'বাংলার নবজাগৃতি' লেখা আরম্ভ করেছিলাম (প্রথম অধ্যায় 'নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা' দ্রষ্টব্য)। অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল, তিনখণ্ডে এই নবজাগৃতির ইতিহাস রচনা করব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি, কেবল প্রথম খণ্ড 'পশ্চাদ্‌ভূমি' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৫ সনে। তারপর ১৩৮৫ সন পর্যন্ত আরও তিরিশ বছর কাটল, ইতিহাসচর্চার আদিগঙ্গা দিয়ে

* Antonio Gramsci ; *The Modern Prince & other Writings*, N. Y. 1970—'The Formation of Intellectuals' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনেক ঘোলা জল বয়ে গেল দেখলাম। অনেক প্রশ্ন জাগল মনে, অনেক প্রশ্ন। শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকাবার ইচ্ছা হল প্রবল। অদম্য ইচ্ছা। শহরে জন্ম, শহরে মানুষ হলেও গ্রামের পথে পা বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে ক্লান্তি বোধ করিনি কখনও, আজও করি না, বয়স হলেও বাংলার গ্রামের মানুষ, গ্রামের সমাজ, গ্রামের জীবনযাত্রা, গ্রামের সংস্কৃতি স্বচক্ষে দেখতে-দেখতে বারংবার মনে হতে লাগল, পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কি পদার্থ? কোথায় এবং কখন 'জাগরণ' হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতিকেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য 'জ্যোতির কনকপদ্মের' মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য? কেন পৌরাণিক যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাদের স্বপ্নচারিতা? এরকম অনেক প্রশ্ন। অনেক সংশয়।

কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে *New York Tribune* পত্রিকায় ১০ জুন, ২৪ জুন ও ২২ জুলাই তারিখে যথাক্রমে 'The British Rule in India' 'The East India Company—It's History and Results' এবং 'The Future Results of British Rule in India' নামে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। তখন বাংলার 'নবজাগরণপর্ব' রামমোহন ও ডিরোজীয়ানদের যুগ অতিক্রম করে বিদ্যাসাগরের যুগে পদার্পণ করেছে। রামমোহনের সঙ্গে কার্ল মার্কসের দেখা হয়নি, মার্কস তখন ছাত্র, যদিও বেন্থাম, উইলবারফোর্স, রবার্ট ওয়েন এবং আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। প্রথম লেখাটি ট্রিবিউনে প্রকাশিত হবার পর (১০ জুন ১৮৫৩) মার্কস ১৪ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে এঙ্গেলসকে একটি চিঠিতে লেখেন :[১]

> Your article on Switzerland was of course a direct smack at the leader in the *Tribune* (against centralisation, etc) and... I have continued this hidden warfare in a first article on India, in which the destruction of the native industry by England is described as *revolutionary*. This will be very

১ Marx and Engels: *Selected Correspondence*: Translated and Edited by Dona Torr: London 1943, Letter No. 24, pp 69-70.

shocking to them. For the rest the whole rule of Britain in India was swinish, and is to this day.

The stationary character of this part of Asia—despite all the aimless movement on the political surface—is fully explained by two mutually dependent circumstances : (1) The public works were the business of the Central Government ; (2) besides these the whole empire, not counting the few larger towns, was resolved into *villages*, which possessed a completely separate organisation and formed a little world in themselves.

These idyllic republics, which jealously guarded only the *boundaries of their village* against the neighbouring village, still exist in a fairly perfect form in the North-Western parts of India which have but recently fallen into the English hands. I do not think one could imagine a more solid foundation for the stagnation of Asiatic despotism. And however much the English may have Irelandised the country, the breaking up of those stereotyped primitive forms was the *sine qua non* (essential condition) of Europeanisation. The tax-gatherer alone was not the man to achieve this. The destruction of their archaic industry was necessary in order to deprive the villages of their self-supporting character.

ট্রিবিউন পত্রিকার তিনটি রচনা এবং এরকম কয়েকটি চিঠি আমাদের দেশের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের নবজাগরণতত্ত্বের সৌধ রচনায় গথিক স্তম্ভের মতো কাজ করেছে, যেহেতু এগুলি কার্ল মার্কস লিখেছেন। এঙ্গেল্‌স যেমন 'The Class Struggle in France' (Marx) গ্রন্থের প্রথম পুনর্মুদ্রণে ভূমিকা লিখে (মার্চ ১৮৯৫) শোধনবাদীদের (Revisionist) গুরুর কাজ করেছিলেন অজ্ঞাতসারে[২], মার্কসও তেমনি 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল' সম্বন্ধে এই

২ এই বিষয়ে Lucio Colletti লিখিত *From Rousseau to Lenin : Studies in Ideology and Society* (New Left Books, London 1972) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিনয় ঘোষ : মেট্রোপলিটন মন • মধ্যবিত্ত • বিদ্রোহ : দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিশিষ্ট ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২২৩-২৬

রচনাগুলি ও চিঠিপত্র লিখে মার্কসবাদের যান্ত্রিক বিকৃতির পথ সুগম করে দিয়েছেন। যেমন রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্কের রৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করে 'vulgar Marxism'-এর বিকাশ হয়েছে তেমনি। মরিস গদেলিয়ের (Maurice Godelier) বলেছেন

> how are we to conceive the relations between the determining structure and the dominant one, and what determining in economic relations is it that dictates that there shall be dominance by kinship-relations or by politico-religious relations? *This* question could not be answered, or even asked, by dogmatic Marxism and the other forms of that vulgar materialism to which dogmatic Marxism belongs, even though it denies the affinity. For vulgar materialism, the economy, which it reduces to the relations between technology and environment, 'produces' the given society, giving rise to it as an epiphenomenon. This means refusing to see the irreducible differences between the levels and structures of social life, the reason for the relative autonomy with which they operate, and reducing all levels to so many functions, either apparent or concealed, of economic activity.

গদেলিয়ের প্রশ্ন করেছেন এবং খুব সঙ্গত প্রশ্ন [৩]

> How could this hypothesis be reconciled with the fact for example, that within many primitive societies it is relations of kinship between men that dominate social organization... or that religious relations seem to dominate Indian society, dividing men into a hierarchy of castes in accordance with an ideology of purity and impurity... ?

সঙ্গত তো বটেই, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন গদেলিয়ের এবং এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে তিনি নৃতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

[৩] Maurice Godelier: *Rationality and Irrationality in Economics*: Monthly Review Press, New York 1972: Foreword to the English edition 1972—'Functionalism, Structuralism and Marxism'.

I therefore became an anthropologist.

In association with Professor Levi-Strauss, who took a close interest in my project and obtained for me all the facilities I needed in order to carry it out, I therefore undertook to initiate myself into anthropology, while devoting special attention to what is called 'economic anthropology', the field that it seemed ought to include the data of my theoretical problems and perhaps the elements of their solution.

সমাজটা হল 'সমূহ' বিশেষ এবং সমূহ (aggregates) দুরকমের হতে পারে। একরকম হল 'অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ' (those of which the parts are in union and fusion, being lost in the whole), আরএকরকম হল 'যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ' (mechanical aggregates—collocation of distinct and independent parts)। সর্বস্তরের মানবসমাজই অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, এবং উপর থেকে যত নিচের স্তরের দিকে নেমে যাওয়া যায় তত দেখা যায় যে তার এই অযান্ত্রিক রূপটা বেশ প্রকট। সেখানে সমাজের ছবিটা তীব্র ফোকাসে খুব পরিষ্কার দেখা যায়। সমাজভিত্তির অর্থনীতি যদি সমাজের উপরতলার একমাত্র নিয়ন্ত্রক হত তাহলে আজকের সমাজের অনেক বিরোধের, অনেক জটিলতার সমাধান সহজেই হয়ে যেত। তা হয়নি।

হয়নি তার কারণ সমাজগড়ন সমাজমানস এবং মানুষ, কোনোটাই ঠিক সরল পাটিগণিতের মতো সহজ নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক, রাজনীতির সম্পর্ক, সাহিত্যসংস্কৃতিশিল্পকলার সম্পর্ক, কোনোটাই 'ইউনিলিনিয়ার' নয়, সরল রেখার মতো সম্পর্ক নয়, দু'য়ে-দু'য়ে চার নয়। দু'য়ে দু'য়ে সাড়ে-চার বা পাঁচ বলেই সর্বত্র এতপ্রকারের অসামঞ্জস্য এবং আপাতবিস্ময়কর ঘটনার এত বৈচিত্র্য। পুথিপুস্তকগত বাস্তবতার সঙ্গে প্রকৃত সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পার্থক্য দেখে আমরা পদে-পদে অবাক হয়ে যাই। তথাপি পুথিগত বাস্তবতার লেজ ধরে, গরুর লেজ ধরে অন্ধের নগর দেখার মতো, আমরা এগিয়ে চলি, সামাজিক পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি, প্রকৃত জীবনসত্য ও সমাজবাস্তবকে এড়িয়ে যাই। আমরা চোখ মেলে দেখি না, মন খুলে বুঝতে চাই না যে সামাজিক চিন্তাভাবনা, সামাজিক ব্যবহার, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, সবকিছুরই বিভিন্ন স্তর (levels) আছে, বিভিন্ন গড়ন (structures) আছে এবং অনেক সময় একএকটি স্তরে, একই গড়নের

চৌহদ্দির মধ্যে এগুলি বেশ স্থায়ীভাবে বিরাজ করে, পরিবর্তনের কোনো ঢেউয়ের আঘাতে বিচলিত হয় না। যেমন আমাদের দেশের জাতিবর্ণভেদ-ব্যবস্থা। শত-শত শতাব্দীর নির্মম কশাঘাত সহ্য করে, শত-শত সাধুসন্ত সংস্কারকদের মানবতার উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষা করে, শতসহস্র রাষ্ট্রনায়ক-দের জাতিসাম্যের বাণী বিধিনিষেধ আইনকানুন আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করে, আজও ১৯৭৮ সালেও যখন দেখা যায় যে সেই জাতিভেদব্যবস্থা হিন্দু সমাজের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তিরূপে প্রায়-অটুট রয়েছে, অথচ অর্থনীতি-টেকনোলজির অগ্রগতি-উন্নতি অনস্বীকার্য, তখন ভাবতে হয় যে এই ব্যবস্থাটা কী এবং তার অন্তর্নিহিত কোন্ জাদুবলে তার এই অমর অক্ষয় রূপ আজও প্রকট। গদেলিয়ের 'Irreducible differences between the levels and structures of social life' এবং 'the relative autonomy with which they operate' বলতে এই কথাই মনেহয় বলতে চেয়েছেন। আমাদের দেশের এই স্বয়ংক্রিয় বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও গড়নগুলি কিরকম তা না বুঝলে কেন উনিশ শতকে বাংলা দেশে কিঞ্চিৎ নতুন চিন্তাভাবনা অথবা শিক্ষা-ব্যবস্থার আমদানির ফলে, উপরের সংকীর্ণ স্তরে কিছু সামাজিক আলোড়ন ঘটলেও, ইয়োরোপের মতো কোনো রেনেসাঁস হয়নি, তা বুঝতে পারা সম্ভব হবে না।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগৃতির লক্ষণগুলি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বিচ্ছেদ নবজাগরণের এই লক্ষণগুলির মধ্যে সূচিত হয়। ভন মার্টিন বলেছেন[৪]

> the typological importance of the renaissance is that it makes the first cultural and social breach between the Middle Ages and modern times : it is a typical early stage of modern age

আধুনিক যুগ বলতে এখানে ধনতান্ত্রিক যুগের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং নবজাগরণের অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা করার আগে আমাদের প্রথম দেখা উচিত বাংলা দেশের তৎকালের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কতদূর পর্যন্ত ধনতন্ত্রের শৈশবকাল বলা যায়। প্রশ্ন হল, ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক লক্ষণ-গুলি কি? কার্ল মার্কস বলেছেন[৫]

৪ Alfred Von Martin : *Sociology of the Renaissance*, London 1945, p. 3
৫ *Capital*, Vol III : Bottomore and Rubel : *Karl Marx, Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*, London 1961, p 130

> The producer may become a merchant and capitalist, in opposition to agricultural natural economy and to the guild organized handicrafts of medieval town industry. This is the really revolutionary way. Or the merchant may take possession of production directly.

উৎপাদক বণিক (merchant) হতে পারে অথবা পুঁজিপতিও (capitalist) হতে পারে। যদি তা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কৃষিনির্ভর অকৃত্রিম স্বাভাবিক অর্থনীতি এবং গিল্ড বা সংঘভিত্তিক হস্তশিল্প কেন্দ্র করে মধ্যযুগের যে নগরশিল্প গড়ে ওঠে তারা তার বিরোধী। তার কারণ মধ্যযুগের কৃষক জমিদার কারুশিল্পী প্রত্যেকের আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে আধুনিক যুগের বণিক ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্য। এই বিরোধ ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপের অনেকদেশে বণিক ও পুঁজিপতিরা মধ্যযুগের নগরগুলি অধিকার করেছে, নগরের সঙ্গে গ্রামের বিচ্ছেদ ও সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে, ক্রমে জমিদার ও কৃষকরা পরাজিত হয়েছে এবং নগরে-নগরে বণিক ও পুঁজিপতিরা শ্রেণীগতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। এইভাবে পশ্চিমে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে এবং আধুনিক যুগের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের দেশে ভারতবর্ষে বা বাংলা দেশে তা হয়নি। তার প্রধান কারণ আমাদের পরাধীনতা। যে বিদেশী শাসকরা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল, তারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের নিজেদের পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধী মনে করত। মনে করা স্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে ইংলণ্ড সকলের অগ্রণী ও অগ্রজ, এবং ইংলণ্ডের মতো সারা পৃথিবীব্যাপী বিরাট সাম্রাজ্য জয় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পৃথিবীর আর কোনো দেশ পরবর্তীকালে পারেনি।* তার উপর আমাদের দেশের মতো এরকম প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের দিক থেকে বিশাল দেশও পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোথাও ছিল না। অতএব এই দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং মানবিক সম্পদ শোষণ করে নিজেদের দেশের (ইংলণ্ডের) শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতি ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য যে অধিকৃত পরাধীন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী, তা ব্যাখ্যা করে বলা অনাবশ্যক।

---

* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১৩,৩৫৫,০০০ বর্গমাইল এবং সমস্ত সাম্রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ৪৯৫,৫০০,০০০—বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পৃথিবীর মোট লোক-সংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (J. H. Stembridge : *British Empire*, O. U. P.)

এইধরনের ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মতো নতুন কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার উদ্ভব সম্ভব হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আমাদের দেশকে রপ্তানি ও আমদানি উভয়েরই বাজারে (market) পরিণত করাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের নানারকমের কাঁচামাল (raw materials) সস্তায় সংগ্রহ করে স্বদেশে ইংলণ্ডে পাঠানো এবং সেখানকার কলকারখানায় সেই কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন নানারকমের পণ্যদ্রব্য এদেশে আমদানি করে চড়ামূল্যে বিক্রয় করা ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে তারা আমাদের দেশের নানাবিধ কুটিরশিল্প ও শিল্পীদের যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনি দেশের সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ করেছে এবং এদেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীকে উৎখাত করেছে। অতএব মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র থেকে আধুনিক যুগের ধনতন্ত্রের বিকাশের কোনো ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের উদয় এদেশে হয়নি এবং তা হয়নি বলেই 'রেনেসাঁসে'র কোনো পাশ্চাত্ত্য মডেলের প্রতিষ্ঠা এখানে হয়নি।

আগে যে নগর ও ছোট-ছোট নগরশিল্পের কথা বলেছি এবং গিল্ড বা শিল্পীসংঘের কথা, সে সম্বন্ধে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। গিল্ডের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেছেন[৬]

> The necessity for association against the organised robber-nobility, the need for communal covered markets in an age when the industrialist was at the same time a merchant, the growing competition of the escaped serfs swarming into the rising towns, the feudal structure of the whole country : these combined to bring about the guilds.

এরকম কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়নি আমাদের দেশে এবং দস্যুতাপ্রবণ জমিদার-জোতদারের অভাব না থাকলেও, তাদের তাড়নায় এদেশের কারুশিল্পীদের অথবা 'serf'দের নগরের সীমার মধ্যে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হতে হয়নি। তার প্রধান কারণ, এদেশের দৃঢ়মূল

৬ মার্কস-এর উদ্‌ধৃতি দুটি তাঁর *The German Ideology* রচনা থেকে গৃহীত। মার্ক্স-এর Pre-Capitalist Economic Formations গ্রন্থের (N. Y. 1971) সম্পাদক Eric J. Hobsbawm উক্ত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় কিয়দংশ Supplementary Texts of Marx and Engels on Problems of Historical Periodization অধ্যায়ে উদ্‌ধৃত করেছেন।

বংশগত বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণভেদব্যবস্থা (caste system)। আমাদের দেশে কারুশিল্পের বিশেষ বিকাশ ও বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে মার্ক্স-এর এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> Every workman had to be versed in a whole round of tasks, had to be able to make everything that was to be made with his tools. The limited commerce and the scanty communication between the individual towns, the lack of population and the narrow needs did not allow of a higher division of labour, and therefore every man who wished to become a master had to be proficient in the whole of his craft. Thus there is found with medieval craftsmen an interest in their special work and in proficiency in it, which was capable of rising to a narrow artistic sense.
>
> Capital in these towns was a natural capital, consisting of a house, the tools of the craft, and the natural, hereditary customers ; and not being realisable, on account of the backwardness of commerce and the lack of circulation, it descended from father to son.

মার্ক্স এইজন্য কারুশিল্পীদের মূলধনকে 'estate capital' বলেছেন, কারণ 'this capital was directly connected with the particular work of the owner, inseparable from it' এবং এই মূলধনের সঙ্গে 'modern capital'-এর পার্থক্য গুণগত, কারণ 'আধুনিক মূলধন' 'can be assessed in money and which may be indifferently invested in this thing or that.' আমাদের দেশের কারুশিল্পীর জীবিকার জন্য সকলে মধ্যযুগের নগরে এসে মিলিত হয়নি, অনেকে গ্রামাঞ্চলেই পুরুষানুক্রমে বাস করেছে। তারও প্রধান কারণ বৃত্তিনির্ভর বর্ণবৈষম্য। সকল বৃত্তির সামাজিক মর্যাদা সমান নয় এবং কোনো কারুশিল্পের শৈল্পিক সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, তদনুপাতে শিল্পীর মর্যাদা স্বীকৃত হত না। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা-শিল্পী, চিত্রকর, বেতবাঁশের শিল্পী প্রভৃতির সঙ্গে মৃৎশিল্পী কাঠখোদাইশিল্পী বা ভাস্করদের পদমর্যাদার পার্থক্য বিরাট।[৭] এই বর্ণভেদজনিত সামাজিক

৭ বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৬, ১৯৭৮ এবং তৃতীয় খণ্ড (১৯৭৯) দ্রষ্টব্য।

মর্যাদার ভিন্নতার জন্যই প্রধানত বিভিন্ন গোষ্ঠীর কারুশিল্পীদের পক্ষে নগরে এসে মিলিত ও সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। এদেশের বণিকদের সঙ্গেও (সদাগরশ্রেণী) কারুশিল্পীদের প্রত্যক্ষ কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া আমাদের দেশের সদাগররা বর্ণগতভাবে সমাজে উপেক্ষণীয় ছিল এবং এই বিভেদ ব্রিটিশ রাজত্বেও দূর হয়নি। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। এদেশীয় সদাগররা বর্ণগতভাবে উপেক্ষিত ছিল বলে, আমাদের মধ্যযুগীয় নগরে ধীরে-ধীরে 'burgher class' এবং তা থেকে আধুনিক 'bourgeois' শ্রেণীরও উদ্‌ভব হয়নি। এদিক থেকে চীনা সমাজের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মিল আছে, কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার অমিলও আছে অনেক। এই বিষয়েও পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই এদেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে। একথা আগে বলেছি। অবাধ বাণিজ্যের এবং শিল্পোদ্যমের যেটুকু সুযোগসুবিধা হয়েছিল তা গ্রহণ করা এদেশে সর্বাগ্রে যাদের উচিত ছিল সেই সদাগরশ্রেণী—অর্থাৎ গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক এবং অন্যান্য বণিকরা, তাঁরা তা করেননি। কেন করেননি পরে বলছি। উচ্চবর্ণের বাঙালীদের মধ্যে কেউ-কেউ এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ডিরোজীয়ানদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি, কিন্তু তাঁরা Comprador-শ্রেণীর, অর্থাৎ ব্রিটিশের তাঁবেদার ব্যবসায়ীশ্রেণীর ভূমিকা ছেড়ে স্বাধীন শিল্পোদ্‌যোগীর স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেননি।[৮] তা ছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায় যে তাঁরা ব্রিটিশের তাঁবেদার ব্যবসায়ীর ভূমিকা ছেড়ে ক্রমে নতুন জমিদারশ্রেণীর আরামপ্রদ বিলাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে।

কর্নওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলেও এটা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, যদিও ইতিহাসে সাধারণত সেই কথা লেখা হয়ে থাকে। কোম্পানির ডিরেক্টররা অনেক আগেই এই জমিদারীব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন। হাণ্টার বলেছেন[৯]

৮ বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা।

৯ W. W. Hunter : *Bengal M S. Records* 4 Vols, London 1894—Vol 1, Introduction.

nothing can be further from the historical truth than the idea that Cornwallis was the originator either of that system or of the Permanent Settlement. What Cornwallis realy did was to carry out a predetermined plan of the Court of Directors with a cautious delay···

কর্নওয়ালিস নিজে বেশ বিচক্ষণ শাসক ছিলেন এবং ব্রিটিশের স্বার্থ তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝতেন। তাই এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কয়েকদিন আগে তিনি কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে একটি চিঠিতে লেখেন (৬ মার্চ ১৭৯৩):

The large capitals possessed by many of the natives, which they will have no means of employing···will be applied to the purchase of the landed property as soon as the tenure is declared to be secured.

এদেশের কিছু লোকের হাতে অনেক মূলধন জমা হয়েছে 'which they will have no means of employing'—কর্নওয়ালিসের এই কথার গুরুত্ব খুব পরিষ্কার। এর পর কোনো বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না এই কথা বোঝাবার জন্য যে স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের পথে এদেশের মূলধন নিয়োজিত হোক, সেটা ব্রিটিশের কাম্য ছিল না। তা না হলে কর্নওয়ালিস বলতেন না যে জমিদারী কেনা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এদেশীয় মূলধন নিয়োগের উপায় থাকবে না। অতএব আঠার শতকের Comprador-শ্রেণীর বাঙালীরা যাঁরা বেনিয়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি দেওয়ানী সরকারী ইত্যাদি কর্ম করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে দলে-দলে 'জমিদার' হতে আরম্ভ করলেন। প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নন। তাই নতুন বন্দোবস্তের কড়া আইনের ফলে তাঁদের জমিদারী একে-একে নিলামে উঠতে লাগল এবং শহরের মুচ্ছুদ্দি-বেনিয়ানরা নিলাম থেকে সেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হতে থাকলেন। হাণ্টার বলেছেন (পূর্বোক্ত ভূমিকা)

The mournful story of the ruin of these and other once powerful families under the Sale Law for arrears is shown in detail in...During two years alone, 1796-98, estates bearing a reveneu of Sicca Rs. 5521252, more than a fifth of the whole land tax of the Province, were advertised for sale for

arrears...within twenty-two years of the Permanent Settlement, from one-third to one-half of whole landed property in Bengal had been sold on that account. The wave of the Permanent Settlement had, in truth, submerged the ancient houses of Bengal.

হাণ্টার এ কথা বলার অনেক আগে মার্কস তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়াতে উল্লেখ করেছিলেন [১০]

Results of the 'Settlement' : First product of this plunder of 'communal and private property' of the ryots : whole series of local risings of the ryots against the 'landlords' [conferred on them], involving : in some cases expulsion of the zemindars and stepping of the East India Co. into their place as owner ; in other cases, impoverishment of the zemindars and compulsory or voluntary sale of their estates to pay of the arrears and private debts. Hence greater part off the province's landholdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital..nd readily invested it in land.

এই নতুন গোত্রান্তরিত জমিদারশ্রেণী চালচলনে আচার-ব্যবহারে পোষাক-পরিচ্ছদে বনেদী জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী তো ছিলেনই, গ্রাম ও গ্রামের জমিদারীর প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অন্যরকম। জমিদারীকে তাঁরা যে-কোনো ব্যবসার মতো মনে করতেন এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের মাধ্যমে কৃষকদের অমানুষিকভাবে শোষণ করে নিজেদের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই যে নতুন সমাজবিন্যাস হল, বাংলার সামাজিক জীবনে তার প্রতিক্রিয়া হল সুদূরপ্রসারী। কর্নওয়ালিস এদেশের একশ্রেণীর লোকের হাতে যে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা সম্ভব হল কি করে? অর্থাৎ এদেশের মুচ্ছুদ্দি-বেনিয়ানরা প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করলেন কি করে? 'স্বাভাবিক অর্থনীতি'র

১০ Karl Marx : *Notes on Indian History* (664-1858) : Moscow N.D. এই গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী মার্কস-এর এই 'নোট' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'This paragraph has been taken from Marx's abstract of Kovalevsky's book. The abstract immediately follows Marx's chronological notes'.

(natural economy) পরিবর্তে 'বিনিময় অর্থনীতি' (exchange economy) প্রবর্তনের ফলে। 'The very existence of exchange value is a massive economic fact' কারণ বিনিময়প্রধান অর্থনীতির জন্য প্রশস্ত সুযোগ হল

> to seek riches, not in the absurd form of a heap of perishable goods, but in the very convenient and mobile form of money or claims to money. The possession of money soon became an end in itself in an exchange economy.[১১]

এই কারণে এদেশের comprador-শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের জুনিয়র অংশীদার হয়ে নানাকৌশলে, আঠার শতক থেকে উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তা সঞ্চয়ও করেছিলেন এইজন্য যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেই টাকা নিয়োগ করার বিশেষ উপায় ছিল না। কর্নওয়ালিস সেইজন্য প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নতুন জমিদারীতে এই পুঁজি নিয়োগ করার সুযোগ হবে। তাই হল, এই comprador-শ্রেণী হল প্রধানত নতুন জমিদারশ্রেণী। জমিদারীতে ছাড়া বাকি টাকা খরচ হতে থাকল ব্যক্তিগত বিলাসিতায়, দয়াদাক্ষিণ্যে ধর্মকর্মে মামলা-মকদ্দমায় এবং এইরকম আরও অনেক অপচয়কর্মে। বাংলা দেশের যে দেবালয় আমাদের গর্ব করার মতো সাংস্কৃতিক কীর্তি তার অধিকাংশই এই নতুন জমিদারদের অর্থে স্থাপিত। দেবভক্তির জন্য নয়, মনেহয় পাপমুক্তির জন্য তাঁরা দেবালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হন। স্থাপত্যের কীর্তি হিসেবে অবশ্যই এগুলি উল্লেখ্য, কিন্তু তার গৌরব সূত্রধর ও অন্যান্য অখ্যাত অজানা কারিগরশিল্পীদের প্রাপ্য। এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিলাস ও মর্জি চরিতার্থের জন্য অজস্র অর্থব্যয় ছাড়াও কেবল যৌথসম্পত্তির ভাগবাটোয়ারার জন্য মামলাতে (অনেক সময় পুরুষানুক্রমে) কত লক্ষ-লক্ষ টাকা যে খরচ হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই, আজ পর্যন্ত কেউ তার একটা আনুমানিক হিসেব করার চেষ্টা করেননি। অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে রাজসূয় যজ্ঞের মতো খরচের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। এই বিচিত্র অপব্যয়ের একটা আনুমানিক হিসাব করাও যদি সম্ভব হত তাহলে দেখা যেত যে সেই অর্থ দিয়ে আমাদের দেশ শিল্পায়নের (industrialisation) পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত,

১১ Paul M. Sweezy et al : *The Transition from Feudalism to Capitalism* (Reprinted from *Science and Society*, N. Y 1950-53.)

অবশ্য যদি এদেশের লোকের শিল্পোদ্‌যোগী হবার মতো মনোভাব থাকত এবং শাসকরা সেখানে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না করত।

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে তিনটি সামাজিক শ্রেণী তৈরি করেছিলেন নিজেদের প্রশাসনিক ভিত্তিস্তম্ভগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্য। শ্রেণীগুলি হল

ক. নাগরিক Comprador-শ্রেণী।

খ. আধা-নাগরিক আধা-গ্রাম্য জমিদারশ্রেণী।

গ. গ্রাম্য ও নাগরিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী।

নাগরিক মধ্যবিত্তের মধ্যে নতুন শিক্ষিতরাও আছেন, যাদের মেকলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দালালস্বরূপ বলেছেন। এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের ফলে ইংরেজদের পক্ষে বিশাল শাসন-শোষণব্যবস্থা 'institutionalise' করা সহজেই সম্ভব হয়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সেটা কেবল আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার বিচ্ছেদ নয়, গভীর মানসিক বিচ্ছেদও বটে। সকল শ্রেণীর 'town animal' (Marx) হিংস্র পশুর মতো তাদের টাকার ক্ষুধা মেটাবার জন্য গ্রামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মূলত কৃষকদের শোষণ করেই সেই ক্ষুধা মেটাতে থাকে।

এরকম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের কোনো ঐতিহাসিক লক্ষণ সন্ধান করা অর্থহীন। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদও এই অবস্থায় সম্ভব নয়। সম্ভব যদি না হয় তাহলে সমাজবিজ্ঞানারা যে নবজাগৃতির (Renaissance) 'typological importance'-এর কথা 'first cultural and social breach between the Middle Ages and modern times' বলে উল্লেখ করেছেন, তা এদেশে হয়নি। অতএব ইয়োরোপীয় মডেলের কোনো আধুনিক নবজাগরণ বাংলা দেশে অথবা বাঙালী সমাজে হয়নি। আমরা ইয়োরোপীয় বিদ্যা ইংরেজের আমলে শিক্ষা করে সবকিছুই সেই বিদ্যার আলোকে দেখতে ও বিচার করতে শিখেছি। তাই সোডার বোতলের উচ্ছ্বসিত বুদ্‌বুদের মতো খানিকটা সাময়িক আদর্শগত চিত্তচাঞ্চল্য এদেশের কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করে এবং রেল-গাড়ির বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শব্দ আর কয়েকটি ক্ষুদে কারখানার ভোঁ শুনে আমরা ভেবেছি আমাদের দেশে ইয়োরোপের মতো রেনেসাঁসের হাওয়া বইছে। আমাদের ভাবনা ভুল, সাদৃশ্যবোধ ভুল। হাওয়া বয়েছিল সমাজের উপরতলার চিলেকোঠার একটি ছোট আধখোলা জানলা দিয়ে। সেই হাওয়া কারও গায়ে লাগেনি, মনে তো নয়ই। নবজাগরণ হয়নি, যা লেখা হয়েছে, এখনও লেখা হয়, তা অতিকথা।

কেন হয়নি তার কারণ আরও তলিয়ে খোঁজ করা দরকার। ব্রিটিশ প্রশাসনের যে তিনটি এদেশীয় নতুন শ্রেণীস্তম্ভের কথা আগে বলেছি, তার সামাজিক গড়নটা কি তা জানা উচিত। মুচ্ছুদ্দিগিরি বেনিয়ানি করে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন কারা? কারা সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করে জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছিলেন? গ্রাম ও শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল? কারা নতুন পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা শিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষিতশ্রেণী হয়ে সেকালের ভাষায়, 'rulers and ruled'-এর মধ্যে 'interpreters' হয়েছিলেন? অধিকাংশই হিন্দু, এবং হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণভুক্ত যারা তাঁদের নিয়েই প্রধানত এই তিনটি শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। মুসলমান এবং অনুচ্চবর্ণ বলে হিন্দুসমাজে যারা উপেক্ষণীয়, তাঁদের সংখ্যা এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে খুবই সামান্য। কেন সামান্য? কেন অনুচ্চবর্ণের লোকরা অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন যুগে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ গ্রহণ করেন নি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাংলার, তথা ভারতের, ভুয়ো রেনেসাঁসের মূলকারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং বোঝা যাবে কেন বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা ছাড়া কিছু নয়।

হিন্দুধর্ম চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুসমাজ 'বর্ণাশ্রমিসমাজ'। হিন্দুসমাজের এই ভিত আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কারক অথবা কোনো শাসক ভাঙতে পারেন নি, বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান অথবা খ্রীস্টান ইংরেজরা, কেউ না। সংস্কারকদের মানবতার বাণী, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন, শিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদির ফলে তার গায়ে খানিকটা আঁচড় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ভিত্তিতে ফাটল ধরেনি। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও বোঝা যায়, একথা কতখানি সত্য।

হিন্দু শাস্ত্রকাররা (প্রাচীন ও মধ্যযুগের এলিটশ্রেণী) বলেন যে জন্মের দ্বারাই 'বর্ণ' ঠিক হয়, অর্থাৎ কুল জন্মগত। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র, এইটাই হিন্দুসমাজের চিরস্থায়ী জাতিবর্ণগত ব্যবস্থা এবং স্বয়ং ভগবানই এই ব্যবস্থার প্রবর্তক। ভগবান নিজেই বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেন:

মুখতঃ সোঽসৃজদ্বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা।
বৈশ্যাংশ্চাপ্যূরুতো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা॥

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৭।১৯

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমনিম্নমুখী প্রত্যঙ্গের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির

সম্পর্ক থেকে বর্ণবিন্যাসের ক্রমও পরিষ্কার বোঝা যায়। জন্মগত কুলের দ্বারা বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কুলবৃত্তি কদাচ পরিত্যাজ্য নয়। ব্রাহ্মণরা জন্ম থেকেই অন্য বর্ণের গুরু এবং ব্রাহ্মণকুলে জাত দশবছরের শিশুও শতায়ু ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য গুরু হবার অধিকারী—

ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ।
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌতয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

অনুশাসনপর্ব ৮।২১

কর্মগত সুফল-কুফলের জন্য ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ, অথবা বৈশ্য-শূদ্রের ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদালাভের অনেক বচন ও দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে, কিন্তু সেগুলি জন্মগত বর্ণবিভেদের লৌহবন্ধন শিথিল করার জন্য নয়, অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে সংযত করার জন্য। সুকর্মের পুরস্কারস্বরূপ সামাজিক পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে সমাজব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করাই এইসব শাস্ত্রবচনের উদ্দেশ্য। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। একালের হরিজন কুলোদ্ভব কেউ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে এবং রাজনৈতিক কলাকৌশল আয়ত্ত করে হয়ত 'মন্ত্রী' হতে পারেন, কিন্তু তার জন্য সাধারণ হরিজনদের হরিজনত্ব একটুও বদলায় না। সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন 'সত্য সহৃদয়তা দান ক্ষমা তপস্যা দয়া যে-ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ'। নহুষ বলেন 'এসব গুণ তো শূদ্রদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়।' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেন 'শূদ্রের জাতিগত গুণ (পরিচর্যাদি) যদি ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তাহলে তাকে শূদ্র মনে করব। আর ব্রাহ্মণের গুণ, শম দম ইত্যাদি, যদি শূদ্রে দেখা যায়, তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ মনে করব।' যুধিষ্ঠির সজ্ঞানে এখানে মিথ্যা কথা বলে নহুষকে ধাপ্পা দিয়েছেন। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র হলেও তিনি কাকে কর্মগুণে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র মনে করেন তাতে ব্রাহ্মণের বা শূদ্রের অথবা সমাজের কিছু আসে যায় না। যুগে-যুগে কত শত-শত যুধিষ্ঠির এসেছেন গিয়েছেন কিন্তু বর্ণভেদের আঁকাবাঁকা পথে হিন্দু-সমাজের প্রবাহ তার জন্য খাত বদলায়নি। সেকালে সমাজের যা-হোক একটা শাসন ছিল, একালে তাও নেই। একালে টাকা যার সমাজ তার। নিম্নবর্ণের চেয়ে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে একথা অনেক বেশি সত্য। একালের ব্রাহ্মণরা যদি অজস্র অপকর্ম করে অঢেল টাকা উপার্জন করতে পারেন, তাহলে সেই টাকার জোরে তিনি তাঁর ব্রাহ্মণত্ব অনেক বেশি বজায় রাখতে পারেন এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ-রূপে তাঁর দাপট অন্যদের উপর জাহির করতেও পারেন। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুসমাজে এই ঘটনাই ঘটেছে। কুলবৃত্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা কেউ

জাতিচ্যুত হননি, বরং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সমাজে তাঁদের কুলগত আধিপত্য আরও মজবুত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুলগত বর্ণের সঙ্গে বিত্তগত বর্ণ মিশে এক বিচিত্রবর্ণ সামাজিক প্রতিপত্তির বিকাশ হয়েছে সমাজে ব্রিটিশ আমলে। সমাজের কুলগত জাতিবর্ণগত গড়নের কোনো পরিবর্তন হয়নি, যেজন্য এদেশে 'রেনেসাঁস' হয়নি।

ভারত ও চীনের সামাজিক সাদৃশ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। চীনেও ইয়োরোপের মতো 'রেনেসাঁস' হয়নি, ভারতেও হয়নি, এবং না হবার কারণ দুই দেশেই প্রায় একরকম। কিন্তু রেনেসাঁস না হবার কারণ অনেকটা একরকম হলেও, ভারত ও চীনের মধ্যে সামাজিক বৈসাদৃশ্যও আছে অনেক। যেমন ভারত বহু ভাষাভাষী, চীন তা নয়। যেমন চীনের সমাজে ভারতের হিন্দুসমাজের মতো কোনো জাতিবর্ণভেদ নেই, অথচ চীনে একটা বৃত্তিগত সামাজিক মর্যাদাভেদ আছে। এই বৃত্তিগত মর্যাদাভেদের ক্ষেত্রে ভারত-চীনের সাদৃশ্য আছে এবং রেনেসাঁসের যাবতীয় অনুপ্রাণনার অপমৃত্যুও উভয়দেশে এই একই কারণে ঘটেছে। কিন্তু বৃত্তিভেদ জন্মগত ও কুলবর্ণগত হবার জন্য ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ ব্যাহত হবার গুরুত্ব আরও অনেক বেশি।

কেমব্রিজের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চীনবিশারদ অধ্যাপক জোসেফ নীডহাম (Joseph Needham) দীর্ঘকাল চীনের বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিকাশের সঙ্গে চীনাসমাজের গড়নের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং চীনে কেন ইয়োরোপীয় ধাঁচের রেনেসাঁস হয়নি তার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গত ভারতের কথাও তিনি মধ্যে-মধ্যে উত্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট গড়ন ও ইতিহাসের মধ্যেই নবজাগৃতির প্রেরণার অভাবের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। নীডহামের চীনাসমাজের ইতিহাস কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন

Science and Civilisation in China. 7 Vols, 11 parts : London

The Grand Titration, Science and Society in East and West London 1969

Clerks and Craftsmen in China and the West, London 1970.

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রসঙ্গে নীডহামের এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি। নীডহাম বলেছেন

whoever would explain the failure of Chinese society to

develop modern science had better begin by explaining the failure of Chinese society to develop mercantile and then industrial cepitalism. Whatever the individual prepossessions Western historians of science, all are necessitated to admit that from the fifteenth century A. D. onwards a complex of changes occurred ; the renaissance cannot be thought of without the rise of modern science, and none of them can be thought of without the rise of capitalism, capitalist society and the decline and disappearance of feudalism··· The fact is that in the spontaneous autochthonous development of Chinese society no drastic change parallel to the renaissance and the scientific revolution in the West, occurred at all.

The Grand Titration, pp. 39-40

এখানে চীনাসমাজ সম্বন্ধে নীডহাম যা বলেছেন তা ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও প্রায় বর্ণে-বর্ণে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন

The bureaucratic-feudal system of traditional China proved to be one of the most stable forms of social order ever developed...it played a leading part in assuring for Chinese culture a continuity···above all, it meant (as in India) that there was no indigenous development of capitalism. The mandarinate system was so successful that it inhibited the rise of the merchants to power in the State ; it walled up their guilds in the restricted role of friendly and benefit societies ; it nipped capitalist accumulation in the bud···

Within the Four Seas, p. 34.

এখানে কেবল 'mandarinate system'-এর বদলে 'caste system' কথাটি বসিয়ে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও নীডহামের এই উক্তি প্রয়োগ করা যায়। জাতিভেদের জন্য গিল্ড বা শিল্পীসংঘের বিকাশও ভারতীয় সমাজে খুব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কাজেই 'capital accumulation' এবং ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ আমাদের দেশে হয়নি। আরও পরিষ্কার করে নীডহাম বলেছেন

Now if the Mandarinate was supreme, if the Civil Service was always the great power, there was a bar to the development of any other group in society, so that the merchants were always kept down and unable to rise to a position of power in the State. They had guilds, it is true, but these were never as important as in Europe. Here we might be putting our finger on the main cause of the failure of Chinese civilisation to develop modern technology, because in Europe (as is universally admitted) the development of technology was closely bound up with the rise of the merchant class to power. It is perhaps a question of who is going to put up the money for scientific discovery—it is not the Emperor, it is not the feudal lords ; they fear change rather than welcome it. But when you come to the merchants, they are the people who will finance research in order to develop new forms of production and trade ; and such was indeed the fact in European history. Chinese society called 'bureaucratic feudalism', and that may go a long way to explain why the Chinese, in spite of their brilliant successes in earlier science and technology, were not able, as their colleagues in Europe were, to break through the bonds of medieval ideas and advance to what we call modern science and technology. I think, one of the great reasons is that China was fundamentally an irrigation-agricultural civilisation as contrasted with the pastoral-navigational civilisation of Europe ; with the consequent prevention of the merchants' rise to power.

Clerks and Craftsmen in China and the West, p. 82

ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিকাশের সঙ্গে বণিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। সামন্তযুগের রাজারা অথবা তাঁদের আশ্রিত অমাত্য-আমলারা বিজ্ঞান-টেকনোলজির উন্নতির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, যেহেতু বিজ্ঞানের উন্নতি তাঁদের শ্রেণীস্বার্থবিরোধী। কিন্তু বণিকরা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের

জন্য বাণিজ্য ও উৎপাদনের উন্নতি কামনা করতেন এবং সেই কারণে বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দিতেন। ইয়োরোপীয় সমাজে বিজ্ঞানের চর্চা, টেকনোলজির উন্নতি বণিকদের আর্থিক আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছে। চীনে ও ভারতে তা হয়নি। বণিকশ্রেণী এসিয়ার এই দুই মহাদেশে উৎপাদনরীতির উন্নতির ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না এবং বাণিজ্যের প্রসারেও তাঁরা কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। কারণ চীন ও ভারতের ফিউডালিজমের স্বরূপ স্বতন্ত্র এবং সেখানে বণিকশ্রেণীর কোনো সামাজিক সম্মান ছিল না, তাদের বাণিজ্যকর্মকেও অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। বণিকরা তাই এই দুই দেশে সামাজিক প্রতিপত্তি অথবা রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব অর্জন করতে পারেননি। নীডহাম বলেছেন, এরকম ঐতিহাসিক অবস্থার প্রধান কারণ হল, চীনের সভ্যতা 'irrigational-agricultural civilisation', ইয়োরোপের মতো 'pastoral-navigational' নয়, তাই বণিকদের প্রাধান্য চীনাসমাজে স্বীকৃত হয়নি। ভারতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ হল সেচ-কৃষি, তাই বণিকরা শ্রেণীরূপে সমাজে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তার উপর ভারতের জাতিবর্ণভেদব্যবস্থার জন্য বণিকরা কোনো সামাজিক মর্যাদা লাভ করেননি, চিরকাল উপেক্ষিত হয়েছেন। চীনের মতো ভারতেও প্রাচীন হিন্দুযুগে বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু ইয়োরোপের মতো তার স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বণিকদের ঔদাস্যের জন্য। রেনেসাঁসও এইকারণে হয়নি

চীনের সমাজগড়নের ভিত্তি কর্মগত স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভারতের মতো জন্মকুলগত স্তরের উপর নয়। চীনের জনগোষ্ঠীর এই স্তরক্রমকে সেইজন্য নীডহাম 'estates' বলেছেন, 'classes' নয় ('We need not call them classes'—Needham)। এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যেও চীন ও ভারতের সঙ্গে মৌল পার্থক্য আছে। যেমন

চীনের সমাজ

↓	শী	*Shih*—the scholar-gentry
	নুঙ	*Nung*—the farmers
	কুঙ	*Kung*—the artisans
	শ্যাঙ	*Shang*—the merchants.

ভারতীয় সমাজ

ব্রাহ্মণ	এলিটগোষ্ঠী
ক্ষত্রিয়	শাসকগোষ্ঠী, যোদ্ধা
বৈশ্য	বণিক-ব্যবসায়ী
শূদ্র	কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী

এখানে চীনাসমাজ ও ভারতীয় সমাজের স্তরবিন্যাসের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। ভারতীয় সমাজে বণিকজনের স্থান নিম্নস্তরে হলেও 'তৃতীয়' ('বৈশ্য'), কিন্তু চীনাসমাজে বণিকরা নিম্নতম চতুর্থ স্তরভুক্ত। স্তরক্রমের মধ্যে একটি ধাপের পার্থক্য তেমন উল্লেখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু চীনাসমাজের গড়নের বৈশিষ্ট্য হল, কৃষিজীবীদের স্থান অনেক উচ্চে, দ্বিতীয় স্তরে, বুদ্ধিজীবী-ভদ্রশ্রেণীর ঠিক পরে। অথচ ভারতীয় হিন্দুসমাজে কৃষি-জীবীরা সর্বনিম্ন চতুর্থ স্তরে 'শূদ্র' বলে অভিহিত, যদিও চীনের মতো ভারতের সভ্যতাও কৃষি-সেচভিত্তিক। অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের সর্বপ্রধান বৃহত্তম স্তরটি সর্বাধিক অবহেলিত উপেক্ষিত এবং তাদের কোনো সামাজিক পদমর্যাদা নেই, কিন্তু চীনাসমাজে এই বৃহত্তম জনস্তরের যথেষ্ট পদমর্যাদা আছে এবং সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিজীবীদের পরেই তাদের স্থান। এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ এবং এই পার্থক্যের জন্য চীন ও ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের পরবর্তী-ক্রমবিকাশের মৌল পার্থক্য ঘটেছে। সেকথা পরে উল্লেখ করব।

বণিকজনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে বলা যায়, চীনা ও ভারতীয় সমাজের বিকাশের পার্থক্য ঘটেনি। বাঙালী সমাজের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। চীনাসমাজে যেমন, ভারতীয় সমাজেও তেমনি, প্রাচীন যুগের পরে, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে প্রধানত একটি কারণে, এবং সেই কারণটি হল বণিক-জনের প্রতি সামাজিক অবহেলা। বণিকজনের কোনো মর্যাদা আমাদের সমাজে নেই। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হলেও বণিকরা বণিক বা বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণরা দরিদ্র হলেও বৈশ্য ও শূদ্রদের সেবার অধিকারী, গুরুগিরির অধিকারী। তাই বৈশ্য বণিকরা সামাজিক ক্রমোন্নতির ব্যাপারে উদাসীন। সমগ্র ভারতের কথা জানি না, কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে আমাদের দেশের বৈশ্যকুলোদ্ভব বণিকজনেরা উচ্চস্তরের (উচ্চবর্ণের) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের 'style of living' বা জীবনযাত্রা অনুকরণ করেছেন, তাঁদের মতো বড়-বড় প্রাসাদ-

তুল্য অট্টালিকা, ঠাকুরবাড়ি, দেবদেবীর মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। সামাজিক উচ্চমর্যাদালাভের ব্যর্থতাকে এইভাবে তাঁরা পূরণ করেছেন মানসিক ক্ষেত্রে। বাংলার বণিকপ্রধান গ্রামে-গ্রামে এই দৃশ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।* মনেহয় যেন একটি 'archaeological site'-এ উপস্থিত হয়েছি। বাংলায় তথা ভারতে বণিকজনেরা উৎপাদনরীতির উন্নয়নের জন্য অথবা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিজ্ঞান-টেকনোলজির অনুশীলনে কোনো উৎসাহ দেননি। ক্রমে তাঁরা নিজেরা উচ্চবর্ণের মতো সামন্ততন্ত্রেরই পোষকতা করেছেন, নিজেরা জমিদার-জোতদার হয়েছেন এবং জীবনযাত্রার দিক থেকেও মধ্য-যুগের সামন্তভান্ত্রিক ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাংলা দেশে বা ভারতে সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য নবজাগৃতির কোনো লক্ষণ দেখা দেয়নি, দিতে পারে না। যা ঘটেছে সেটাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'acculturation' বা সংস্কৃতি-সংঘাতজনিত আদর্শের আদানপ্রদান ও মিশ্রণ বলা যায়। এবং এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও মিশ্রণও সমাজের অতিসংকীর্ণ উচ্চস্তরে উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যুগ-যুগ ধরে সমাজগড়নের এই জন্মগত জাতিবর্ণভেদের স্তরবিন্যাস অনড় থাকার জন্য প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন বর্ণের জীবনধারা এক অতিবিচিত্র রূপ ধারণ করেছে আমাদের দেশে। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে শোষক-শোষিতের শ্রেণীভেদ দেখা দিয়েছে এবং উচ্চনিচবর্ণের মধ্যেও এই শ্রেণীভেদ প্রকট হয়েছে। যেমন হরিজনদের বিভিন্ন কুলগত জাতির মধ্যে শ্রেণীরূপায়ণ হয়েছে, ধনিক চর্মকার দরিদ্র চর্মকারদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এবং জাতের দোহাই দিয়ে শোষণ করছে, তেমনি ব্রাহ্মণ জমিদার নিম্নবর্ণের দরিদ্র কৃষকদের উপর শ্রেণীগত ও বর্ণগতভাবে দ্বিমুখী সাঁড়াশীর মতো অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছে। জাতি (caste) ও শ্রেণী (class) বিচিত্রভাবে সমাজগড়নের স্তরে-স্তরে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তার ফলে সমাজের স্তরবিন্যাস আরও জটিল হয়েছে এবং সামাজিক বাস্তব রূপও (social reality) অনেকবেশি অস্পষ্ট হয়েছে। জাতিবিরোধ ও শ্রেণীবিরোধ বাস্তবতার স্তরে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে কোন্‌টা কি তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। বর্তমানে তাই ধনতন্ত্র ও টেকনোলজির যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রেণীবিরোধ

* এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক বণিকপ্রধান গ্রামের বিবরণসহ সবিস্তারে আমি আলোচনা করেছি। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নতুন পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম (১৯৭৬), দ্বিতীয় (১৯৭৮) এবং তৃতীয় খণ্ড (১৯৭৯)-এ দ্রষ্টব্য।

জাতিবর্ণবিরোধ বলে মনে হয় এবং বাইরের প্রতীতি যে বাস্তব সত্য নয় তা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বুঝি না। এইভাবে সমাজের প্রত্যেকটি স্তর একটা স্বয়ংক্রিয় স্থিতি ও গতি লাভ করেছে ('the relative autonomy with which they operate'—Godelier) যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না এবং আমাদের যান্ত্রিক মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানও এই স্তরগুলির বাস্তব বর্ম ভেদ করতে পারে না। আজকের ধনতান্ত্রিক ও টেকনোলজিকাল অগ্রগতির দিনেও তাই আমাদের সমাজের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের উপাদান-গুলি লতার মতো জড়িয়ে আছে দেখা যায়, বিশেষ করে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে।

আমাদের দেশের বৃহত্তম জনশ্রেণী কৃষকরা নিম্নতম শূদ্রবর্ণভুক্ত হবার ফলে যে রাজনৈতিক ট্র্যাজিডি ঘটেছে তা আরও শোচনীয়। চীনে কৃষি-জীবীরা সমাজের দ্বিতীয় স্তরভুক্ত, উচ্চতম স্তরের পরেই তাদের স্থান, একথা আগে বলেছি। সেইজন্য চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহজেই গ্রামভিত্তিক ও কৃষকশ্রেণীনির্ভর হতে পেরেছে, যা ভারতীয় রাজ-নীতির কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন শহরভিত্তিক মধ্যবিত্তনির্ভর হবার জন্য আজ তার এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও শোষণপীড়ন সত্ত্বেও এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আজও তাই শাসকশোষকশ্রেণীর লেজুড় হয়ে নিজেদের সত্তা কোনরকমে বজায় রেখে চলেছে, এমনকি যাঁরা কমিউনিস্টদের মধ্যে সাচ্চা বিপ্লবী, প্রকৃত 'মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট' বলে দাবি করেন তাঁদের মধ্যে অনেকে (সকলে অবশ্যই নন) মধ্যবিত্ত বাবুপ্রধান রাজনীতিতেই মগ্ন, কেবল তত্ত্বকথার বীজগুড়ি কাটছেন, এবং গ্রাম বা কৃষক তাঁদের শহরের কফিহাউসের আড্ডা থেকে অনেক দূরে। বর্তমান বিংশশতাব্দীর সত্তরের দশকে যেমন মার্কসীয় তত্ত্বের বাঁধাসূত্র প্রয়োগ করে, আমাদের হতভাগা দরিদ্রদেশে কেন বিপ্লব (revolution) হয়নি এবং হবার আশু সম্ভাবনা নেই তা ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস' বা নবজাগৃতি মার্কস লিখিত 'ভারতে ইংরেজশাসনের ফলাফল' বিষয়ে প্রবন্ধের সাহায্যে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলে প্রমাণ করা যায় না। বাংলার তথা ভারতের নবজাগৃতি যে একটি অতিকথা (myth), এ-সত্য বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে।